৫মভাগ

১ম

আশ্বিন

১২৯৫

নবজীবন।

জান না জান না কি রে কেন এ আহ্লাদ ?
কেন যে ভুলেছে সবে বি[illegible] ?
যিনি দীন—দয়াময়ী,
যাঁরে সেবি রাম জয়ী ;
অনাদ্যা, আনন্দময়ী, আরাধ্যা জগতে,
সেই দেবী মূর্ত্তিময়ী আজি রে ভারতে ॥

যিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দুর্গা জগৎ জননী,
পাপ তাপ দুঃখ হরা দুর্গতি দলনী,
সেই শিবা শিবঙ্করী,
এসেছেন কৃপা করি,
ভারত আকাশে তাই সুখ সূর্য্যোদয় ;
তাই রে ভারত আজি আনন্দ আলয় ॥

তাই রে সুধার স্রোত হৃদে প্রবাহিত ;
চিত্তের জ্বলন্ত চিতা তাই নির্ব্বাপিত ॥
তাই সুখী সর্ব্বজনে,
শোক শঙ্কা নাহি মনে,
তাই এই [illegible] বিজয়ের রোল ;
সমাজ সাগরে তাই হর্ষের হিল্লোল ॥

দাসত্ব দুর্গতি কারো মনে নাহি আর ;
হাস্য-লাস্য শোভিতেছে বদন সবার ॥
কিবা ধনী কিবা দীন,
গৃহী কিবা উদাসীন,
বাল বৃদ্ধ নরনারী সবে পুলকিত ;
বিশ্বব্যাপী মহোৎসবে সকলে মিলিত ।

এসেছেন মহেশ্বরী, মহামহোৎসব!
বিশেষ উল্লাসী তায় বঙ্গবাসী সর্ব॥
দেখ প্রায় প্রতি ঘরে,
চণ্ডীপাঠ ভক্তি ভরে,
করি লোক পূজে দেবী বিবিধ প্রথায়,
ঘটে, পটে, প্রতিমায় অথবা শিলায়॥

অর্থদান বস্ত্রদান করে কতজন;
কতজন করে কত ভক্ষ্য বিতরণ॥
যেমন বিবিধ দান,
সেইরূপ নৃত্য গান,
তুষিতেছে, মোহিতেছে মানস সবার;
মহা দিন মহোৎসব আনন্দ অপার॥

এ হেন উৎসবে কেহ থেক না নিদ্রায়,
যোগ দেহ সুবে এই অপূর্ব্ব পূজায়॥
এই পূজা পূর্ব্ব হতে,
প্রাচীন পুরাণ মতে,
যুগে যুগে প্রচলিত পুণ্যভূ ভারতে,
হেন মহা পূজা আর নাহি রে জগতে॥

যিনি দেবী মহেশ্বরী, যাঁহা হতে হয়
বিশ্বের সৃজন রক্ষা বিশ্বের বিলয়॥
শক্তিরূপা সারাৎসারা,
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা,
চরাচর ব্যাপ্ত যিনি চির বিদ্যমান;
শাস্ত্রে বলে, যাঁর যোগে ব্রহ্ম ক্রিয়াবান,

অদ্বিতীয়া অনুপমা অনাদ্যা অসীমা ;
অনন্ত জগৎ যাঁর প্রকাশে মহিমা,
জ্যোতি যাঁর তমো নাশে,
যাঁর তেজে বিশ্ব ভাসে,
ভবের ভাবিনী মহা দেবী ভগবতী,
তুষিতে ভক্তের মন যিনি মূর্ত্তিমতী,

যাঁহার করুণা-বলে ত্রিদশ আলয়ে
সদানন্দে দেবগণ থাকেন নির্ভয়ে ॥
যিনি শূল লয়ে করে,
আরোহিয়া সিংহোপরে,
অসুর নাশিনী মূর্ত্তি, করিয়া ধারণ,
করিলেন পদতলে দানব দলন,

সেই মহাদেবী এই দুর্গা দশভূজা ;
ভারত করিছে আজি তাঁরি মহা পূজা ॥
যোগদান কর সবে,
মহানন্দ লাভ হবে,
প্রশস্ত মানসে সবে ভুলে দেহে বল,
হইবে আপন হিত পরের মঙ্গল ॥

করুক বিধর্ম্মীগণ যতই বিদ্রূপ ;
কিন্তু ইহা মহা পূজা কহিনু স্বরূপ ;
ব্রহ্মময়ী আরাধনা,
যে পূজার সংকল্পনা,
সে পূজার পূজাবস্তু নহে রে পুতুল ;
যে বলে পুতুল পূজা সেই রে বাতুল ॥

আবাহন।

অতএব এস এস মিলিয়া সকলে,
জগত জননী পূজ পূজ কুতূহলে॥
দাঁড়ায়ে মায়ের পাশে,
গললগ্নী কৃত বাসে;
পুষ্পাঞ্জলী পাদপদ্মে দেহ অবিলম্বে;
উচ্চ স্বরে বল জয় জয় জগদম্বে॥

আবাহন।

আও জগ-জননী, পশুরাজ-বাহিনী, গজরাজ-গামিনী,
কামিনী রে!
ঢল ঢল লাবণী, শতদল-দলনী, দশন-জ্যোতি, জিনি
দামিনী রে!
ঘন-ঘোর—কুন্তল, তারকা—চুল-ফুল, ভানু-শশী-অনল,
লোচন রে!
অম্বর—শির-চূড়, হুঙ্কার—মেঘ-ঝড়, ঝঙ্কার—পিকবর-
বচন রে!
দশ-ভুজ বিকাশি, বিরাজ দশ-দিশি, কটাক্ষ—দিবানিশি
বিভাত রে!
নিশ্বাস-পরশন, দ্রুতগতি পবন, আঁখি-উনমীলন
প্রভাত রে!
অলি-কুল-গুঞ্জিত, কলি-ফুল-মুঞ্জিত, শশী-রশ্মি-রঞ্জিত
চরণ রে!
কাঞ্চন-বরন-গৌরব, পরশন—সৌরভ, চম্পক—হেম-রাগ
বরণ রে!

নবজীবন।

প্রেমক-নিরঝর, ঝবত বিঝপব, কোমলে ভর ভব
কমলা বে !

তুহুঁবে বীণা-পাণি, তুহুঁবে ধন-বাণী, শকতি স্বরূপণী
অমলা বে !

অরাতি-বিঘাতিনী, মুকতি-প্রদায়িনী, ভকতি-বিধায়িনী,
বরদা বে।

কমল-বিহাবিণী, অচল-নিবাসিনী, মহেশ-সোহাগিনী
সাবদা বে।

ঝলসি-শশী পবি, নলিনী-হৃদে ধবি, ডগমগ সুন্দরী
শবত বে।

তবু আজু জননী ! সুমলিন বয়নী, হেবিযা নন্দিনী
ভাবত বে।

সবহুঁ বিবাজিত—গগন সুললিত, যমুনা পুলকিত—
বিলাস বে।

কোথি সো সমস্বর, ভকতি নিবঝর, পরাণ ভরপুব
উলাস রে।

যবহুঁ তেযাগল, ও পদ-শতদল, তুহাঁব সুত দল—
বেহুঁশ-বে।

পর-পদ-গবল, ঐছন উছালল, তৈথন ভাগল,
পৌরুষ বে।

নাশ মা অমা-ঘোব, ভারতে দেহ ভোব, মোছহ আঁখি লোর
জননী রে।

পূজন আবাধন, পুহুপ চন্দন, ঢালিব ও চবণ—
নলিনী বে !

মৈত্রী করুণা মুদিতোপেক্ষাণাং সুখ দুঃখ পুণ্যাপুণ্য বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্॥ ৩৩॥

পদচ্ছেদঃ। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষাণাং, সুখ, দুঃখ, পুণ্য, অপুণ্য-বিষয়াণাং, ভাবনাতঃ, চিত্ত প্রসাদনম্।

পদার্থঃ। মৈত্রী—সৌহার্দ্দং, করুণা—কৃপা, মুদিতা—হর্ষঃ, উপেক্ষা—ঔদাসীন্যং, সুখাদিশব্দস্তদ্বাহুল্যলাভায় ধর্ম্মধর্ম্মার্থভেদাৎ সুখিতাদিবাচী ততশ্চ সুখিত, দুঃখিত, পুণ্যবদ পুণ্যবন্ত স্তএব যথাক্রমং বিষয়া আশ্রয়া যাসাং তা স্তাসাং ভাবনা—উৎপাদনং, চিত্তমন্তঃকরণং, তস্য প্রসাদনং নির্ম্মলতা, সমাধিপ্রতিবন্ধকরাগদ্বেষবর্ম্মাদিমলাপসারণং ইতি যাবৎ।

অন্বয়ঃ। সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং মৈত্রী করুণা মুদিতোপেক্ষাণাং ভাবনাতঃ চিত্ত প্রসাদনং ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। মৈত্র্যাদীনি পূর্ব্বাণি সুখাদিযুক্তবেষু যথা সংখ্যং যোজ্যানি এতা মৈত্র্যাদ্যা যথাক্রমং সুখিতেষু, দুঃখিতেষু, পুণ্যবৎসু, অপুণ্যবৎসুচ ভাবয়েৎ তথাহি সুখিতেষু সাধ্বেষাং সুখিত্বমিতি মৈত্রী কুর্য্যাৎ, নতু তেষাং সুখং দৃষ্ট্বা তান্ প্রতি ঈর্ষ্যাং কুর্য্যাৎ, দুঃখিতেষু করুণাং কুর্য্যাৎ কথং নু নামৈষাং দুঃখিত্ববিমুক্তিঃ স্যাদিতি কৃপামেব কুর্য্যাৎ নতু নিশ্চেষ্টতামবলম্বেত, পুণ্যবৎসু মুদিতাং হর্ষং কুর্য্যাৎ তেষাং পুণ্যকার্য্যানুমোদনেন আনন্দং সূচয়েৎ, নতু কিমেতে পুণ্যবন্ত, ইতি বিদ্বেষং কুর্য্যাৎ, অপুণ্যবৎসু উপেক্ষাং ঔদাসীন্যমেব ভাবয়েৎ, নানুমোদনং, ন দ্বেষং কুর্য্যাৎ। এবং দ্বৈষরাগাদি প্রতিপক্ষীভূত মৈত্র্যাদি ভাবনয়া-পাপাসংভিন্নো ধর্ম্ম উপজায়তে, ততস্তমঃক্ষয়ে চিত্তং নির্ম্মলং ভবতীত্যর্থঃ। সমুৎপাদিতপ্রসাদঞ্চ চিত্তং সম্প্রজ্ঞাত সমাধিযোগ্যং সম্পদ্যতে। রাগদ্বেষাবেব মুখ্যতয়া ভেদ মুৎপাদয়তস্তৌ চ সমুন্মূলিতো স্যাতাং ততঃ প্রসন্নত্বাৎ মনসো ভবত্যৈবৈকাগ্রতা। ইতি নিষ্কর্ষঃ।

অনুবাদ। সুখিত, দুঃখিত, পুণ্যবান্ এবং অপুণ্যবান্ অর্থাৎ পাপাচারী মনুষ্যদিগের প্রতি যথাক্রমে স্নেহ, দয়া, হর্ষ এবং ঔদাসীন্য করিতে পারিলে চিত্তের প্রসন্নতা হয়।

সমালোচনা। চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনই যোগাভ্যাসের মূল ভিত্তি। চিত্তের নির্ম্মলতা বা প্রসাদ আবার সেই একাগ্রতার মূল। যদবধি চিত্তে মলস্বরূপ রজো ও তমোগুণের কণামাত্র অবস্থান করে তদবধি রাগ দ্বেষ আদি বৃত্তি দ্বারা চিত্ত অস্থির হইয়া বেড়ায়। কিন্তু ঐ রাগ দ্বেষাদির মূল কারণ স্বরূপ চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হইলে চিত্ত যখন নির্ম্মল সত্ত্বময় হয়, তখন তাহাতে আর কোন বৃত্তির উদয় হয় না, কাযেই চিত্ত স্থিরতা বা একাগ্রতা প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্তই মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন 'প্রসাদনং স্থিতি নিবন্ধনং'—চিত্তের প্রসন্নতাই স্থিতি বা একাগ্রতার মূল। চিত্তের সেই প্রসন্নতা কিরূপে উৎপন্ন হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি তৎ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

এই সূত্রের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে প্রথমে মৈত্রী প্রভৃতি শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক। মৈত্রী শব্দের অর্থ স্নেহ, সৌহার্দ্দ বা বন্ধুতা; করুণা শব্দের অর্থ কৃপা, দয়া, নিঃস্বার্থ ভাবে পরের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা; মুদিতা শব্দের অর্থ আনন্দ বা হর্ষ; এবং উপেক্ষা শব্দের অর্থ ঔদাসীন্য অর্থাৎ পক্ষপাত বা বিপক্ষতা কিছুই না করা; সুখ শব্দের অর্থ সুখযুক্ত ব্যক্তি; এইরূপ দুঃখ শব্দের অর্থ দুঃখিত; পুণ্য শব্দের অর্থ পুণ্যবান্; অপুণ্য শব্দের অর্থ অপুণ্যবান্ বা পাপী; ভাবনা শব্দের অর্থ করা এবং চিত্ত প্রসাদন বলিতে চিত্তের নির্ম্মলতা। এক্ষণে দেখ সূত্রে এক দিকে মৈত্র্যাদি চারটি যেমন উক্ত হইয়াছে, অন্যদিকে সুখাদিও চারটি উক্ত হইয়াছে, অতএব উহাদের পরস্পরের যথাক্রম সম্বন্ধ বলিতে হইবে। তা হলেই সুখিতের উপর মৈত্রী, দুঃখিতের উপর করুণা, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে; সেইরূপ অনুবাদে উক্ত হইয়াছে।

আজ কাল যেমন বাজারে বাজারে মার্কিণ থানের মত যোগও মার্কিণ হইতে আমদানী হইয়া সাহেবের হউসে ১০৲ টাকা করিয়া তোলার হিসারে এবং দেশী মহাজনের নিকট ৫৲ টাকা তোলার হিসাবে বিক্রী হইতেছে, তুমি সংসারে থাকিয়া আহার, বিহার, রাগ, দ্বেষ যেমন আবশ্যক তা সকলি কর, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই—ইচ্ছা হইলে পাঁচটি মুদ্রা ট্যাঁকে করিয়া বাগবাজারে যাইলেই এক তোলা যোগ কিনিয়া আনিতে পারিবে; তাহার পর সেই তোলাটুকুকে তোলাপাড়া করিয়া বাড়ান তোমার হাত,—কিন্তু যে সময় যোগ শাস্ত্রের আবিষ্কার হয়, এবং যখন হাতে কলমে যোগ অনুষ্ঠান করিয়া মুনিগণ তাহার নিয়ম শাস্ত্রে সন্নিবেশিত করেন, তখন যোগ এত সুলভ ছিল না। তখনকার লোকের বিশ্বাস ছিল যে একজন্মের নয়, দুইজন্মের নয়,

শতসহস্র জন্মের কঠোর কর্ম্মানুষ্ঠানের পর শত সহস্রের মধ্যে যদি একজনের যোগ সিদ্ধি হয়। তাই আজ মহর্ষি পতঞ্জলি যোগের ভিত্তি স্থাপনের এই কঠোর নিয়ম করিলেন। সূত্রটি শুনিতে তত কঠোর নয় বটে কিন্তু ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া হাতে কলমে ইহার উপদেশ মত কার্য্য করিবার সময়ই ইহার কাঠিন্য প্রতীত হইবে। এই সূত্রে যে কয়টি কথা বলা হইয়াছে তাহার সকলগুলির এক সাধারণ উদ্দেশ্য চিত্ত হইতে অহং ভাব দূর করা, সম্পূর্ণরূপে আত্ম বিস্মৃত হইয়া অনন্ত জগতের সহিত এক প্রাণ হওয়া।

এই সূত্রের মর্ম্মার্থ যদি কেহ আমাদিগকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করিতে বলেন তা হলে আমরা এইরূপে প্রকাশ করি। যদি কেহ যোগী হইতে চাও, তবে অগ্রে আপনার চিত্ত হইতে রাগ, দ্বেষ, হিংসা, পৈশুন্য প্রভৃতি মলাগুলি দূরীভূত করিয়া চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল করিতে শেখ। এই অনন্ত জগতের অনন্ত প্রাণীর সহিত এক প্রাণ এক মন হইয়া পরের সুখকে আপনার সুখ এবং পরের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া জান এবং তদনুসারে কার্য্য কর। যে কেহ করুক না কেন, জগতে সৎ কার্য্য দেখিয়া আনন্দিত হইতে শিক্ষা কর; এতদূর অবধি জগতের সহিত এক হও, কিন্তু পাপীর সহিত মিশাইও না। অশ্বারোহী যেমন দ্রুত বেগে যাইবার সময় সম্মুখে কোন বিপদ্ দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ রশ্মি আকুঞ্চন করিয়া স্থিরভাব ধারণ করে, সেইরূপ তুমিও জগতের সহিত এক-প্রাণতায় ভাসিয়া যাইতে যাইতে যেখানে পাপ দেখিবে, সেই স্থানেই অমনি তটস্থ হইয়া দাঁড়াইবে। সেখানে এক প্রাণতার বেগকে অবরুদ্ধ করিয়া চলিবে। ইহাই সূত্রের মর্ম্মার্থ।

আমরা আজকাল অনেক বর্ত্তমান সভ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিকে পরের সুখে হাসিতে এবং পরের দুঃখে কাঁদিতে দেখিতে পাই বটে কিন্তু একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সে হাসি ওষ্ঠপ্রান্তের ভূষণ মাত্র হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে নির্গত নয় এবং সে অশ্রুজল চক্ষুর উপরিভাগ আর্দ্র-কারী মাত্র, ভিতরে যে শুষ্কতা, সেই শুষ্কতা। পরের সহিত আত্মার যে ভিন্নতা সেই ভিন্নতাই আছে অথচ হাঁসি কান্নাও আছে। মহর্ষি পতঞ্জলি সেরূপ হাঁসি, কান্নার কথা বলেন নাই, দুর্ভিক্ষের কান্না কেঁদে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া শেষে স্ত্রীর অলঙ্কার গড়াইবার কথা বলেন নাই। যে হাঁসি হৃদয়ের উদ্বেলিত অন্তস্তলের সমুজ্জ্বল উচ্ছ্বাসরূপে নির্গত হইয়া কেবল ওষ্ঠপ্রান্ত নয়, চতুঃপার্শ্বস্থিত পদার্থনিচয়কেও সুধা ধৌতের ন্যায় পবিত্র করে, সেই হাসির

কথা বলিয়াছেন এবং যে অশ্রুজল কেবল নিজের নয় দর্শক মণ্ডলীরও বাহ্য ও অভ্যন্তর এই উভয়কেই সমভাবে আর্দ্র করে, তাহারই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই অসীম ধরামণ্ডলের মধ্যে কয়জন লোকের মুখে সেইরূপ হাঁসি দেখা যায় এবং কয়জনের নেত্র হইতেই বা সেরূপ অশ্রু নির্গত হয়? তাই বলিতেছি কথাটী শুনিতে সহজ কিন্তু কাজে করা বড় কঠিন। ৫ টাকা ১০ টাকার কর্ম্ম নয়, সমুদয় জীবন ব্যয় করিয়াও যদি কেহ ঐরূপ হাসি কান্না ক্রয় করিতে পারেন, তা হলেও আমরা তাহাকে লাভবান বিবেচনা করি।

প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥

পদচ্ছেদঃ। প্রচ্ছর্দ্দন—বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।

পদার্থঃ। প্রচ্ছর্দ্দনং—কৌষ্ঠস্য বায়োর্নাসিকাপুটাভ্যাং প্রযত্নবিশেষাৎ মাত্রাপ্রমাণেন বহির্নিঃসারণং, বিধারণং—প্রাণায়ামঃ, ইতি ভাষ্যং; প্রাণায়ামশ্চ প্রাণস্য (বায়োঃ) আয়ামঃ-গতিবিচ্ছেদঃ, সচ দ্বাভ্যাং প্রকারাভ্যাং বাহ্যস্যান্তরাপূরণেন, পূরিতস্য বায়োস্তত্রৈব নিরোধেন; বা অথবা, প্রাণস্য কৌষ্ঠবায়োঃ।

অন্বয়ঃ। বা (অথবা) প্রাণস্য প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং মনসঃ স্থিতিং প্রসাদয়ে দিতিশেষঃ।

ভাবার্থঃ। বা শব্দো বক্ষ্যমাণচিত্তৈকাগ্রতা সাধনোপায়ান্তরাপেক্ষী বিকল্পার্থঃ পূর্ব্বেণ চ সমুচ্চয়ার্থঃ। বিজ্ঞানভিক্ষুস্তু বা শব্দোঽপ্যর্থে, আভ্যামপি চিত্ত প্রসাদনং কুর্য্যাৎ। ইত্যাহ। সূত্রেণানেন প্রাণায়ামশ্চ দোষ নির্হরণ দ্বারেণ চিত্তস্যৈকাগ্রতায়াং সামর্থ্যং সূচিতম্ প্রাণায়ামশ্চ রেচক পূরক কুম্ভক ভেদেন ত্রিবিধ ইতি কেচিৎ তচ্চিন্ত্যং; প্রাণায়ামশ্চ বিজ্ঞেয়ো রেচক পূরক কুম্ভকা ইত্যাদি স্মৃতিভি স্ত্রয়াণামেব মিলিতানাং প্রাণায়ামত্ব কথনাৎ, তত্র প্রচ্ছর্দ্দনেন রেচকঃ, বিধারণেন চ পূরক কুম্ভকাবুক্তৌ; বিজ্ঞান ভিক্ষুস্তু বিধারণাস্য কুম্ভকঃ এবার্থঃ সচ পূরকং বিনা ন সম্ভবতীতি পূরকস্যার্থাগমঃ। প্রাণায়ামস্য চিত্ত অব প্রসাদনপূর্ব্বকস্থিতিসাধনত্বং স্মৃতিপ্রসিদ্ধমেব তথাহি—প্রাণায়ামৈর্দ্দহেৎ দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষানিতি।

অনুবাদ। অথবা প্রাণ বায়ুর রেচন এবং বিধারণ অর্থাৎ পূরক ও কুম্ভক দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিবে।

সমালোচন। আমরা অনেকবার বলিয়াছি শাস্ত্রকারেরা এক একটি কার্য্য সিদ্ধির উপায় নানা প্রকার দেখাইয়াছেন; কারণ সকলেই এক প্রকার উপায়ের অনুষ্ঠান করিতে অক্ষম, কাযেই যিনি যে উপায়কে আপনার ক্ষমতা সাধ্য বিবেচনা করিবেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন। পূর্ব্বে যে উপায় বলা হইয়াছে তাহা চিত্তের বিকাশ দ্বারা অসীম জগতের সহিত এক-প্রাণ হওয়া ভিন্ন আর কিছুই নয় সুতরাং উহার অনুষ্ঠান অতীব দুঃসাধ্য; এই মায়াময় সংসারে যদিও অন্যের মায়া কাটান যাইতে পারে কিন্তু আপনার মায়া কাটান এক প্রকার অসম্ভব বলিলে চলে। কাযেই ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিতে অতি অল্প লোকই সক্ষম। কাযেই উপায়ন্তর বলার আবশ্যক।

পূর্ব্ব উপায়ে যেমন চিত্তের বিস্তারের কথা বলা হইয়াছে, এ উপায়ে ঠিক তাহার বিপরীত। ইহাদ্বারা চিত্তের যতদূর সম্ভব ততদুর সঙ্কোচ করিবার কথা বলা হইয়াছে। জগতের কোন পদার্থের সহিত সম্পর্কের আবশ্যকতা নাই, নির্জ্জন অন্ধকার গৃহে একাকী কেবল নাসিকায় হাত দিয়া বসিয়া নিশ্বাসের সহিত ক্রীড়া করিলেই হইবে। যদি তুমি চিত্তকে বিস্তার করিয়া জগতের সহিত এক প্রাণ হইতে না পার, তাহাতে ক্ষতি নাই, তুমি নির্জ্জন গৃহে একাকী বসিয়া প্রাণায়াম কর, তাহা হইলেও তোমার চিত্ত পাপ শূন্য হইয়া একাগ্র হইবে। প্রাণায়ামের তিনটি ক্রিয়া (১) রেচন অর্থাৎ নাসিকারন্ধ্র দ্বারা অল্পে অল্পে অভ্যন্তরস্থিত বায়ুর নিষ্কাশন, ঐ ক্রিয়াই প্রচ্ছর্দ্দন শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। (২) পূরণ অর্থাৎ নাসিকারন্ধ্র দ্বারা বিশেষ যত্নসহকারে বাহ্য বায়ুর অল্পে অল্পে অভ্যন্তরে প্রবেশন। (৩) কুম্ভক অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রীতিতে পূরণ করিয়া নাসিকারন্ধ্র বদ্ধ করিয়া অভ্যন্তর বায়ুর নিরোধ, বহির্গত হইতে না দেওয়া। মহর্ষি পতঞ্জল পূরণ ও কুম্ভক এই দুইটি ক্রিয়াকেই বিধারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই তিনটি মিলিত হইয়া একটি প্রাণায়াম হয়, কেহ কেহ বা ইহার প্রত্যেকটিকেই প্রাণায়াম বলিয়াছেন। প্রাণায়াম দ্বারা যে চিত্তের একাগ্রতা ও নির্ম্মলতা সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয় কেবল শাস্ত্র প্রমাণ নয়, যুক্তিও আছে। যুক্তি এই যে তখন মন কেবল বায়ুর ক্রিয়াতেই আসক্ত থাকে, কাযেই উহাতে আর কোন বৃত্তিরই উদয় হয় না। প্রণায়ামের বিষয় হঠযোগ দীপিকাতে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছিল দ্বিতীয়াধ্যায়ে যোগাঙ্গের মধ্যে প্রাণায়াম উক্ত হইয়াছে, এখানেও প্রাণায়ামের কথা বলা হইল, অতএব এক প্রাণায়ামের দুইবার কথন হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ

না হয় কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলি এখানে প্রথম যোগ সাধনের বিষয় উক্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্যুত্থান অর্থাৎ যোগ ভঙ্গের বিষয় বলা হইয়াছে; কাযেই বিষয় ভেদ হওয়ায় দোষ নাই।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ॥ ৩৫ ॥

পদচ্ছেদঃ। বিষয়বতী, বা, প্রবৃত্তিঃ, উৎপন্না, মনসঃ স্থিতি-নিবন্ধনী।

পদার্থঃ। বিষয়া গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দা বিদ্যন্তে ফলত্বেন যস্যাঃ সা বিষয়বতী, বা অথবা, প্রবৃত্তিঃ প্রজ্ঞা, উৎপন্না জায়মানা মনসশ্চিত্তস্য স্থিতি নিবন্ধনী স্থিতিং একাগ্রতাং নিবধাতি সম্পাদয়তীতি একাগ্রতাসম্পাদনীত্যত্র।

অন্বয়ঃ। বা (অথবা) বিষয়বতী প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। গন্ধরসরূপ শব্দস্পর্শান্যতমবিষয়িণ্যপি প্রজ্ঞা চিত্তস্য স্থৈর্য্যং সম্পাদয়তীতি বা।

অনুবাদ। গন্ধ, রস, শব্দ, রূপ এবং স্পর্শ এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি বিষয়ের প্রকৃত আস্বাদ জ্ঞান হইলে ও চিত্তের একাগ্রতা সিদ্ধ হয়।

সমালোচন। ভাষ্যকার এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—নাসিকাগ্রে চিত্ত সংযোগ করিলে এক প্রকার দিব্য গন্ধের জ্ঞান হয়; ঐ দিব্য গন্ধ জ্ঞানকে গন্ধ প্রবৃত্তি বলে; এইরূপ জিহ্বাগ্রে চিত্তের সন্নিবেশ করিলে দিব্য রসের জ্ঞান হয়, উহাই রস প্রবৃত্তি; এই পাঁচটি বিষয়ের স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ে চিত্তের সন্নিবেশ অনুসারে সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে এক একটি পৃথক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। ঐ সকল প্রবৃত্তির যে কোন একটা প্রবৃত্তি ও চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিয়া সমাধি লাভের পথ উন্মুক্ত করে। ইহার ভাবার্থ এই যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বিষয়ের ভোগ হয় সেই ইন্দ্রিয়ে মনোনিবেশ করিলে সেই বিষয়ের একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলৌকিক আস্বাদ অনুভূত হয়, তাহাতে মন আকৃষ্ট হইয়া আর অন্যদিকে যায় না, কেবল ঐ বিষয়ের স্মরণ করে, কাযেই উহার একাগ্রতা সম্পাদিত হয়।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

পদচ্ছেদঃ। বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী।

পদার্থঃ। বিশোকা—বিগতঃ শোকো রজঃ পরিণামো যস্যাঃ সুখময়

সত্ত্বাভ্যাসবলাদ্রজোবিপাকরহিতা ইতি যাবৎ, বা অথবা, জ্যোতিষ্মতী, জ্যোতিঃ সাত্বিকঃ প্রকাশঃ স প্রশস্তো ভূয়ান্ বিদ্যতে যস্যাঃ সা।

বা (অথবা) বিশোকা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি রুৎপন্না চিত্তস্য স্থিতি নিবন্ধনী ভবতীশেষঃ।

ভাবার্থঃ। চিত্তস্য ত্রিধৈব স্থিতিঃ। (১) জ্ঞানাত্মিকা, (২) সুখ দুঃখাত্মিকা, (৩) প্রযত্নাত্মিকাচ। প্রযত্ননিয়মাৎ কথং চিত্তস্য প্রসাদনমিতি ত্রয়স্ত্রিংশ সূত্রে দর্শিতং, সুখদুঃখ বৃত্ত্যাত্মকস্য চিত্তস্য কথং প্রসাদনত্তমিতি দ্বাত্রিংশ সূত্রে দর্শিতং। কেবলজ্ঞানাত্মিকায়া বৃত্ত্যা কথং চিত্ত প্রসাদনং ইত্যস্মিন্ সূত্রে দর্শ্যাতে। যদা চিত্তং জ্ঞানে প্রযুক্তং ভবতি তদা জ্ঞান স্বরূপা সাত্বিকঃ প্রকাশঃ চিত্তং ব্যাপ্নোতি, প্রকাশয়তি চ। ইতি ভাবঃ।

অনুবাদঃ। রজ পরিণামের সম্পর্ক শূন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বময় সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ স্বরূপ জ্ঞান বিষয়ক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও চিত্তের একাগ্রতা সংশোধিত হয়।

সমালোচন। এই সূত্রের আলোচনা পর সূত্রের সহিত একত্রে করা যাইবে।

বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

পদচ্ছেদঃ। বীত-রাগ-বিষয়ং বা চিত্তম্।

পদার্থঃ। বীতরাগবিষয়ং—বীতঃ পরিত্যক্তঃ রাগো বিষয়াভিলাষো যেন তৎ বীতরাগং যোগিনাং চিত্তং, তদেব বিষয়ঃ আলম্বনং যস্য তৎ তাদৃশং বা অথবা চিত্তং ব্যাখ্যাতং। কেচিত্তু বীতরাগবিষয় মিত্যেতৎ পদং বীতৌ পরিত্যক্তৌ রাগবিষয়ৌ যেন ইতিব্যুৎপাদয়ন্তি।

অন্বয়ঃ। বা (অথবা) বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তং মনসঃ স্থিতি নিবন্ধনং ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। অথবা প্রথম যোগাভ্যাসার্থী যোগী বীত রাগাণাং কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রমুখানাং সিদ্ধ পুরুষাণাং চিত্ত মালম্বনীকৃত্য স্বচেতসং স্থিরতাং প্রসাধয়েৎ। অন্যেতু বীতৌ পরিত্যক্তৌ রাগ বিষয়ৌ যেন তাদৃশং চিত্তং সন্ন্যাসিন শ্চিত্ত মিত্যর্থঃ সমাধি সিদ্ধয়ে প্রভবতীতি চক্ষতে।

অনুবাদ। বিষয়াভিলাষ শূন্য কোন মহা পুরুষের চিত্তকে আশ্রয় করিয়াও চিত্ত একাগ্রতা লাভ করিতে পারে।

সমালোচন। পূর্ব্বে চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনের নিমিত্ত যে সকল উপায়

বলা হইল যদি কেহ সে সকল উপায়ের অনুষ্ঠানে অসমর্থ হও, তবে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রভৃতি কোন সিদ্ধ পুরুষের চিত্তকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিষয়ই অনবরত চিন্তা করিতে থাক, তাহা হইলেও তোমার চিত্ত অচিরে একাগ্রতা লাভ করিতে পারিবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনুষ্যের চিত্ত নির্ম্মল স্ফটিক কাচের মত; ইহার নিজ সম্মুখে যেরূপ বস্তু থাকে, তাহাই অবিকল চিত্তে প্রতিফলিত হওয়ায় চিত্ত সেই বস্তুর আকার প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে কোন মহাপুরুষের নির্ম্মল চিত্তকে আলম্বন করিলে যোগীর চিত্তও ঠিক তাদৃশ বিরক্ত ও নির্ম্মল স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, কাযেই অনায়াসে স্থিরতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। যদি নিজে নির্দ্দিষ্ট উপায় দ্বারা চিত্তের নৈর্ম্মল্য সাধনে অসমর্থ হও, তবে তাদৃশ কোন নির্ম্মল চিত্তকে ধ্যান কর, তাহলে সেই সিদ্ধ পুরুষের চিত্তের প্রতিবিম্ব পড়াতে তোমার চিত্তও তৎকালে সেই রূপ নির্ম্মল স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে সুতরাং সেই আলম্বনীভূত চিত্তের মত অল্পায়াসে একাগ্রতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

পদচ্ছেদঃ। স্বপ্ন-নিদ্রা-জ্ঞান-অবলম্বনং বা।

পদার্থঃ। প্রত্যস্তমিত বাহ্যেন্দ্রিয় প্রবৃত্তে মনোমাত্রেণৈব' যত্র ভোক্তৃত্ব মাত্মনঃ সঃ স্বপ্নঃ। নিদ্রা তু পূর্ব্বোক্তলক্ষণা। তয়োর্যজ্জ্ঞানং স্বপ্নাবস্থায়াং নিদ্রাবস্থায়াঞ্চ যাদৃশং জ্ঞানং ভবতি তাদৃশং জ্ঞানং আলম্বনং যস্য এবং ভূতং যোগিনশ্চিত্তং বা অথবা।

অন্বয়ঃ। স্বপ্ন নিদ্রা জ্ঞানাবলম্বনং বা যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভত ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। যৎ স্বপ্নে নিদ্রায়াঞ্চ জ্ঞানং তদ্যদি যোগী জাগ্রদবস্থায়াং অবলম্বেত, তথাহি যথা নিদ্রায়াং সর্ব্বেভ্যো বিষয়েভ্যশ্চিত্তং নিবর্ত্ততে তথা জাগ্রদবস্থায়ামপি যদি যোগিনশ্চিত্তং সর্ব্বেভ্যো বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তেত, যথাচ স্বপ্নে সর্ব্ব মিথ্যা তথা জাগ্রদবস্থায়ামপি সর্ব্বং মিথ্যেধতি বিজানীয়াৎ ততঃ সমাধিঃ সিদ্ধতি। বাচস্পতি মিশ্রস্ত্বেবং ব্যাখ্যাতবান, যদা খল্বয়ং স্বপ্নে বিচিত্র সন্নিবেশ বর্ত্তিনী মৃতুকীর্ণামিব চন্দ্রমণ্ডলাৎ, কোমল মৃণাল শকলানুকারিক্তি রঙ্গ প্রত্যঙ্গে রূপেতাং কামপি কামিনীং দৃষ্টা প্রবুদ্ধঃ প্রসন্নমনাস্তদা তামেব স্বপ্ন জ্ঞানাবলম্বনী ভূতাং অনুচিন্তয়ৎ স্তস্য তদেকাকার মনস স্তত্রৈব চিত্তং

স্থিতিপদং লভতে। এবং সুখমহমস্বাপ্স মিতি প্রত্যবমর্ষী ভাবতি তথা ভূত জ্ঞানালম্বনস্যাপি চিত্তস্যৈকাগ্রতা সিদ্ধতি।

অনুবাদ। স্বপ্ন তন্দ্রা এবং নিদ্রাকালীন জ্ঞানকে আলম্বন করিয়াও চিত্ত একাগ্রতা লাভ করিতে পারে।

সমালোচন। স্বপ্ন বলিতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের বৃত্তি সকল বিলুপ্ত হইলে কেবল মনের দ্বারা যে আত্মার ভোগাবস্থা; নিদ্রা ত পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই স্বপ্ন এবং নিদ্রাবস্থায় জ্ঞানকে আলম্বনকারী চিত্তও স্থিরতা লাভ করে। এই কথাটি দুই দলে দুই রকমে প্রকাশন করেন। কেহ বলেন স্বপ্নাবস্থায় যে স্বর্গ, স্বর্গের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি, নন্দনকানন বিহার, মন্দাকিনীতে অপ্সরাগণের সহিত লীলাখেলা ইত্যাদি জ্ঞান হয়, ঐ সকল জ্ঞানের মধ্যে যে কোন জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া চিত্ত একাগ্রতা লাভ করিতে পারে। এইরূপ নিদ্রাবস্থায় যে জ্ঞান, যাহা পরে অনুভূত হয় 'সুখ মহ মস্বাপ্সং।' ইত্যাদি ঐ জ্ঞানকে অবলম্বন করিলেও চিত্তের একাগ্রতা সিদ্ধ হইতে পারে। কেহ বলেন নিদ্রাবস্থার জ্ঞান কিনা—নিদ্রা অবস্থার স্বরূপ জ্ঞান; নিদ্রাবস্থায় যেমন সমুদয় বৃত্তি হইতে চিত্ত নিবৃত্ত হয়, যোগী যদি যদি জাগ্রৎ অবস্থায় ও স্ব চিত্তকে সেইরূপ সমুদয় বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে শেখান, তা হলে অচিরে একাগ্রতা লাভ হয়। এইরূপ স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান যেমন অলীক, এই জগৎও সেইরূপ অলীক, এইরূপ জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া তাহার অনুশীলন করিলেও চিত্ত একাগ্রতা লাভ করে।

যথাভিমত ধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥

পদচ্ছেদঃ। যথা—অভিমত—ধ্যানাৎ বা।

পদার্থঃ। অভিমতং অভীষ্টং অনতিক্রম্য ধ্যান চিন্তনাদ্বা।

অন্বয়ঃ। বা (অথবা) যথাভিমত ধ্যানাৎ চিত্তমেকাগ্রতাং লভতে ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। কিং বহুনাং যদেবাভিমতং হরিহর মূর্ত্ত্যাদিকং তদেবাদৌ ধ্যায়েৎ। তস্মাদাপিধ্যানাতত্র লব্ধ স্থিতি কস্য চিত্তস্যান্যত্রাপি বিবেক পর্য্যন্ত স্থেস্বপু বিনৈব সাধনান্তরং স্থিতি যোগ্যতা ভবতীত্যর্থঃ। কেচিৎ যথাভিমতে বস্তুনি বাহ্যে চন্দ্রাদৌ, অভ্যন্তরে নাড়ী চক্রাদৌ বা ভাব্যমানে চেতঃ স্থিরং ভবতীত্যাহুঃ।

অনুবাদ। আপনার ইচ্ছামত যে কোন বস্তুর ধ্যান করতও চিত্ত একাগ্রতা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সমালোচন। 'মৈত্রী করুণা' ইত্যাদি (৩৩) সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া 'যথাভিমত ধ্যানাদ্বা' (৩৯) এই সূত্র অবধি মনের একাগ্রতা সাধনের উপায় বলা হইল। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই মনের স্থিতি সাধনের নিমিত্ত ছয়টী উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিকারী ভেদে যে উপায় ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা প্রত্যেক সূত্রের 'বা' দ্বারা জানা যাইতেছে। যে যেরূপ অধিকারী হইবে, যাহার শক্তি যেরূপ, সে সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিবে। যোগের মূলভিত্তি চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন; চিত্তের স্থিরতা বা একাগ্রতা না হইলে কখনই যোগের আরম্ভই হইতে পারে না! অতএব এই কার্য্যটি যাহাতে সকল প্রকার অবস্থার লোকই সম্পাদন করিতে পারে, সেইজন্যই এত প্রকার উপায় বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে শেষ উপায়টি অতি পরিষ্কার এবং সহজ। আপনার যে বস্তু ভাল লাগিবে, তাহারই চিন্তা কর, মনের একাগ্রতা হইবে। তুমি, সূর্য্যোপাসক; প্রত্যহ স্বীয় রশ্মি জাল বিস্তার করিয়া ঘোর নৈশ অন্ধকার হইতে জগতের বিমোচনকারী ভগবান ভাস্কর তোমার অভীষ্ট দেব, তাঁহার আরাধনা, তাঁহার ধ্যান তোমার ভাল লাগে, তুমি তাঁহারই ধ্যান কর। তুমি গাণপত্য —সেই সিন্দূরের মত ঘোর রক্তবর্ণ লম্বোদর চতুর্ভুজ গজানন মূর্ত্তিটি তোমার বড় ভাল লাগে, আচ্ছা তুমি তাঁহারই ধ্যান কর। এইরূপ তুমি শৈব হও, তবে সেই রজত গিরির মত বিশাল শিব মূর্ত্তির ধ্যান কর, বৈষ্ণব হও, প্রলয় কালীন মেঘের মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ণু মূর্ত্তি ধ্যান কর, আর তুমি শাক্ত মহা শক্তির ভয়ঙ্করী কালী মূর্ত্তি অথবা পরম মনোহর জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির ধ্যান কর,—যে দেবতা তোমার অভীষ্ট, তাঁহারই ধ্যান কর। ঐ মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে সেই মূর্ত্তিটি তোমার মনে অঙ্কিত হইলে, তোমার চিত্ত সেই আকারে পরিণত হইয়া তদাকার প্রাপ্ত হইবে, আর কোন বস্তুর জ্ঞান হইবে না, কাযেই চিত্ত হইতে অন্য বৃত্তি গুলি দূরীভূত হইবে। তা হলেই তোমার চিত্ত স্থির হইবে।

আধুনিক তান্ত্রিক হঠ-যোগ-কারীরা বলেন যে নাড়ী চক্রের মধ্যে যেরূপ ইচ্ছা চিন্তা করিলেও, মনের স্থিরতা হয়। এই নাড়ীর চক্রের চিন্তাকে তাঁহারা অজপারূপ বলেন। উহার প্রক্রিয়া এইরূপ; আপনার যত শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া হয় সেই সকল ক্রিয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করাই যোগীর প্রধান লক্ষ্য। একদিনের

প্রাতঃকাল হইতে অপর দিনের প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমাদের যত শ্বাস প্রশ্বাস হয়, তাহার সংখ্যা একুশ হাজার ছয় শত। তা হলে প্রত্যেক শ্বাস এবং প্রশ্বাস ক্রিয়াতে চারি সেকণ্ড করিয়া লাগে। এই প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া এক একটী গায়ত্রী মন্ত্রের স্বরূপ; এই নিমিত্ত সমুদয় শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার নাম অজপা ... মন্ত্র উচ্চারণ শূন্য গায়ত্রী জপ। এই কল্পিত গায়ত্রী জপ নাড়ী চক্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিপতিরূপে কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুষ্ঠিত হয়। নাড়ীর চক্রের অধোভাগে মূলাধার নামক একটি স্থান আছে, গণপতি তাহার অধীশ্বর; ঐ গণপতির আরাধনার্থ ছয় শত শ্বাস এবং প্রশ্বাস ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। লিঙ্গের সমীপে স্বাধিষ্ঠান নামক স্থান আছে, উহার অধিপতি ব্রহ্মা, তাঁহাকে ছয় সহস্র শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া অর্পিত হয়। এইরূপ সমুদয় নাড়ী চক্রের বিশেষ বিশেষ স্থানের অধিপতি বিশেষ বিশেষ দেবতার নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার অর্পণের কথা আছে। এরূপ পথ অতি জটিল; মহর্ষি পতঞ্জলি স্বীয় যোগানুষ্ঠানের এরূপ কঠিন পথ, বোধ হয়, কখন মনে করেন নাই।

ভাল উক্ত উপায় আশ্রয় দ্বারা যেন মনের একতা সিদ্ধ হইল, চিত্তের একাগ্রতা হইলে লাভ কি? আমি যে যত্ন করে চিত্তের একাগ্রতা সিদ্ধ করিব, তাহাতে আমার কি ফল লাভ হইবে? এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত মহর্ষি পতঞ্জলি পর সূত্রের অবতারণা করিলেন। যথা—

পরমাণু পরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

পদচ্ছেদঃ। পরমাণু পরমমহত্ত্ব—অন্তঃ, অস্য, বশীকারঃ।

পদার্থঃ। পরমাণুর্নামাতি সূক্ষ্মঃ পদার্থঃ যস্মাৎ সূক্ষ্মতরং বস্ত্বন্তরং ন বিদ্যতে, পরমমহত্ত্বঞ্চাতিস্থূলং যস্মাৎ স্থূলতরং ন কিমপি বর্ত্ততে তয়োর্ভাবঃ পরমাণু পরমমহত্ত্বং তদেবান্তো যস্য সঃ পরমাণু পরমমহত্ত্বান্ত ইতি বশীকারস্য বিশেষণং, অস্য চিত্তস্য বশীকারো নাম কামচারাঽপ্রতিরোধঃ, বিধেয়ত্বমিতি যাবৎ।

অন্বয়ঃ। অস্য পরমাণু পরমমহত্ত্বান্তো বশীকারোভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। এভিরুপায়ৈশ্চিত্তস্য স্থৈর্য্যং ভাবয়তো যোগিনঃ সূক্ষ্মবিষয় ভাবনাদ্বারেণ পরমাণ্বন্তঃ বশীকারঃ অপ্রতিঘাতরূপো জায়তে, কচিৎ পরমাণু পর্য্যন্তে সূক্ষ্মে বিষয়েঽস্য মনো ন প্রতিহন্যাৎ ইত্যর্থঃ, এবং স্থূলমাকাশাদিপর্য্যন্তং ভাবয়তো ন কচিৎ চেতসঃ প্রতিঘাত উৎপদ্যতে সর্ব্বত্র স্বাতন্ত্র্যং ভবতীত্যর্থঃ।

অনুবাদ। (উপরি উক্ত যে কোন উপায় দ্বারা চিত্তের স্থিরতা সিদ্ধ হইলে এই জগতের মধ্যে) সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তু হইতে সর্ব্বোপরি স্থূল বস্তু পর্য্যন্ত সমুদায় বস্তুর উপর চিত্তের বশীকার অর্থাৎ আধিপত্য লাভ হয়।

সমালোচন। পূর্ব্বে চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনার্থ যে সকল উপায় কথিত হইল, উহাদের মধ্যে নিজের সামর্থ্য ও অভিরুচি অনুসারে যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া চিত্তকে একবার স্থির করিতে পারিলে, সে চিত্ত এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কি পরম সূক্ষ্ম অথবা কি মহাস্থূল যাবতীয় পদার্থ অবাধে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। আজকাল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিন্দুমাত্র জলের মধ্যে অদ্ধ বিন্দু শোণিতের মধ্যে, গৃহের সূক্ষ্ম রন্ধ্র দ্বারা পতিত প[illegible] আন্দোলিত সূ[illegible] বহু [illegible] দেখিয়া চমৎকৃত [illegible]টে, এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের [illegible] অপেক্ষাও সুদূরাস্থিত বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর গ্রহের কেবল [illegible] তাহাদের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণকারী উপগ্রহগুলি অবধি সুচারুরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেও সমর্থ হই বটে; কিন্তু সেই অবধিই তাহাদের শক্তির পর্য্যবসান হইয়াছে; অণুবীক্ষণ যন্ত্র কীটাণু অবধিই দেখাইতে সক্ষম এবং দূরবীক্ষণের গতি নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব অবাধই হইয়া থাকে, তাহার অধিক নয় এবং উভয়ই আলোকের সাহায্য অপেক্ষা করে। আলোক না থাকিলে কি অণুবীক্ষণ কি দূরবীক্ষণ কাহারই কার্য্যকারিতা থাকে না। কিন্তু স্থিরতা প্রাপ্ত চিত্ত কীটাণু কি, কীটাণুদিগের প্রত্যঙ্গ সঞ্চারী শোণিত কণার মধ্যে যে অমেয় কীটাণু ক্রীড়া করে, তাহাদিগেরও শোণিতে অসংখ্য কীটাণু দেখিতে সমর্থ হয়; এই রূপ দূরবীক্ষণ বড় বেশী তোমার মস্তকোপরি গগণমণ্ডলে বিরাজমান জ্যোতিষ্কদিগের সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করাইতে সক্ষম, তাহার অধিক নয়, তাহার ঊর্দ্ধে, নিম্নে, পার্শ্বে যে অনন্ত আকাশে অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র অনন্ত কাল হইতে বিরাজমান সে সমস্ত দূরবীক্ষণের সাহায্যে কখনই পরিলক্ষিত হ[illegible] কিন্তু স্থিরতা প্রাপ্ত চিত্ত, মনুষ্য হৃদয়ে যাহার পরিমাণ ধারণা করিতে অ[illegible] সেই মহাকাশে তরঙ্গায়িত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয়। তুমি প্রাণপণ করিয়া তাড়িত বার্ত্তাবহের সাহায্যে একদিনের মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্যের ক্রিয়া যদি জানিতে পার ত তোমার চূড়ান্ত বাহাদুরী হয় কিন্তু একাগ্রতা প্রাপ্ত চিত্ত কেবল মনুষ্যের নয়, কেবল এই নদ নদী গিরি কানন সমুদ্রাদি ও তৎ তৎ স্থানস্থিত জীব অজীব সমাকীর্ণ বাহ্য জগতের

নয়, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরের বস্তু নিচয়ের উপাদানীভূত পরমাণুপুঞ্জ প্রত্যেকে প্রতিস্তরে কি ভাবে কার্য্য করিতেছে তাহাও এক কালে দর্শন করিতে সক্ষম। ফল একাগ্রতা প্রাপ্ত চিত্তের গতিরোধক কেহ নাই। যোগীর যখন যে বস্তু জানিতে ইচ্ছা হয়, উহা দ্বারা তখনই সেই বস্তুর জ্ঞান করিতে সমর্থ হন। একাগ্রতা প্রাপ্তিই চিত্তের সম্পূর্ণতা লাভ। একাগ্রতা প্রাপ্ত হইলে চিত্ত সম্পূর্ণ বিমল ভাব ধারণ করে, তখন আর উহার পরিশোধনের নিমিত্ত অভ্যাসাদির অনুষ্ঠান অপেক্ষিত হয় না।

মূর্খ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নীলার ভয়ঙ্কর জ্বর হইয়াছে, এ জ্বর আর ছাড়িতেছে না। বিনোদ নীলাকে ফেলিয়া বিশু বাবুর বাড়ী রাঁধিতে যাইতে পারেন না, এদিকে ঘরেও কিছু খাইবার নাই। দুদিন রাতে বিনোদ শুদ্ধ জল পান করিয়া আছেন। নিষ্ঠুর গ্রামে এমন লোক নাই যে একবার আসিয়া ইহাদের দশা দেখিয়া যায়।—সকলেই স্বার্থপর, আপনার লইয়া ব্যস্ত, সুতরাং বিনোদিনী একবার বিশু বাবুর বাড়ী, একবার কবিরাজের নিকট, অনাহারে এবং চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়াও ছুটোছুটি করিয়াছেন ও কতজনের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছেন, কেহই আসে না। কেবল দিবসে, নীলার সঙ্গে যে সকল গ্রামস্থ বালক বালিকা খেলা করে, তাহারা দেখিতে আইসে, এমন কি কেহ দুখানি বাতাসা, কেহ এক টুকরা মিছরি, কেহ বা একটা দাড়িম বা পেয়ারা নীলার জন্য লইয়া আইসে, এবং আপন আপন ক্ষুদ্র দেহে বিনোদিনীর যথাসাধ্য সাহায্য এবং নীলার শুশ্রূষা করিয়া থাকে।

আহা এই জন্যই কি বালিকাগণ হিন্দুদিগের অর্চ্চনীয়া। এই জন্যই কি

ইহারা মহামায়ার অবতার বলিয়া প্রবাদিত। বালক বালিকারা স্বর্গীয় প্রকৃতি বিশিষ্ট, উহারা দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি কিছুই বুঝে না। উহারা সদাই প্রেমে ভোর, সদাই আনন্দময়, উহাদের শত্রু মিত্র ভেদ নাই, আপন পর ভেদ নাই—উহারাই মহৎ,—চৈতন্যের মহাপ্রেম, বুদ্ধ দেবের অহিংসা,—উহারাই শিক্ষা দিয়াছে; নহিলে এ হেন প্রেত-পূর্ণ স্থানেও বালক বালিকায় সেই স্বর্গীয় ভাব কেন! সেই প্রেমের অজস্র ধারা নীলার কুটীরে বহিবে কেন? গৈরাং যথার্থই বলিয়াছেন—

বিষ-দন্ত কাল, যত দংশে—
বালকের কোমল শরীরে,
দিয়ে বিষ, হরে তার মধু।
কাল চাহিনা তোমারে ভাই?
ক্ষীর-বিষে নাহি প্রয়োজন।
দাও তব তীব্র হলাহল—
—এখনি ঢালিয়া করি পান—
—যাই চলি যথা নাই তুমি।"

এই বিপদ কালে, এই ভীষণ পশু দলের হিংসা দ্বেষ, ক্রোধ, স্বার্থপরতা জালে জড়িত হইয়া, কেবল কোমল বপু—ক্ষুদ্র দেব দেবী বৃন্দের কোমল কৃপাই বিনোদিনীর এক মাত্র ভরসা স্থল হইয়াছে।

এইভাবে দুদিন গেল; দেখিলেন, টাকা বই আর উপায় নাই। ভাবিলেন, বিশুর মাতা কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট যে গলার চিক্ ও হাতের অনন্ত রহিয়াছে, তাহার একখানি বেচিয়া যাহা পাইব, তাই দিয়া নীলার চিকিৎসা ও নিজের আহার চলিতে পারিবে।

এই মনে করিয়া অতি কষ্টে বিশু বাবুর বাড়ী গেলেন; তাঁহার মাতা মালা জপ করিতেছেন; প্রথমত—যাইয়া বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা বিবৃত করিলেন; দুরবস্থার কথা শুনিয়া বৃদ্ধার শুষ্ক মুখের একটি কৈশিকা কি একখানি পেশীও নড়িল না, কাঁপিল না; বুড়ী শুষ্ক কণ্ঠে ধীরে বলিল,—"এখনকার কি, তাই বল, বেশী কথা শুনিতে গেলে আমার জপের গোলমাল বেধে যায়; কি বলবে বল?"

বিনোদ বলিলেন, "আর বলবার কি আছে,—আমার গয়না ক খানি চাই"—

"গয়না চাও? তোমার গয়না? না———"

"আমার গয়না বৈ আর কার গয়না চাইতে আস্‌ব।"

"কার কাছে রেখেছ, বোয়ের কাছে না বিশুর কাছে?"———

"বোয়ের কাছে না বিশুর কাছে" এই সর্ব্বনেশে প্রশ্ন শুনিয়াই বিনোদের মাতায় বজ্রপাত হইল। গলা শুকাইয়া গেল। একটু পরে, কাশিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আপনারই কাছে রেখেছি।"

"কি আমার কাছে রেখেছিস্‌—এত বড় মিথ্যা কথা, ছেনাল মাগী। আমি চোর,—এত বড় আস্পর্দ্ধা ধত্তো রে কে আছিস বাড়ীতে"—এই গোলমাল শুনিয়া বিশু বাবুর স্ত্রী এবং দুই তিন জন দাসী দৌড়িয়া আসিল, বুড়া আরো অধিকতর ক্রোধে বিনোদের উপর গালি বর্ষণ করিতে লাগিল।

একটি দাসী স্বভাবত মুখরা ও নির্ভীকা,—বিনোদের দশা দেখিয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিল, "কেন—বউ ঠাক্‌রাণ—তুমিও ত সে দিন বলেছিলে, এখনও ভূতোর মার দু তিনশ টাকার গহনা আমাদের কাছে আছে—তাথাকে ত, তবে আর দাঁড়িয়ে এ তামাসা দেখছ কেন—দাওনা ফেলে?"

"এঁ, আমি কবে বলেছি,—হারামজাদী আমার নামে মিথ্যা কথা, আমি ইচ্ছা করিলে এখনই তোকে ঝাঁটা মেরে দূর কত্তে পারি।" এই বলিয়া বিশু বাবুর স্ত্রী তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

মুখরা দাসীর নাম রমা। রমা কাঁদিয়া বলিল 'হা ধর্ম্ম! তুমি কি এ দেশে নাই।'

বিনোদ তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, যে রমা দাসীর বদনে স্বর্গীয় ভাতি জ্বলিতেছে। ধীরে অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, 'রমা—বিধাতা কেন তোমায় দাসী করিয়াছে!' রমা কিছু বলিল না, তথা হইতে চলিয়া গেল।

বিনোদ আর সেখানে থাকা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া তিনিও ধীরে ধীরে বাড়ীতে আসিলেন। অঙ্গুরীর ব্যাপারে যতদূর দুঃখিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন, এ বারে সেরূপ হইলেন না. কেবল মনে মনে এই বলিলেন, 'জগদীশ যদি, অনাহারে ও অচিকিৎসায় মারিবার ইচ্ছা থাকে, তবে মার, তোমার উপর আত্ম সমর্পণ করিলাম।' বিধাতার উপর আত্ম সমর্পণ করিয়া, তাঁহার হৃদয়-ভার একটু লঘু হইল।

বাড়ীতে যাইয়া দেখিলেন—একখানি (পেইড্‌) ডাকের চিঠি ঘরের দাবায়

রহিয়াছে। চিঠিখানি তাঁহার মাতুলালয়ের এক সমবয়সিনী লিখিয়াছেন। চিঠিতে আর আর সংবাদের পরে লেখা আছে "আমার স্বামীর পত্রে জানিলাম, ২২শে আষাঢ় সন্ধ্যার সময়, সোডানের সমর ক্ষেত্রে আমাদের গ্রামের ভুবন ডাক্তার কাটা গিয়াছে।"

বিনোদ চিঠি পড়িয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন, কেননা, ঠিক সেই তারিখে সেই সময়ে ভুবন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলে, "ভুবন! 'আর একবার শেষ দেখা দিব, কিন্তু এ শরীরে নয়'—এই সত্য পালন করিতে কি মরিয়াও তুমি আমার দেখা দিলে? মহাপুরুষ, তোমারই প্রণয় প্রগাঢ়! হায় কেন এই প্রণয় দেশের হিতে অথবা ঈশ্বরে স্থাপন করিলে না, তুমি মহাপুরুষ হইতেও মহাপুরুষ হইতে পারিতে।"

সপ্তম অধ্যায়।

বিনোদ পত্রখানি পাঠ করিয়া, নীলার পার্শ্বে বসিয়া নানা চিন্তায় জর্জ্জরিত হইতেছেন, এমন সময় ধীরে ধীরে রমা আসিয়া চুপে চুপে বলিল "ঠাকুরাণী ঈশ্বর প্রসাদে এ দিন আপনার থাকিবে না,—আপনি সারা দিন অনাহারে আছেন, তার উপর গয়না ক খানির শোক, তা যা হোক এই ধরুন"। বলিয়া এক সের চাউল কয়েকটি বেগুন ও আলু দিয়া কহিল "যান—আপনি পাক করুণ, আমি নীলার কাছে বসি"—

বিনোদের চক্ষে অশ্রুধারা বহিল,—বলিলেন, "রমা তোমার শরীরে যত দয়া তার ষোল ভাগের এক ভাগও কি তোমার মুনিব সংসারের কারো হৃদয়ে নাই?"—

রমা হাসিয়া বলিল, "গৌণ করিবেন না, যান রান্না ঘরে, আমি অনেকক্ষণ থাকিতে পারিব না।"

বিনোদ পাক গৃহে গেলে, রমা অস্থি চর্ম্মাবৃত নীলার পার্শ্বে বসিয়া রহিল। নীলা একবার চক্ষু মেলিয়া বলিল "মা আজ কি তুমি খাবে না?" রমা বলিল, "তিনি ও ঘরে পাক করিতেছেন।" নীলা দেখিল এ মা নয়, এক

দৃষ্টের রমার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। কিছু কাল পরে বলিল, "মা,কি বাড়ীতে আজ রাঁধে।" রমা "হাঁ" বলিয়া নীরব হইল। সহসা নীলার মুখ প্রফুল্ল ও লাবণ্য বিশিষ্ট হইল। এই প্রফুল্ল বদন দেখিয়া রমা বুঝিতে পারিল, যে বাড়ীতে বহুকাল উনন জ্বলে নাই, সেই বাড়ীতে আজ মা রাঁধিতেছেন,—এই কথা শুনিয়াই নীলা এত পীড়িতা অবস্থায়ও খুসী হইয়াছে। রমা ঠিক বুঝিয়াছিল; কেননা একটু পরেই নীলা হাসিয়া বলিল "রঁমা মা রাঁধিতেছে—আমায় তুলিয়ে নে দেখাতে পারিস ?" রমার চক্ষে জল আসিল বলিল, "তোমার যে দুর্ব্বল শরীর, আর যে জ্বর, তোমায় বাইরে নিয়ে গেলে শরীর আরো খারাপ হবে, জ্বর আরো বেশী হবে, তুমি যেও না মা, তুমি এই গুলি নিয়ে খেলা কর।" এই বলিয়া ট্যাক হইতে খুলিয়া কি কতগুলি ভারি পদার্থ নীলার হস্তে দিল; নীলার প্রসারিত ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ হাত নুয়াইয়া পড়িল। নীলা বিস্মিত হইয়া বলিল "রমা তুই এত টাকা কোথায় পাইলি ?"

রমা বলিল "টাকা তোমার মায়ের, এই টাকা দিয়া কবিরাজ আনিয়া তোমাকে ভাল করিবেন।"

নীলা কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি আপনি ভাল হব, এ টাকা থাকিলে, মা আর পরের বাড়ী রাঁধিবে না।" নীলার গণ্ড বহিয়া এক স্রোত অশ্রু পড়িল।

বালিকা মরিতে চাহে, তথাপি মায়ের কষ্ট দেখিতে চাহে না; বালিকার মনের এ ভাবও রমা বুঝিতে পারিল। হাসিয়া তাহার গালে চুম খাইয়া বলিল,—"আর তোমার মা পরের বাড়ী যাইবে না,—এত সামান্য, তাঁর আরো টাকা আছে।" নীলা এই কথা শুনিয়া চক্ষু মুদিয়া—ভাবিতে লাগিল এ কি স্বপ্ন ? বালিকা ঘুমাইল; স্বপ্নেও তাহাই দেখিতে লাগিল। টাকা গুলি ছড়াইয়া বিছানার এক পাশে রহিল। রমা তাহা একত্র করিয়া নিদ্রিতা বালিকার অঞ্চলে বান্ধিয়া বালিশের নীচে গুঁজিয়া রাখিল।

বিনোদের রন্ধন হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমা তোমার জায়গা করি ?" রমা বলিল, "আপনি আগে খান, পাতে যা থাকে আমি প্রসাদ পাইব।"

এত দুঃখ ও ক্ষতি হইলেও বিনোদ আজ অতি পরিতৃপ্ত হইয়া উদর পূরিয়া সিদ্ধান্ন ভোজন করিলেন—বহুকাল স্বামী গৃহ তলে এ কাজ হয় নাই। স্ব গৃহে স্ব পাক—এতই মধুর!

অষ্টম অধ্যায়।

বিশু বাবু একটি দাসী আনিতে বলেন, ভূতনাথের পিতা কিছুদিন ত্রিপুরায় ছিলেন, তিনি তথা হইতে একটি পাহাড়ী স্ত্রীলোক আনিয়া দেন। তাহার একটি কন্যা ছিল। পার্ব্বতী রমণী মরিয়া গিয়াছে; তাহার সেই কন্যাটি এখন বড় হইয়াছে; তাহারই নাম "রমা।"

রমা শৈশবে এ দেশে আসিয়াছে; তাহার আহার ব্যবহার কথা বার্ত্তা সকলই বাঙ্গালীর মত হইয়াছে। এখন তাহার বয়েস আঠার বৎসর। রমা অতি সুন্দরী; তাহার বর্ণ পদ্ম ফুলের মত; মাথায় অনেক চুল; চক্ষু একটু ছোট হইলেও—বর্ণ অপরাজিতার তুল্য ও অতিশয় উজ্জ্বল; ভ্রূ অল্প; কেবল দোষের মধ্যে নাসিকা কিঞ্চিৎ চাপা,—কিন্তু অন্য সকল পার্ব্বতী রমণীর ন্যায় তত চাপা নহে; ওষ্ঠ লাল ও সুন্দর; দন্তগুলিও পরিপাটী। শরীর বলশালী এবং বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট, কিন্তু সুদীর্ঘ ও স্থূলাবয়ব নহে।

রমার প্রকৃতি স্বাধীন, দয়া পূর্ণ এবং ক্রোধ পূর্ণ। মিথ্যা কথা কহিবার বা সহিবার অভ্যাস নাই। সকলেই উহাকে ভাল বাসে। কেহ বাসে গুণের জন্য, কেহ রূপের জন্য। কিন্তু রমা নিজে রূপের গৌরব কিছুই করে না। অথবা লোক যে রূপ-পিপাসী হয় ইহাও তাহার বিশ্বাস নাই। কেননা অদ্যাবধি কাহারো—রূপে সে মুগ্ধা হয় নাই। যদি কাহাকেও রমা ভাল বাসিয়া থাকে, তবে সে তাহার দুঃখের জন্য। কত দুঃখীকে রমা ভাল বাসে, তাহার সংখ্যা নাই। শুদ্ধ মানুষকে যে, সে ভাল বাসে এমন নহে,—জীব জন্তুও তাহার ভালবাসার পাত্র। সে খাইয়া যখন বড় এক থালা ভাত লইয়া বাহির হয়, তখন কত পাখী উড়িয়া তাহার স্কন্ধে ও মাথায় আসিয়া বসে, কত বিড়াল কুকুর তাহার রক্ত পদতলে আসিয়া দাঁড়ায়।

রমা বুঝিয়া রাখিয়াছে টাকা না হইলে পরের উপকার করা যায় না; এই জন্য রমা টাকার লালসা করে, নতুবা, শুদ্ধ খাইতে পরিতে পাইলেই সে সন্তুষ্ট থাকিত।

রমাকে পুরুষ মাত্রেই ভাল বাসে, এই জন্য সে, যাহারা দিতে পারে, তাহাদের কাছে টাকা চাহিয়া লয়, সুতরাং রমা চাহিলেই টাকা পায়। রমা দাসী বটে, কিন্তু সে অনেক দাসের রাণী। এলিজেবেথের ন্যায় রাণীর এসেক্স, সসেকস্, লিষ্টর পদানত। যে বলে, যে চতুরতায়, এলিজেবেথ,

ইংলণ্ডের স্বাধীন সাম্রাজ্য শাসন করিতেন, সেই বলে, সেই চতুরতায়, রমা দুঃখীর দুঃখ নাশ করিয়া থাকে।

বিশু বাবু পাষাণ ও কৃপণ হইলেও রূপ-পিপাসায়, তিনিও রমাকে ভাল বাসেন, চাহিলে টাকা দেন। কিন্তু রমা তাঁহাকে মুনিব হইলেও হিংস্রক জন্তুর ন্যায় ভয় ও ঘৃণা করে। বিশু বাবু কেবল এই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি রমাকে যত ভাল বাসেন, সে তাঁহাকে ততটা ভাল বাসে না। কেননা একদিন তাঁহার পত্নী পিত্রালয় গেলে, রমা তাঁহার শয়ন গৃহে পান দিতে গিয়াছিল, তিনি পান লইবার ছলে রমার গালে চুম্বন করেন, রমা ক্রোধে তাঁহাকে শূন্যে তুলিয়া বলিয়াছিল—"খবরদার, দোতালার নীচে ফেলিয়া দিব।"—তথাপি তিনি উহার রূপে এত মুগ্ধ যে, দীর্ঘকাল তাহাকে বাটীতে না দেখিলে ছটফট করেন, এবং আর কাহাকে ভালবাসে, সেইখানে গিয়াছে, এই সন্দেহে, আসিলেই প্রহার করেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যে মধুর চুম্বন সহিতে পারে না, সে অনায়াসে এই প্রহার সহ্য করে।

পাঠক যদি মনে করেন রমা দুষ্কর্ম্ম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে,—সেই ভয়ে রমার জন্য এত মসী ব্যয় হইল। চাহিলে পাইত বলিয়াই রমা টাকা চাহিয়া লইত। তাহার এক পয়সাও অসৎ কার্য্যে উপার্জ্জিত বা অসৎ কার্য্যে ব্যয়িত হইবার নহে।

নবম অধ্যায়।

আহারান্তে বিনোদ নীলার কাছে গিয়াছেন, রমা তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট খাইয়া গৃহ পরিষ্কার করিতেছে। এমত সময় কে আসিয়া তীব্র কণ্ঠে "রমা! রমা! তুই এখানে"—বলিয়া প্রাঙ্গন মধ্যে দাঁড়াইল। কণ্ঠের কর্কশ ধ্বনিতে বাটী কম্পিত হইল। নীলা কাঁদিয়া জাগিল। রমা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, বিশ্বনাথ চৌধুরী বনামে বিশু বাবু। রমা ভ্রূক্ষেপও করিল না,—আপন কাজ করিতে করিতে দৃঢ় স্বরে উত্তর করিল—

"এখানে,"

"এখানে কি করিতেছিস,"—এই বলিয়া বিশু উন্মত্তের ন্যায় যাইয়া রমার চুল ধরিল,—রমা বলিল,—

"ছেড়ে দাও, তোমার বউ আমায় তাড়িয়েছে—আর তোমার বাড়ী যাব না"—

"যাবি নে,—কুটনীর বাড়ী থাকিবি, মনে করেছিস্" বিশু বাবু এই বলিয়া প্রহার আরম্ভ করিল। রমার ক্রোধ হইল; এই প্রথম ক্রোধ, আগে এরূপ অনেক প্রহার সহিয়াছে—আজ তাহা পারিল না। এ বাঙ্গালীর ক্রোধ নহে, এ সেই পার্ব্বত্য ক্রোধ। রমা ভীষণাকার ধারণ করিয়া প্রথম আপন চুল গুচ্ছ বিশ্বনাথের মুষ্টি হইতে ছাড়াইয়া লইল। পরে তাহার মাথায় এমন কঠিন চপেটাঘাত করিল, যে বিশ্বনাথ ঘুরিয়া ভূমিশায়ী হইল,—বিনোদ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন "রমা কি করিস"—রমা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া পতিত বীরের মুখে আর একটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়া—সক্রোধে নীরবে প্রস্থান করিল।

বিনোদ হতবুদ্ধি হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইতি মধ্যে বিশ্বনাথ ধূলি ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়াই সম্মুখে বিনোদকে পাইয়া নিরপরাধিনী বিনোদের প্রতি আক্রমণ করিল। বিনোদের চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশীরা আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং এই নৃশংস ব্যাপারেরও উপসংহার হইল। বিনোদ লজ্জায় অভিমানে এবং বেদনায় কান্দিতে কান্দিতে গৃহ মধ্যে লুক্কায়িতা হইলেন।

যে কয়েকজন ভদ্রলোক ও ছোট লোক আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে, রামধন নামে পরিণত বয়স্ক একজন চণ্ডাল আসিয়াছিল, সে বলিল, "বাবু— যার ভাত, গাঁয়ের লোকে খেয়ে মানুষ হয়ে গেছে, যার টাকায় গাঁয়ের লোক টাকাওয়ালা,—আজ তুমি তানার ব্রাহ্মণীর গতরে হাত তুল্লে—তানার কেউ থাকলে পাত্তে না"—

"শালা যত বড় মুখ, তত বড় কথা," এই বলিয়া বিশু বাবু পুনরায় সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। দুর্ভাগ্য বশত যুদ্ধ হইল না, সকলে ধরিয়া থামাইয়া দিল।

তখন রামধন বলিতে লাগিল—"বাবু কি কব তোমারে, তোমার বাবা মোকে রামধন দাদা বলে কথা কইতো, আর তুমি বল শালা,—তোমার ঠাকুদ্দাদা বাড়ী বাড়ী পূজো করে চাল কলা এনে খেত, তুমি হয়েছ জমীদার।

শালা বল্‌বে না কেন ?—খাজনা দিয়া মাটিতে বসত করি, না হয় উঠে যাব, যারে খাজনা দেব, সেই মাটি দেবে,—অত জায় রেজায়ের ধার ধারি না।”

অপর যে সকল লোক আসিয়াছিল তাহারা বিশু বাবুকে লইয়া চলিল—বিশু বাবু যাইবার বেলা, রামধনের দিকে চাহিয়া বলিয়া গেল, “বেটা তোকে দেখিব,” রামধন বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া তাহার উত্তর দিল। বিশু বাবু তাহা দেখিতে পাইল না।

জনারণ্য পরিষ্কৃত হইলে, রামধন রোরুদ্যমানা বিনোদের নিকট আসিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিল, “মা এ গাঁয়ে মানুষ নাই, মুই আগুতে এলে, কোন শালা আপনার গতরে হাত তোলে, একবার দেখে নিতুম—মা আজ তুমি দুঃখী হয়েছ, তুমি যা ছিলে তাত মুই জানি—মা তুমি দুঃখ করো না; বেটা বাঁচি থাকলে, আবার তোমার সুখ হবে। মা চণ্ডাল বলে—রামাকে ঘৃণা করো না, মুই তোমার পায়ের নফর, তু করে ডাকলেই হাজির হব।”

বিনোদ নিজের দুঃখ ভারে সদাই ম্রিয়মাণা হইয়া থাকিতেন, কখন কাহার সঙ্গে কথা কহিতেন না, আজ তিনি রামার সঙ্গে একটি মাত্র কথা কহিলেন,—

“রাম কে বলে তোমায় চণ্ডাল, তুমিই ব্রাহ্মণ।”

রামা অশ্রু মুছিতে মুছিতে ভূমিতলে পড়িয়া অতি ভক্তি সহকারে একটি প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

দশম অধ্যায়।

বিনোদ সীতার পার্শ্বে বসিয়া নীরবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কান্দিলেন; পরে উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে বসিলেন। এমন সময় কে ধীরে ধীরে পা টিপিয়া আসিয়া দাঁড়াইল; বিনোদ চাহিয়া দেখিলেন রমা,—এবারে রমার আবার দয়া পূর্ণ শান্ত মূর্ত্তি।

বিনোদ চমকিয়া উঠিলেন; রমা ইঙ্গিতে তাঁহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিয়া চুপে চুপে কহিল, “ঐ বালিশের নীচে কাপড়ে বান্ধা যাহা পাইবেন, তাহা দিয়া নীলার চিকিৎসা করাইবেন, এবং নিজেও যতদিন চলে বাড়ীতে

রান্ধিয়া খাইবেন,—আমার সহিত আবার দেখা হইবে, এখন দাসী চলিল"—এই বলিয়া বিনোদের পদধূলী মাথায় লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। বিনোদকে কিছুই বলিবার অবকাশ দিল না।

বিনোদ বিস্মিতা হইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। বালিশের নীচে কি আছে দেখিবার জন্য কৌতূহল জন্মিল। ধীরে ধীরে নিদ্রিতা লীলার বালিশের নীচে হাত দিয়া যাহা ছিল তাহা আনিয়া দেখিয়া আরো বিস্মিতা হইলেন।

মনে মনে বলিলেন, "রমা কি মানুষী না দেবী? রমা আমায় তার সর্ব্বস্ব দিয়া গিয়াছে?" পরে একটি একটি করিয়া গণিয়া দেখিলেন—বায়ান্ন টাকা ও দুটী সিকি ও একটি দুয়ানী। টাকা গুলি পাইয়া তাঁহার পূর্ব্ব সুখের কথা মনে পড়িল, চক্ষে জল আসিল।

* * * * * * *

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া উহার দুটী সিকি একটি দুয়ানী এবং চারিটি টাকা বাহিরে রাখিয়া অবশিষ্ট, একটি ছোট মেটে ঘটে পূরিয়া ঘরের মেঝেয় প্রোথিত করিলেন। এ বারে আর সাহস করিয়া অপরের নিকট রাখিলেন না। তৎপর পরিষ্কার করিয়া গৃহ লেপন করিয়া, কবিরাজের বাড়ী গমন করিলেন।

কবিরাজের নাম বংশীধর চক্রবর্ত্তী—কলিকাতায় রমানাথ প্রভৃতি যে শ্রেণীর কবিরাজ ছিলেন, ইনি সে শ্রেণীর কবিরাজ নহেন। চরক সুশ্রুত প্রভৃতি পড়া থাকিলেও ইনি একজন সাধারণ কবিরাজ, কিন্তু ধরণটা বড় একটা ডাক্তারের মত। বুট জুতা, সাহেবী কোট, কোটের পকেটে একটি থরমোমিটার ও হাতে একটি ষ্টেথস্কোপ না হইলে ইঁহার চলে না। চিকিৎসা প্রণালীও ঐরূপ নববিধান গোচের। কবিরাজ, হাকিমি, হোমিওপেথি, এলোপেথি সকলই ইঁহার দ্বারস্থ। বয়েস চল্লিশের নীচে, চেহারাটা জাঁকাল বটে।

বংশীধর প্রাতে উঠিয়া "মহাজ্বরহস্তারক" বটিকা প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহার এই মহৌষধের গুণে দেশে বিলক্ষণ খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি জন্মিয়াছে। বংশীধরের মৃত্যু হইলে পাছে এই ঔষধটি লোপ পায় এইভয়ে, দেশের লোকের উপকারের জন্য, এ স্থলে উহা প্রস্তুতের উপায় লিখিত হইল। ভরসা করি আপাতত ইহা কেহই প্রকাশ করিবেন না, তাহা হইলে বংশীধর নিশ্চয়ই

গ্রন্থকারের উপর চটিয়া যাইবেন। ঔষধ তৈয়ার করিবার নিয়ম এই—"চল্লিশ ভাগ কুইনাইন, একভাগ অহিফেন, একভাগ রসাঞ্জন, একভাগ ছোট এলাচি চূর্ণ, আর একভাগ গঁদের আটা। জ্বর ছাড়িলে স্তন্য দুগ্ধ সহ প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এক এক বটিকা ধন্বন্তরি স্মরণ পূর্ব্বক সেবনীয়, জ্বর একবারে পালাইবে। কুইনাইনের অভাবে গুলঞ্চের পালো বা আতীশ চূর্ণেও হইতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত কিঞ্চিৎ পেরু-বল্কল মিশাইতে হইবে।"

যাহা হউক বংশীধর ঔষধ প্রস্তুত করিতেছিল—এমন সময় বিনোদ তাহার বাড়ীর ভিতরে আসিয়া তাহার মায়ের হাতে দুটী টাকা দিয়া কান্দিয়া বলিলেন, "আমার অধিক দিবার সাধ্য নাই, সম্প্রতি এই দিলাম, পরে ভাল হইলে আরো চারি টাকা দিব, আপনি আপনার ছেলেকে একটু ভাল করিয়া বলিয়া দিন, উনি যেন মনোযোগ করে আমার নীলার চিকিৎসা করেন। এখনই দেখিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।"

বংশীধরের মা যথার্থই ভাল করিয়া দু কথা বলিলেন, বংশীধর তাহাতে বলিল—"ভাল করিয়া দিব, একবারে আর দুটী টাকা দিতে বল, আর যাহা হয় পরে দিবেন, আমার সব দামী ঔষধ জান ত মা?"

বিনোদ নিজ কাণে এই কথা শুনিতে পাইয়া তখনই বলিলেন, "সঙ্গে ত আর টাকা আনি নাই, সীতাকে দেখিতে গেলে পর আর দুই টাকা দিব।"

মনুষ্য মাত্রেই ইচ্ছা করিলে পরের উপকার করিতে পারে। ব্যবসায়ীগণের ব্যবসায়ে না নিলে চলে না, তাই বলিয়া যে গরীব দুঃখীর উপরও নিষ্ঠুরতা করিতেই হইবে, এমন কোন যুক্তি ব্যবসা-বিজ্ঞানে লিখিত নাই।

বংশীধর বিনোদের দুঃখের অবস্থা—দুর্দ্দশার কথা সকলেই জানেন, নীলার চিকিৎসা করিয়া চারিটি টাকা না লইলে—মনুষ্য সমাজে তাঁহার মহত্ত্ব ঘোষিত হইতে পারে, কিন্তু তিনি সেরূপ শ্রেণীর চিকিৎসক নহেন। অনেক চিকিৎসক ব্যাধি মুক্তি করাকেই সন্তুষ্টির পরিণাম জ্ঞান করেন। রোগী মরুক বা বাঁচুক বংশীধর টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট। পল্লী কি সহরে আজিও এই শ্রেণীর চিকিৎসকই অধিক; সাধারণ চিকিৎসকগণের উপর একটু গবর্ণমেণ্টের আঁটা আঁটি থাকিলে ভাল হইত। পরীক্ষা না দিয়া উকীল মোক্তারী করিতে পারা যায় না, কিন্তু কোন্ ব্যবস্থা ক্রমে পরীক্ষা না দিয়া চিকিৎসক হইতে পারা যায়, বুঝিতে পারি না। এক দিকে বিষয় সম্পত্তি, অপর দিকে

জীবন, ইহার কোনটা গুরুতর? এই প্রশ্ন ব্যবস্থাপক সদস্য মহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

অনেক চিকিৎসকের স্বভাব এই, যে সকলের আগে ডাকিবে, তাহার বাড়ী সকলের শেষে যাইতে হইবে, অথবা অন্য কোথাও যাইবার প্রয়োজন না থাকিলেও অন্তত গৌণ করিয়া যাইতে হইবে। কেননা তাহা না করিলে পসার হয় না, রোগীর বাড়ী যাইয়া বলা চাই—"একাকী কত রোগী দেখিব, প্রায় পঞ্চাশটী রোগী দেখিয়া আসিতে বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে" ইত্যাদি।

বিনোদ প্রাতে বংশীধরকে ডাকিতে আসিয়াছিলেন, সুতরাং বংশীধর হিসাব মত অপরাহ্নে তাহার বাড়ী গমন করিলেন। বিনোদ আশাতিরিক্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

বংশীধর ধীরে ধীরে জুতা খুলিয়া নীলার পার্শ্বে ভাল করিয়া বসিলেন,—কিছুকাল পরে বিনোদকে বলিলেন, "আপনার হাত দিন।" বিনোদ বংশীধরের সহিত কথা কহেন না। নীলা হাত বাড়াইয়া বলিল "দেখুন।" বংশী বলিলেন, "আগে তোমার মায়ের দেখিব।"

এই কথায় বিনোদ কিছু ভীতা হইলেন, এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "নীলার অসুখ বলেই আপনাকে আনা হয়েছে, আমার নিজের কোন অসুখ নাই।"

এই বারে কবিরাজ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আপনি বুঝিতে পারেন নাই, আগে আপনার নাড়ী দেখিলে আপনার কন্যার নাড়ী দেখিয়া বৈলক্ষণ্য অনুভব করিতে পারিব, এই জন্য আপনার হাত দেখিতে চাই।"

বিনোদের বুদ্ধি কিছু পরিষ্কার, বলিলেন, "নিজের নাড়ী আগে দেখিয়া নীলার হাত দেখুন।"

এইবারে কবিরাজ হারি মানিলেন, বিনোদের পরামর্শানুরূপই কাজ করা হইল।

নীলার হাত দেখিয়া কবিরাজ বলিলেন, "জ্বর এখন বেশী নাই—আমাশয় কিরূপ, রক্ত পুঁইজ নির্গত হয় কি না?"

বিনোদ বলিলেন, "রক্ত পুঁইজ পড়ে।"

"মল দুর্গন্ধ কি না?"

"অতিশয়"

"দিন রাতে কতবার ?"

"দিনে ২।৪ বার, রাতে অনেকবার"

"পেটে বেদনা কেমন ?"

"আগে ছিল, এখন নাই"

"পীড়া কত দিন ?"

"প্রায় পাঁচ মাস ?"

"আহারে রুচি কেমন ?"

"রুচি নাই"

বংশীধর কিছুকাল নীলার আপাদ মস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া বিষণ্ণবদনে নীরব হইয়া রহিলেন।

কবিরাজের এই ভাব দেখিয়া দুঃখিনী বিনোদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আর দুটী টাকা তাঁহার হাতে দিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "আমার দুঃখিনীর সন্তানকে ভাল করিয়া দিন, অবহেলা করিবেন না।"

বংশীধরের বদন প্রসন্ন হইল, টাকা দুটী পকেটস্থ করিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, আপনার কন্যাকে ভাল করিয়া দিব, কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রাখিতে হইবে।"

বিনোদ ভীতা হইয়া বলিলেন, "বলুন শুনি ?" বংশীধর বলিলেন 'যাহা বলিব তাহা করিবেন, প্রতিজ্ঞা করুন তবে বলিব।"

বিনোদ একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,

"প্রতিজ্ঞা না করিলে ?"

"চিকিৎসা করিব না"

চিকিৎসার জন্য ত টাকাই দিব।"

"আর টাকা লইব না"

"যাহা লইয়াছেন ?"

"তাহাত দর্শনী"

এইবারে বিনোদ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার ধর্ম্মে হাত না দিয়া আর যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিব—বলুন।"

বংশীধর হাসিয়া বলিলেন, "আপনি সতী; আপনি মাতৃ তুল্য, সন্তানের কাছে সে ভয়ের কারণ নাই, আমি শুনিয়াছি আপনি গুণবতী ও বিদ্যাবতী,

আমি যেরূপ লিখিয়া দিই, সেইরূপ তিনখানি চিঠি আমাকে লিখিয়া দিতে হইবে, চিঠিতে কাহারও নাম থাকিবে না।”

বিনোদ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন। এবং নিস্তব্ধ, চিঠি তিন খানি লিখিয়া দেওয়া হইল।

একাদশ অধ্যায়।

অমানিশার ঘোর অন্ধকার, তায় শীত রজনী, তাহার উপর বাতাস হইতেছে এবং টুপ টাপ বৃষ্টি পড়িতেছে। রজনী প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। গ্রাম যেন মহা শ্মশান।

বিনোদ নীলার পার্শ্বে শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন!— দেখিতেছেন, ভুবন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার শরীরের সুবাসে বাড়ী আমোদিত। তাহার গলায় ফুলের মালা, মাথায় ফুলের মুকুট। পরিহিত বসনে ফুলের পাড়। বিনোদ হাসিয়া বলিলেন, ‘একি ভুবন, বাল্যকালে একদিন ঐরূপ ফুলের মালা ফুলের মুকুটে আমায় সাজাইয়াছিলে, আজ আপনি সাজিয়াছ। এফুল কোথা পাইলে?’ ভুবন হাসিয়া উর্দ্ধে অঙ্গুলী দেখাইল। বিনোদ—চাহিয়া দেখিলেন, অনন্ত স্বর্ণসিড়ি উর্দ্ধ হইতে তাঁহার প্রাঙ্গণে আসিয়া মিশাইয়াছে; সিঁড়ির দুপাশে অনন্ত অসংখ্য ফুলের টবে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

ভুবন হাসিয়া বলিল, ‘বিনোদ কি ভাবিতেছ—এই শেষ দেখা। প্রতিজ্ঞা পূরণ কর, নীলাকে দেও, লইয়া যাই।’ বিনোদ নীলাকে আনিয়া তাহার করে সমর্পণ করিলেন; নীলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বিনোদের অঞ্চল ধরিয়া বলিল, ‘মা তবে যাই, পারি যদি আবার আসিব। মা তুমি আমায় আর দেখিবে না, আমি কিন্তু চিরদিনই তোমার ঐ মুখ চাহিয়া দেখিব। মা তোমার সহিত কথা কহিতে পারিব না বটে, কিন্তু তুমি যখন যা বলিবে, অমনি সকলি শুনিব। মা তুমি মনে করিবে আমি যেন কত দূরে রহিয়াছি, আমি কিন্তু সদাই তোমার কাছে কাছে থাকিব।’ বিনোদ কান্দিতে লাগিলেন, ভুবন ও নীলা ফুলের ঐশ্বর্য্য সহ নিমেষে বায়ুতে মিশিয়া গেল। বিনোদ হৃদয়ে হাত দিয়া দেখিলেন

শূন্য! অমনি জাগিলেন, জাগিয়া দেখিলেন নীলার জীবন-শূন্য হিম দেহ শয্যার এক পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। বিনোদের শূন্য হৃদয় আর পূর্ণ হইল না; অস্থির প্রাণ আর সুস্থির হইল না। 'হা নীলে, হা নীলে!' বলিয়া উচ্চ রবে রোদন করিতে লাগিলেন।

নিকটবর্ত্তী বিশুবাবু এবং আর আর স্বজাতীয় প্রতিবেশীরা বিনোদের উপস্থিত বিপদ বুঝিতে পারিয়াও কেহ আসিল না। মাঘ মাসের অন্ধকার রজনী, তায় বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি—লেপ কাঁথা ছাড়িয়া কেহ আসিল না। যাহার ধনবল বা জনবল আছে, তাহার কখনও এদুর্দ্দশা হইত না। আজ তাহার বাড়ী লোকের হাট বসিয়া যাইত। যাহার প্রয়োজন নাই সেও সান্ত্বনা ও শিষ্টাচার করিতে আসিত। দুঃখিনী বিনোদের টাকা নাই, উপার্জ্জনশীল দেবর ভাশুরও নাই, সুতরাং তাহার জন্য সান্ত্বনা বা শিষ্টাচারের প্রয়োজন কি? কেহই আসিলনা; ভাবিল কাল সকালে যা হয় তা করা যাইবে। সংসার প্রায় এই রূপ।

বিনোদ নীলার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া কান্দিতে কান্দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় সেই রামধন চণ্ডাল ও তাহার স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল।

রামধন তাহার স্ত্রীকে বিনোদের নিকট রাখিয়া পাড়ার ব্রাহ্মণ ডাকিতে গেল। সকলেই এই আপত্তি করিয়া আসিল না যে,—কাঠ কোথা? অথচ সকলে দু একখানি করিয়া কাঠ দিলেই বালিকার প্রেতকার্য্য অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। রামধন ক্রোধ করিয়া বলিল—"এ গাঁয়ে সব শালাই চণ্ডাল।"

রামধন অমনে ছাড়িবার লোক নহে, তথা হইতে বাড়ীতে গিয়া নিজ কন্যা জামাতাকে ডাকিয়া তুলিল—বলিল, "বাবা দুখানি কুড়ালী লইয়া বাহিরে আয়।" জামাতা তাহাই করিল। রামধন একটি আমের গাছ কাটিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বলিল, "তুই ঐ গোয়ালঘর শীঘ্র ভাঙ্গিয়া ফেল, গোরু আমার শোবার ঘরে বান্ধিয়া রাখ।"

উভয়েই বলবান অতি শীঘ্র অনেকগুলি কাষ্ঠ হইল। তখন সে এবং তাহার জামাতা মাথায় করিয়া সেইগুলি নদী তীরে—রাখিয়া আসিল। পশ্চাৎ সকলকে অতি কষ্টে ডাকিয়া আনিল। শব লইয়া নদীতীরে উপস্থিত

হইয়া সকলেই বিস্মিত হইল—"সর্ব্বনাশ দশটা শব দাহ করিতে পারা যায়, এত কাঠ কোথা হইতে আসিল।"

রামা চণ্ডালের গুণে রজনীতেই নীলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথারীতি নির্ব্বাহিত হইল। বৈদিক ক্রিয়ার কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটিল না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হিন্দুর যত বিপদ, অন্য কোন জাতির এত সাংসারিক বিপদ নাই। এই শোক দুঃখের উপরে বিনোদকে কন্যার শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করিতে হইবে। তৃতীয় দিনে এই কার্য্য হওয়া চাই।

বিনোদ মনে আশা করিলেন যে, টাকা পুঁতিয়া রাখিয়াছি, তাহা হইতে কয়টী টাকা তুলিয়া দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন! সুতরাং যথায় টাকা রাখিয়াছিলেন, তথাকার মাটি তুলিতে লাগিলেন, ক্রমে অনেক দূর পর্য্যন্ত খুঁড়িলেন, টাকা পাইলেন না, সে মাটির ঘটও পাইলেন না। ভাবিলেন বুঝি জায়গা ঠিক হয় নাই; এই মনে করিয়া গৃহের সর্ব্বত্র খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিলেন তথাপি টাকা পাইলেন না। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া কান্দিতে লাগিলেন।

এই সময় রামার স্ত্রী তাঁহার নিকট আসিল; রামা সর্ব্বদাই তাহাকে তাঁহার তত্ত্বাবধারণ জন্য পাঠায়। রামার স্ত্রী বলিল "ঠাকুরাণী কান্দিয়া আর কি হইবে? কাল শ্রাদ্ধ হইবে তাহার কি করিয়াছ? আমাদের চারিটী গরুর এগার সের দুধ হয়, তাহা গোয়ালার বাড়ী দৈ করিতে দিয়াছি; আর কাল যে দুধ হইবে তাহা ক্ষীর করিবার জন্য দেওয়া যাইবে, আপনার দুধ ক্ষীরের জন্য ভাবিতে হইবে না।"

রামার স্ত্রীর এই আশ্বস্ত বাক্যে বিনোদ কিছু স্থির হইয়া তাহাকে আমূল বৃত্তান্ত ভাঙ্গিয়া বলিলেন।

রামার স্ত্রী শুনিয়া বলিল, "টাকা ঘর ছাড়া হয় নাই, মাটি খোঁড়া আপনার আমার কাজ নয়, আপনি ঘরের জিনিস পত্র স্থানান্তর করুন, আমি আমার জামাইকে পাঠাইয়া দিই গে, সে আসিয়া টাকা তুলিয়া দিবে।"

* * * * * * *

কিছু কাল পরে রামার জামাই আসিল, বিনোদ—তাহাকে স্থান দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও টাকা আর পাওয়া গেল না। বিনোদ নৈরাশ হইলেন, রামার জামাইও অকৃতকার্য্য হইয়া স্ব গৃহাভিমুখে চলিল।

বিশু বাবু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, রামার জামাইকে অসময়ে বিনোদের গৃহ হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া বলিলেন। "হাঁ রে ভুতোর মা বাড়ীতে আছে?"

"আছেন"

"তুই তাঁর ঘরে ঢুকিয়াছিলি কেন?"

রামার জামাই কি বলিবে, কিছু ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া গেল। বিশু-বাবু তাহাকে মনে মনে কোন বিশেষ অপরাধে অপরাধী স্থির করিয়া বিনোদের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন; "বউ তোমার একি ব্যবহার? তোমাকে ভাল বলিয়া জানিতাম, এত ব্রাহ্মণ কায়স্থ থাকিতে তুমি চাঁড়াল ঘরে আন!"

এই ভয়ঙ্কর কথায় বিনোদ মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদিয়া কেবল বলিলেন; "হা বিধাত, হা ধর্ম্ম, হা পরমেশ্বর, এখনই ব্রহ্মাণ্ড খসিয়া পড়ুক। এ বৃথাপবাদীর মুখ খসিয়া পড়ুক।"

বিশু বাবু যদি লোক তত্ত্বজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে এই ভয়ঙ্কর অভিসম্পাতে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইত, এবং বুঝিতে পারিতেন, বিনোদ নিষ্পাপিনী। দুর্ভাগ্য বশত বিশু সেরূপ লোক নহে, পরন্তু তিনি উহাতে বিকট হাস্য করিয়া এমন একটি ঘৃণিত কথা উচ্চারণ করিয়া বলিয়া গেলেন, যে তাহা শুনিয়া বিনোদ লজ্জায় ঘৃণায় মরিয়া গেলেন। আমি সেই শব্দ এ স্থলে প্রয়োগ করিয়া মসী ও লেখনী কলঙ্কিত করিব না।

পরদিন বেলা আটটার সময় গোয়ালা দধি দুগ্ধ দিয়া গেল, প্রতিবেশিনী এক কায়স্থ রমণী চিড়া খই দিয়া গেল, রামা আসিয়া দুটী টাকা বারটী দোয়ানী ও কয়েক সের চিনি দিয়া গেল, আর রামার স্ত্রী আসিয়া গৃহ প্রাঙ্গন গোময় দিয়া পরিস্কার করিয়া গেল। দুঃর্ভাগ্য বশত এই সকল আয়োজন কাজে আসিল না। পুরোহিত আসিলেন না, ব্রাহ্মণেরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না; বিশু বাবু বলিয়া পাঠাইলেন, "ভুতোর মা চণ্ডাল ভোজন করাক্।" বলা বাহুল্য যে এই অচিন্তনীয় ব্যবহার শেলসম বিনোদের হৃদয়ে বিদ্ধ রহিল।

ধূপছায়া।

আমরা ধূপছায়া বড় ভালবাসি। যোগী ধূপছায়ার নামাবলী গায়ে দিয়া ইষ্ট মন্ত্র আরাধনে নিরত, যুবতী ধূপছায়ার চেলী পরিধান করিয়া ঠাকুর বরণে বিব্রত, বালক ধূপছায়ার র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া খেলিতে আসক্ত। আমাদের যে দেশে বাস, তাহাতে ধূপছায়ার আদরই সমধিক। শীত প্রধান উত্তর প্রদেশে কেবল কুয়াসা, হিমানী, বরফ সেখানে ছায়ার আদর কোথায়? সেখানে লোকে চায় ধূপ। আবার উত্তপ্ত সাহারাখণ্ডের লোক ধূপের জ্বালায় অস্থির, তাহারা চায় ছায়া। আর আমাদের ভারতে,—এই শীত গ্রীষ্মময় ভারতে,—বেগবতী নদী, ছায়াবতী অরণ্যানি, তুষার ধবল হিমানী, শ্যামল সুবিস্তৃত শস্য ক্ষেত্র, জল শূন্য তরু শূন্য মরুভূমি—সঙ্কুল ভারতে,—আমরা দুই চাই; আমরা ছায়াও চাই; ধূপও চাই; আবার সর্ব্বাপেক্ষা আমরা চাই ধূপ-ছায়া।

এই ধূপছায়া আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। এখন এমনই হইয়াছে, যে আমরা যাহা অত্যন্ত ভালবাসি, তাহা অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারি তাহার ভিতর ধূপছায়ার ভাব আছে বলিয়া এত প্রীতিকর। আমরা বসন্তের মাধুর্য্যে মোহিত, কেননা বসন্ত ধূপছায়াময়। শীতের তেজ কমিয়াছে, নিদাঘের কাল আসে নাই, এই ধূপছায়ার সময় কাজেই বড় মধুর, মনোমোহন; তাহার পর শরৎ; শরৎ কালের শোভাও আমরা বড় কম ভালবাসি না। বসন্ত ও শরৎ বৎসরের মধ্যে ধূপছায়ার সময়, তাই আমাদের এত প্রীতিকর। নচেৎ নিদাঘের শৌর্য্য, বর্ষার গাম্ভীর্য্য, হিমের প্রাখর্য্য—এ সকল শরৎ বসন্তে ত কিছুই নাই; তবুও যে শরৎ বসন্ত এত প্রীতিকর সে কেবল ধূপছায়ার গুণে। আবার দিনের মধ্যে গোধূলীর সৌন্দর্য্য সকলেই অনুভব করেন। বসন্ত কালের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত বাস্তবিকই অপূর্ব্ব মাধুরিময়, মধুরে মধুর; বসন্তে গোধূলী—ধূপছায়ায় ধূপছায়া, তাই এত সুন্দর।

ধূপছায়ার মোহে পড়িয়াই ভারতের কবি শ্রেষ্ঠ কালিদাস এই চিত্র আঁকিয়াছেন।

"বসনে পরিধূসরে বসানা,
নিয়ম-ক্ষাম-মুখী ধৃতৈক-বেণিঃ।

অতি নিষ্করুণস্ত শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহ ব্রতং বিভর্ত্তি ॥"

পরণে ধূসর বেশ, এক বেণী রুখু কেশ
ব্রত-নেমে ম্লান-মুখী, শুদ্ধ-শীলা হেন,
আমি অতি নিরমম,— শোভিতেছে প্রিয়া মম,
সুদীর্ঘ বিরহ-ব্রত ছবি খানি যেন।

কোন্ চিত্র এ চিত্রের সমান। কোন্ মূর্ত্তি এই মূর্ত্তি অপেক্ষা সুন্দরী। যিনি কবি, তিনিই ইহার মাধুর্য্যে মোহিত, যিনি ভাবুক, তিনিই ইহার ভাবে বিভোর। বাঙ্গালীর কবিশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র সেই জন্যই বলিয়াছেন "ভৈরবী অতিশয় সুন্দরী—বুঝি শ্রীর অপেক্ষাও সুন্দরী। কিন্তু রূপ ঢাকিবার জন্য আচ্ছা করিয়া বিভূতি মাখিয়াছিল। তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়াছিল—বসা ফানুসের ভিতর আলোর মত রূপের আগুণ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।"

এত গেল বাহ্য জগতের ধূপছায়ার কথা। আমাদের অন্তরের ভিতর যে ধূপছায়া লাগিয়াছে, যে ধূপছায়ার বলে আমরা বাঁচিয়া থাকি এবং বাঁচিয়া থাকিব বলিয়া আশাও করি, এক্ষণে সেই ধূপছায়ার কথা বলিতেছি। সকলেই জানেন আশার বলে জীবিত থাকি। যিনি আসন্ন মৃত্যু রোগী, তাঁহারও আশা তিনি বাঁচিবেন; যিনি দারিদ্রের দারুণ দায়ে জর্জ্জরিত, তাঁহার আশা এমন দিন থাকিবে না, ভাল দিন শীঘ্রই আসিবে; যিনি বিপন্ন তাঁহার আশা ঈশ্বর কৃপায় বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন; যিনি ইহজন্মে কষ্ট ভিন্ন আর কিছুই জানেন না, তাঁহার আশা পরকালে তাঁহার ভাল হইবে; যিনি বন্দী, তাঁহার আশা মেয়াদ ফুরাইলেই আবার স্ত্রী পুত্রের মুখাবলোকন করিবেন; যিনি দাসত্বের লাঞ্ছনায় চির বিড়ম্বিত, তাঁহার আশা কোন না কোন দিন পর-সেবার, পদ-সেবার দায় হইতে মুক্ত হইবেন; এইরূপ নিরাশায় আশা সঞ্চারকেই অন্তরের ধূপছায়া বলিতেছি। ইহাতেই আমরা বাঁচিয়া থাকি। যদি জানিতাম এ রোগ আর সারিবে না, এ দারিদ্র আর ঘুচিবে না, এ বিপদ হইতে উদ্ধার নাই, কষ্টের অবধি নাই, মেয়াদ ফুরাইবে না, দাসত্ব যাইবে না—তাহা হইলে আর এক দিনও বাঁচিতে পারিতাম না। সেই জন্যই বলিতে হয় আমরা কেবল ধূপছায়ার ধাঁধাতেই বাঁচিয়া আছি। মৃত্যু—জীবনের অভাব জ্ঞাপক অথচ আমরা এই ধূপছায়ার শক্তি বলে "মরিলে বাঁচি।" বোধ হয়

জগতে আর কোন জাতি মরিলে বাঁচে না, মরিলে মরিয়া যা ; কেবল আমরাই মরিলে বাঁচি।

ধূপছায়া আর এক মূর্ত্তিতে আমাদের অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজ করে। আনন্দের সময় শোকের উদ্দাম, দুঃখের সময়ে সুখের আশ্বাস—ইহাও এক রকম ধূপছায়া। যুবতী রমণী একটু শিশু পুত্র লইয়া বিধবা হইলেন। সেই শিশু পুত্রটীর মুখপানে চাহিয়া পতি শোক যাপ্য করিলেন, তাহার লালন পালনে সদা বিব্রত, তাহাকে লইয়াই সংসারে সংসারী। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত, কৃতবিদ্য, যশস্বী, ধনশালী হইল, দুঃখিনী মার আনন্দ আর ধরে না। তার পর পুত্রের বিবাহ দিয়া পরম রূপবতী সদ্বংশ-সম্ভূতা পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন, আবার দিন কতকপরে পৌত্র মুখাবলোকন করিয়া ইহজন্মের সাংসারিক সুখের সীমা পাইলেন। এত সুখের সময় কেন তিনি, সময় পাইলে বিরলে বসিয়া বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন আবৃত করিয়া দুই ফোঁটা গরম জল ঢালেন ? কেন তিনি এক এক সময় মধ্যে মধ্যে বলেন "এ দিনে যদি তিনি থাকিতেন" "হায়, তিনি এ সব কিছুই দেখিতে পাইলেন না।" এত সুখের দিনে মায়ের কষ্ট কেন? চক্ষে জল কেন? ইতি পূর্ব্বে যখন পুত্রের লালন পালনে কষ্ট পাইতেন, পুত্রের ভরণপোষণের জন্য কষ্ট পাইতেন, যখন পুত্রের শিক্ষার জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইত, তখন তাঁহার মনে আশা জাগুক, ঈশ্বর দিন দিবেন, এ দুঃখের দিনের অবসান হইবে। এখন সময় ফিরিয়াছে, এখন আশা চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে ; এখন সুখ পূর্ণমাত্রা, এখন আর আশার সুখ নাই, এখন স্মৃতিতে কষ্ট ভোগ। তবে দুঃখের সময় সুখের আশা, সুখের সময় দুঃখময়ী স্মৃতি—ইহাকেই বলিতেছিলাম ধূপছায়ার অপর মূর্ত্তি। কখন সুখের সময় দুঃখের ছায়াময়ী স্মৃতি, আবার কখন দুঃখের তামস মধ্যে সুখের উজ্জ্বল আশা,—আমাদের জীবনের ধূপছায়ারূপে সামঞ্জস্য রক্ষা করে! তাহা না হইলে হয়ত আমরা সুখের জলন্ত রশ্মিতে পুড়িয়া মরিতাম, না হয় কষ্টের কঠোর ছায়ায় জমিয়া যাইতাম। সুতরাং ধূপছায়া অন্তরে বাহিরে আমাদের চির সহচরী ; কাজেই আমরা অন্তরের সহিত ধূপছায়া ভালবাসি। ধূপছায়া সুখের সময় শান্তি-বিধায়িনী, দুঃখের সময় আশা-দায়িনী।

আইনের দশাবতার।

স্তোত্র।

জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে, বিচারের ভার॥

প্রথমে ষ এল রূপ, তব অবতার।
অনন্ত 'কানন' প্রভু, কর ছারখার॥
কণ্ঠস্থ ব্যবস্থা বিধি, শক্তি চমৎকার।
না বুঝিয়া অর্থ, কর অনর্থ সঞ্চার॥

জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে বিচারের ভার॥

দ্বিতীয় উকিল রূপে, রক্তবীজ বংশ।
ধন্য অবতার তব, পূর্ণ, নচ অংশ॥
চালাকি চাতুরি শক্তি, বোকামি সহিত।
দেখাও ভারতে তুমি, যথামি উচিত॥

জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে বিচারের ভার॥

তৃতীয়েতে মুন্সেফ, অবতার ধর।
সামলা—শোভিত শিরে, মঞ্চের উপর॥
সুতাহাটে বসে তুমি, সুতা বিক্রী কর।
সেই সূত্রে সর্ব্বনেশে, বিচার বিতর॥

জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে, বিচারের ভার॥

চতুর্থাবতারে তুমি, সব্ জজ আকার।
রায় বাহাদুর আর, আপিলের ভার॥
মুন্সেফের রায় তুমি, খণ্ড খণ্ড কর।
নিজ রায়ে কিন্তু দেব, উচ্চ হস্তে মর॥
জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে, বিচারের ভার॥

পঞ্চমেতে পঞ্চানন- তুল্য ভোলা বম্।
ছোট আদালত জজ, বিচারের যম॥
হক্, না হকের কাণ্ড, মাথা মুণ্ড সার।
দুই-চক্ষু-ব্রতে তুমি, বিতর বিচার॥
জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে, বিচারের ভার॥

ষষ্ঠ অবতারে তুমি, ভার্গব আচারী।
জেলার জবর জজ, ক্ষত্রিয়ান্তকারী॥
স্বহস্তে লোকের মুণ্ড, বিচার কুঠারে।
নির্ভয়ে কটাহ তুমি, বারে বারে বারে
জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে বিচারের ভার॥

সপ্তমাবতার তব, পঞ্চাশ যখন।
রাজবৃত্তি ধ্বংশ করি, সদানন্দ মন॥
প্রকৃতিস্থ হবে তুমি, দিবে পরিচয়।
মূর্ত্তিমান বোকারাম, কর্ম্ম-ক্ষম নয়॥
জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে, বিচারের ভার॥

অষ্টমাবতারে প্রভু, কর্ম্ম হবে সার,
—তাশ, পাশা, দাবাখেলা, মাছ ধরা আর ॥
তখন উপাধি ভরে, মরিবে গুমরে।
কিন্তু কেহ ডাকিবে না, মোট বহিবারে ॥
জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে, বিচারের ভার ॥

নবমে নবীন রঙ্গে, বিধির নিয়তি।
নাতি কোলে দ্বার দেশে, স্থাপিত মূরতি ॥
ভিক্ষারী তাড়না তত্বে, বিবৃত হইবে।
অনন্ত কটূক্তি দেব! সঞ্চয় করিবে ॥
জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে বিচারের ভার ॥

দশমে দিগন্ত ব্যাপ্ত, হবে যশোভার।
জাওর কাটিবে যাহা করেছ বিচার ॥
ভ্রম-রতি বলে লোক, শুনিয়া হাসিবে।
পাগলে, লজ্জায় সবে, পিঞ্জরে পূরিবে ॥
জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে, বিচারের ভার ॥

জয়—

কানুন-কণ্ঠস্থায়, নজীর-তুরস্তায়,
শামলা শিরস্থায়, কপোলস্থ হস্তায়,
ভো ব্যস্ত সমস্তায়, কাছারি তটস্থায়,
পঞ্চান্নে শিকস্তায়, মাছ-ধরা কস্তায়,
দ্বারে জবরদস্তায়, শেষে-পিঞ্জরস্থায়,
আইনাবতারায়, দশাবতারায় নমো।

হিন্দু ধর্ম্মের সংস্কার।

("নবজীবন ও বেদব্যাস।")

আমরা নবজীবনের অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করিয়াই অনুভব করিয়াছিলাম, বাঙ্গালায় নব-ধর্ম্ম-যুগের আবির্ভাব হইবে। প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলী এবং নব্য হিন্দু সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া কুহকাবৃত হিন্দুধর্ম্মের রহস্য সকল সাধারণকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবেন। প্রাচীন ও নব সম্প্রদায়ের এই ধর্ম্মান্দোলনকে ধর্ম্ম সংস্করণ কি ধর্ম্ম সংরক্ষণ বলিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে কেহই ভাবে নাই! সুতরাং আমরাও সরলভাবে এই ধর্ম্মান্দোলনের নাম দিয়াছি—"প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার।" ধর্ম্ম সংস্করণ ও ধর্ম্ম সংরক্ষণ যে একার্থ বাচক নহে, তাহা শাস্ত্র জ্ঞান বিহীন ব্যক্তিও কেবল অভিধানের সাহায্যে বুঝিতে সক্ষম। কিন্তু এই হুজুক প্রধান বঙ্গভূমিতে যে 'হিন্দুধর্ম্ম' বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে, সেই ভিত্তি হীন আন্দোলনকেও যিনি ধর্ম্মসংস্করণ না বলিয়া ধর্ম্মসংরক্ষণ বলিতে পারেন, তিনি সাধারণ মনুষ্য নহেন। সুতরাং প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, কি ধর্ম্ম সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। যিনি বুঝিয়াছেন, এবং স্বয়ং বুঝিয়া আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি আমাদের পরম ভক্তিভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মসংস্কার কার্য্য বাঙ্গালায় অলক্ষ্যভাবে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। তাহার ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নবজীবনের সূচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং বেদব্যাস সম্পাদকও "পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—"১২৯১ সালের আষাঢ় মাসে যেন ভারতের উপর ভগবানের কৃপা দৃষ্টি পড়িল। * * * নব্য সম্প্রদায়ও শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। এমন সময় আচার্য্যবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয় যেন স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। * * * * * যখন তিনি তাঁহার কঠোর সাধনা-লব্ধ প্রতিভা বলে শাস্ত্রের গভীর তাৎপর্য্য সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন লোকের চমক ভাঙ্গিল। * * * চারিদিকে হিন্দুধর্ম্মের জয় ঘোষণা

হইতে লাগিল।" ইত্যাদি আমরাও "হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার" নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধে বলিয়াছি, "বলা অসঙ্গত নয় যে, চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মান্দোলনের ফলই নবজীবন।" নবজীবন ধর্ম্মসংস্করণ উদ্দেশে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কি ধর্ম্মসংরক্ষণরূপ অলৌকিক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ নাই। তবে সম্পাদক, নবজীবনের সূচনাতে এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, —"ধর্ম্মের বিশেষাদর ভাব যে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, সে স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। তবে নিয়মিতরূপে সাময়িক পত্রে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমারা নিজেও বুঝিব, এবং সাধারণকেও বুঝাইবার চেষ্টা করিব, এ ইচ্ছা আমাদের আছে। * * * বাঙ্গালায় ধর্ম্মবৃক্ষের যে নব অঙ্কুর দেখা দিয়াছে, আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টাতে যদি তাহা বাতাতপ-কীট-পতঙ্গ হইতে দু দিনের জন্যও রক্ষা হয়, তবে আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিব।" এবম্বিধ উক্তির বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিলেই হইল, নবজীবনের উদ্দেশ্য ধর্ম্মসংস্করণ কি ধর্ম্মসংরক্ষণ? আমরা বেশী কিছু বলিব না।

হিন্দুধর্ম্মের সংস্করণ (বা সংরক্ষণ) জন্য নবজীবন ও প্রচার সহোদর ভ্রাতার ন্যায় প্রায় একই সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন। প্রাচীন সম্প্রদায়ের নেতারূপে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয়, এবং নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারূপে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রাগুক্ত পত্রিকাদ্বয়ের প্রাণ স্বরূপে ধর্ম্মপ্রচার করিবেন বলিয়া সাধারণে বুঝিয়াছিল। একজন প্রাচ্য শিক্ষিত অপর ব্যক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষিত; ইঁহাদের পরস্পরের মতের যে সম্পূর্ণ ঐক্য হইবে না, ইহাত জানা কথা। তাই বলিয়া চূড়ামণি মহাশয়কে নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণ যে কখনও অসম্মান বা অভক্তি করিয়াছেন, এমত আমরা শুনি নাই। বলিতে গেলে নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণই চূড়ামণি মহাশয়কে এত উচ্চ আসন প্রদান করিয়া, হিন্দুর ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যের নেতৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন। একজন প্রাচ্য শিক্ষিত—উদারচেতা—সদ্বক্তা—পণ্ডিতের সহিত, নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণের সম্মিলন, বাঙ্গালায় এক অভিনব কাণ্ড। তাই আমরা এই রাসায়নিক সংযোগের পূর্ব্বাভাস পাইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিয়াছিলাম। তেমনি এই শুভ সংযোগে কেন বিয়োগ ঘটিল, তাহাই বুঝিতে ও সাধারণকে বুঝাইতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি। তদ্ভিন্ন চূড়ামণি মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া শ্লেষ পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকটন করি নাই. এবং বেদব্যাসের হিতৈষী ও লেখকগণকে তীব্র কটাক্ষ করিয়া বিবাদ বিসম্বাদের

সূত্রপাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধ বিদ্বেষের চক্ষে না দেখিয়া, একটু তলাইয়া পাঠ করিলে, বেদব্যাস-সম্পাদক কি বেদব্যাসের উপাসকগণ এইরূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না।

প্রাচীন ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসাহে প্রকাশিত পত্রিকা—নবজীবন বর্ত্তমানে, 'বেদব্যাস' কেনই বা অকস্মাৎ আবির্ভূত হইলেন, তাহার ঠিক বিবরণ সাধারণে বুঝিতে পারে নাই। শুনিয়াছিলাম, ভূধর বাবু তৃতীয় বর্ষের সূচনায় বেদব্যাসের অকস্মাৎ আবির্ভূতির কারণ কি, তাহা পরিষ্কাররূপে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। কিন্তু সে আশা বিফল হইয়াছে। ভূধর বাবু 'সময়ান্তরে ও স্থানান্তরে' তাহা বুঝাইবেন বলিয়াছেন। কেবল বেদব্যাসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বেদব্যাসের উদ্দেশ্য উচ্চ—অতি উচ্চ। ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেবল মানুষের কর্ত্তৃত্বে সে উদ্দেশ্য সাধন হওয়া অসম্ভব, সুতরাং আমাদের সমস্ত আশা ভরসা তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছে।" পাঠকগণ কি বুঝিযাছেন জানি না; সুতরাং আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কেবল বুঝিয়াছি "সাধারণের বিশ্বাস, যে বঙ্গবাসী ও বেদব্যাস—চূড়ামণি মহাশয়ের কাগজ" তাহা প্রকৃতই ভুল। কিন্তু এরূপ ভুলের কথা আমরা কোথাও বলি নাই। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, চূড়ামণি মহাশয় অকারণ প্রবন্ধ 'কাটা ছাঁটার' অভিযোগ আনিয়া নবজীবনের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া, একখানি প্রতিযোগী পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, নানা কারণে বেদব্যাস এই সুবিধা পূরণ করিয়া দিল। প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দলাদলি গালাগালির ঘোঁট হইতে লাগিল। বঙ্গবাসী সময় বুঝিয়া খাঁটী হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখ পত্র সাজিয়া এই বিবাদ বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে কসুর করিলেন না। বঙ্গবাসীতে ও বেদব্যাসে অধিকাংশ প্রবন্ধই চূড়ামণি মহাশয় লিখিতে লাগিলেন। অথচ বলিতে লাগিলেন "অহিন্দু মতের পত্রিকা নবজীবন ও প্রচারের সহিত আমার কিছু মাত্র সংস্রব নাই।" আমরা জানিতে ব্যগ্র হইয়াছি, কি দোষে নবজীবন ও প্রচার অহিন্দু মতের পত্রিকা হইল, আর কি গুণে বঙ্গবাসী খাঁটি হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র হইয়া চূড়ামণি মহাশয়কে কর্ণধাররূপে পাইল? এবং চন্দ্রশেখর বাবু প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রবন্ধে যে পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করিল, সেই বেদব্যাস কিসে 'কেবল একমাত্র হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ' এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদলের মুখপত্র বলিয়া সপ্রমাণিত হইল? বেদব্যাস সম্পাদক আমা-

দের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের কোনই উত্তর দেন নাই। কেবল নবজীবন ও বেদব্যাসের উদ্দেশ্যের পার্থক্য বুঝিবার জন্য বাবু নীলকণ্ঠ মজুমদারের 'নবজীবন ও বেদব্যাস' নামক প্রবন্ধের উপর বরাত দিয়াছেন। ভূধর বাবু বলেন,—"আমরা এরূপ বিবাদ বিসম্বাদের বড়ই বিপক্ষ। সুতরাং বেদব্যাসে এ সমস্ত ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রতিবাদে অনিচ্ছুক।" আমরা বলি, একা সম্পাদককে বিবাদ বিসম্বাদের বিপক্ষ হইলে চলে কি? লেখকগণকেও সম্পাদকের ক্ষুণ্ণ মার্গে লইয়া যাওয়া চাই। তাহাই পারেন নাই বলিয়া নবজীবন-সম্পাদকের উপর প্রাচীন সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোকের জাত ক্রোধ। পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইয়া না চলিলে, নব্য সম্প্রদায়ও যে বেদব্যাসকে দলাদলির মুখপত্র বলিয়া দোষারোপ করিবে না, কে বলিল? বেদব্যাস সম্পাদক বা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বন্ধুগণ যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদের মূল যাহাতে নষ্ট হয়, সেই উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। বিবাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত করিতে প্রবন্ধ প্রকটন করি নাই। উভয় দলের নেতাগণকে মিলিয়া মিশিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে অনুরোধ করিতেছি মাত্র। এবং তৎ সংসৃষ্ট কথারই আলোচনা করিয়াছি, এখনও করিতেছি। আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কোন সুফল না ফলুক, কিন্তু তাই বলিয়া এ হেন গুরুতর বিষয়কেও যদি বেদব্যাসের বিজ্ঞ সম্পাদক ভিত্তিহীন আন্দোলন বলেন, তবে জানি না তিনি কি ভাবে, কি প্রণালীতে, এই পাশ্চাত্য শিক্ষিতাধিক্য বঙ্গে, ধর্ম্মসংস্করণ বা সংরক্ষণ করিবেন?

নীলকণ্ঠ বাবু প্রবন্ধের ভূমিকাতেই বলিতেছেন, "নবজীবন ও বেদব্যাস এ উভয়ের মধ্যে কে দোষী কেই বা নির্দ্দোষী?" আমরা কিন্তু কোন স্থানেই নবজীবন ও বেদব্যাস ইহার মধ্যে কে দোষী, কে নির্দ্দোষী, এ প্রশ্ন উত্থাপিত করি নাই। প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় ইহার মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের দোষে দলাদলি ঘটিতেছে, অথবা উভয় সম্প্রদায়েরই অল্প বিস্তর দোষ আছে কি না, সেই বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা করিতে যত্ন করিয়াছি। বিদ্বেষ বুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া কাহাকেও দোষী বা নির্দ্দোষী বলি নাই। নিরপেক্ষ ভাবেই উভয় দলের দোষ গুণের আলোচনা করিয়াছি। তবে "নিরপেক্ষ" শব্দটি লইয়া বেদব্যাসের হিতৈষী ও লেখক মহাশয় কটাক্ষ করিয়াছেন, করুন। কবির দলের দোহারের ন্যায় স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুযায়ী আপন আপন চিত্র

আমাদের প্রবন্ধে দেখিয়া (আঁতে ঘা লাগিয়াছে) অনেকে এরূপ যে বলিবেন, অহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি।

নবজীবন ও বেদব্যাসের উদ্দেশ্যের পার্থক্য বুঝাইতে নীলকণ্ঠ বাবু প্রবন্ধ প্রকটন করিয়াছেন। কিন্তু পাঠকগণের দুর্ভাগ্যক্রমে "নবজীবন ও বেদব্যাস" শীর্ষক প্রবন্ধে নবজীবন ও বেদব্যাসের উদ্দেশ্যের পার্থক্য প্রকটিত হয় নাই। নবজীবন ও বেদব্যাসের লেখক বিশেষের মত পার্থক্য মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখও হয়,—নীলকণ্ঠ বাবু আর তারাপ্রসাদ বাবুর যে মত-পার্থক্য লইয়া, উভয় লেখক এ কাল পর্য্যন্ত যে বাক্ যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন, নীলকণ্ঠ বাবু বেদব্যাসের প্রাগুক্ত প্রবন্ধেও সেই সকল কথার সার সঙ্কলন করিয়া স্বীয় মত সমর্থন করিয়াছেন। নিরপেক্ষ কোন পাঠক উক্ত প্রবন্ধ পাঠে নবজীবন ও বেদব্যাসের উদ্দেশ্যের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন না। নীলকণ্ঠ বাবু ও তারাপ্রসাদ বাবুর চিত্র মাত্র আলো আঁধারে দেখিতে পাইবেন। বলা বাহুল্য যে, তারাপ্রসাদ বাবু আর নবজীবন একমতাবলম্বী বা এক উপাদানে গঠিত নহে এবং নীলকণ্ঠ বাবুর মত বুঝিতে পারিলেই যে বেদব্যাসের সম্পূর্ণ মত বুঝা যাইবে, সেরূপ আমরা বিশ্বাস করি না। তবে ভূধর বাবু যখন "নীলকণ্ঠ বাবুর জওয়াব সওয়াল লিখিত পঠিত দাখিল দস্তখত স্বকৃতবৎ কবুল মঞ্জুর করিবেন" বলিতেছেন, তখন বেদব্যাস আর নীলকণ্ঠ বাবুকে অভিন্ন ভাবিতে আমরা বাধ্য আছি। অতএব নবজীবন ও বেদব্যাস ওরফে নীলকণ্ঠ বাবুর মত-পার্থক্য যাহা নীলকণ্ঠ বাবু দফাওয়ারিতে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক,—নীলকণ্ঠ বাবুর উক্তি কত দূর সত্যের উপর সংস্থাপিত এবং কিরূপ যুক্তিমূলক?

১। নীলকণ্ঠ বাবু বলেন,—"নবজীবন ধর্ম্মের সংস্কার করিতে চাহেন। বেদব্যাস সংরক্ষণের পক্ষপাতী।" নবজীবনের 'সূচনা' ও 'ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ যিনি মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, নবজীবন ধর্ম্মের সংস্কার করিতে চাহেন না। নবজীবন (বা নব্য সম্প্রদায়) ধর্ম্মকে বালকের খেলনক মনে করেন না। এই জন্য ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্ন নবজীবন ও প্রচারে সর্ব্ব প্রথম উত্থাপিত হয়। বঙ্কিম বাবুর বিশেষ মত এই যে, যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্ট-ধর্ম্ম, ইস্‌লাম ধর্ম্ম বলিয়া সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্মের এক একটি নাম করণ হইয়াছে, 'হিন্দুধর্ম্ম' বলিতে সেরূপ সাম্প্রদায়িক, সসীম, সংকীর্ণ

ভাবার্থ বুঝায় না। হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে, ধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদত্ত হইয়াছে। অথচ হিন্দুর যাবদীয় কার্য্য, ধর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত ও অনুশাসিত হইয়া থাকে। পরমাত্মা যেমন জীবাত্মার সহিত অনাসক্ত ভাবে সংসৃষ্ট, ধর্ম্ম তেমনি হিন্দুর সমস্ত সদাচারের সহিত সংলিপ্ত। সুতরাং (কেবল) 'আচারধর্ম্ম নহে, ধর্ম্মই ধর্ম্ম'। এ হেন ধর্ম্মের সংস্কার প্রয়াসী হওয়া বাতুলের কার্য্য। তাই নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণ ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভাব রক্ষা করিয়া বহুবার্থে 'ধর্ম্ম' শব্দের মৌলিকতা বুঝাইতেছেন, এবং সেই নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মে যে সমস্ত আবর্জ্জনা পতিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে সকল কুসংস্কার রঙ্গ তামাসা 'ধর্ম্ম' বলিয়া হিন্দু-সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তৎসমস্তের পরিমার্জ্জন, পরিবর্জ্জন করিতে যত্ন করিতেছেন। তদ্ভিন্ন হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন কি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিতে চাহেন না। নব্যহিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণের সেরূপ ইচ্ছা থাকিলে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহাদিগকে গালাগালি, তীব্র কটাক্ষ শুনিতে হইত না। তবে যে নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণ মধ্যে কেহ কেহ বলেন, হিন্দুধর্ম্মকে কোন কোন স্থলে নবীন উন্নতির বশবর্ত্তী না করিলে, উহা লোকের মনে প্রভুত্ব করিতে পারিবে না, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্যের সহিত, প্রাচীন সম্প্রদায় বা বেদব্যাসের মতের (বেদব্যাসের যে মতের কথা প্রথম দফাতে নীলকণ্ঠ বাবু বলিয়াছেন) কোন পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্কিম বাবু 'কৃষ্ণ চরিত' সমালোচনার একস্থলে বলিয়াছেন, "হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার হইলে, হিন্দু-সমাজ-সংস্কার আপনা আপনি হইবে।" ইহার ভাবার্থও বোধ হয় ইহাই যে,—হিন্দু ধর্ম্মে যে সমস্ত আবর্জ্জনা পতিত হইয়াছে, যে সকল কুসংস্কার রঙ্গদারিতে হিন্দুধর্ম্মকে কুহকাবৃত করিয়াছে, তৎসমস্ত অপসারিত হইলেই, হিন্দুধর্ম্ম মেঘবিমুক্ত সূর্য্য কিরণের ন্যায় সর্ব্বত্র সমভাবে বিকীর্ণ হইয়া আপামর সাধারণের হৃদয়ক্ষেত্রে বিরাজ করিবে; এবং সকলের অবস্থার উপযোগী নবীন উন্নতির বশবর্ত্তী হইয়া সাধারণের মনে প্রভুত্ব করিতে পারিবে। তখন আর ব্রাহ্মদিগের ন্যায় বলিতে হইবে না, 'শিক্ষিত ভিন্ন সত্যধর্ম্ম অন্যের উপযোগী নহে।' এবং আচার্য্য দেবের ন্যায় বলিতে হইবে না, "তোমার শক্তি বা পরমায়ু হ্রাস হইয়াছে বলিয়া ধর্ম্ম তোমার অবস্থানুরূপ হইতে পারে না।" হিন্দু ধর্ম্মের আবর্জ্জনা, কুসংস্কার, রঙ্গদারিকে বিদূরিত করার উপদেশকে হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী বলিলে কেহ তাহার বাপ্ যন্ত্রের ক্রিয়ারোধ করিতে পারিবে না, কিন্তু বেদব্যাস ও নব্য-

জীবনের উদ্দেশ্য ও মত পার্থক্য বুঝাইতে বসিয়া সত্যের অপলাপ করিলে, সে কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে না। নীলকণ্ঠ বাবু দ্বিতীয় দফাতে বলিয়াছেন, "কাল সহকারে হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু আচারে যে সমস্ত অশাস্ত্রীয় আবর্জ্জনা পতিত হইয়াছে, সে গুলি বিদূরিত করার উপায় কি? * * * * বেদব্যাস বলেন, "হিন্দুধর্ম্মের পুনরালোচনাই হিন্দুধর্ম্মের আবর্জ্জনা দূর করার প্রধান উপায়।" তবেই দেখা যাইতেছে, বেদব্যাসও আবর্জ্জনা দূর করার পক্ষপাতী। অথচ এই আবর্জ্জনা দূর করিতে নবজীবন প্রয়াসী বলিয়া বুঝান হইতেছে, "নবজীবন ধর্ম্মের সংস্কার করিতে চাহেন। বেদব্যাস সংরক্ষণের পক্ষপাতী (!)" আমরা নবজীবনের মতের সমালোচনা করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ধর্ম্মের নৈসর্গিকতা এবং মৌলিকতার সংস্করণ অসম্ভব। অশাস্ত্রীয়তা, (অনৈসর্গিকতা) আবর্জ্জনা, কুসংস্কার, রঙ্গদারি প্রভৃতিকে বিদূরিত করিতে নবজীবন (বা নব্য হিন্দুসম্প্রদায়ের নেতাগণ) বদ্ধপরিকর। পক্ষান্তরে তলাইয়া বুঝিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, বেদব্যাসের মতও প্রায় তদনুরূপ। একথা আমরা আমাদের দ্বিতীয় প্রবন্ধে পরিষ্কার রূপে বলিয়াছি। তবে বেদব্যাস ও নবজীবন, ইহার মধ্যে কে মাথা ঘুরাইয়া মুখে অন্ন দিতে চাহেন, সে কথার বিচার করা হয় নাই। সে বিচারের প্রয়োজন নাই। কিন্তু নীলকণ্ঠ বাবু একটি অসামান্য কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ আমরা বুঝিতে পারি নাই। তিনি বলেন "কেবল বেদব্যাস (ধর্ম্মের) সংরক্ষণের পক্ষপাতী।" এ সংরক্ষণ প্রয়াস কিরূপ? "ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই ঈশ্বর বাক্যের যথার্থ প্রদর্শন করিতে কি বেদব্যাসের "অকস্মাৎ আবির্ভাব?" তাহা হইলে বুঝা গেল—"বেদব্যাসের উদ্দেশ্য উচ্চ—অতি উচ্চ!"

২। * * * * "নবজীবন বলেন, বৃটিশ ফরমাকোপিয়া ভিন্ন অন্য কোথাও আত্মার পীড়ার ঔষধ নাই।" এটি নীলকণ্ঠ বাবুর মন গড়া কথা। আত্মাভিমানে স্ফীত না হইয়া, নিরপেক্ষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, বেদব্যাসের ন্যায় নবজীবনও (নব্য হিন্দুসম্প্রদায়ের নেতাগণও) বলেন, হিন্দুর নিদানেই হিন্দুর আত্মার মহৌষধ বর্ণিত আছে। তবে নবজীবন ইহাও বলেন, যাহারা উত্তরাধিকারী সূত্রে চিকিৎসক, হিন্দুর নিদানে যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, যাহারা মনুষ্যের চক্ষু রোগের চিকিৎসা করিতে প্রায়ই পিতা পিতামহের কৃত গো চিকিৎসার ব্যবস্থানুসারে সাঁড়াসী পোড়াইয়া পাছায় দাগ দিয়া থাকেন, দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুর

নিদান মতে হিন্দুর আত্মার পীড়ার ঔষধ নির্ণয় করিতে তাঁহারাই প্রস্তুত এবং তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক। তবে যদি সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ প্রকৃত জ্ঞানী চিকিৎসক পাওয়া যায়, তবে বৃটিশ চিকিৎসকের বা বৃটিশ ঔষধের প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে প্রাগুক্তরূপ গো চিকিৎসকের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগাপেক্ষা, প্রয়োজনানুসারে বিচক্ষণ বৃটিশ চিকিৎসকের আশ্রয় লওয়ায় দোষ কি? এই অবস্থায় হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ইউরোপীয় চিন্তা ও যুক্তির মিশ্রণ করায় অপরাধ কি বুঝি না?

৩। নীলকণ্ঠ বাবু তৃতীয় দফাতে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তত্তাবৎ তারা প্রসাদ বাবুর প্রবন্ধের মুকুট স্বরূপ সেই "যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্ম হানি প্রজায়তে"—ইতি শ্লোকার্দ্ধের উত্তরেরই সার সঙ্কলন মাত্র। সুতরাং তদ্বিষয়ের বিচার না করিলেও চলে। কেননা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, (কথাও ঠিক) "তারাপ্রসাদ বাবু নবজীবন নহেন।" তথাপি নীলকণ্ঠ বাবুর ঐ কথাটি জপমালা হইয়াছে দেখিয়া নবজীবন সম্পাদক "ধর্ম্মের যাজনা" নামক প্রবন্ধে নবজীবনের মত বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতেছি, নীলকণ্ঠ বাবুর সেই এক ঘেয়ে বুলি আজও যায় নাই। এই প্রবন্ধে উক্ত গুরুতর বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভবে না। অদ্য এই মাত্র বলিয়া রাখি, যে, যুক্তি-প্রাণ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের যে যুক্তিবলে হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত হইয়াছে, সেই সকল যুক্তিশাস্ত্র (ষড় প্রদর্শন প্রভৃতি) থাকিতে "যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্ম হানি প্রজায়তে" শুনিয়া বেদব্যাস ওরফে নীলকণ্ঠ বাবুর মস্তক ঘূর্ণিত ও হৃৎকম্পন হয় কেন? নীলকণ্ঠ বাবু বলেন,—"বেদব্যাস যুক্তির অবমাননা করেন না। তবে বেদব্যাস নিজ যুক্তির অনুসরণ না করিয়া, ঋষিগণের যুক্তির অনুসরণ করেন। বেদব্যাস মনে করেন যে, অধুনাতন পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতের যুক্তি অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের যুক্তির মূল্য ও সারবত্তা অনেক অধিক।" আমরা বলি, "ঋষিগণের যুক্তির মূল্য ও সারবত্তা অনেক" আছে বলিয়া তাই যুক্তি-মূলক ধর্ম্ম-শাস্ত্র আজও স্বদেশে বিদেশে আদরণীয়, অধুনাতন (পাশ্চাত্য শিক্ষিত হউক কি প্রাচ্য শিক্ষিতই হউক) কোন পণ্ডিতের বাক্যে যদি যুক্তির মূল্য ও সারবত্তা অনেক অধিক না থাকে, তবে তাহা একদিনও টিকিবে না। আজ টিকিলেও পরে টিকিবে না। এই ভরসায় নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণ তুষ্ণীম্ভাবালম্বন করিয়াছেন, প্রাচীন সম্প্রদায়ের নেতাগণ সেরূপ পারেন না কেন? যে কোন কথা শুনিবামাত্র তাহা অসার বলিয়া উড়াইয়া দিলেই কি শাস্ত্রীয় উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তদনুসারে নিজ জীবন নিয়মিত করা হয়?

আমরা ত জানি, গুরুর নিকট শিষ্য যে প্রশ্ন করে, তাহার অধিকাংশ পরে টিকে না; তাই বলিয়া কি গুরুদেব শিষ্যের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কেবল গালাগালি দিয়া গুরুগিরির পরাকাষ্ঠা দেখাইবেন? গুরু শিষ্যের এইরূপ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত দেখিয়া ব্রাহ্ম সম্প্রদায় কটাক্ষ করিলে, চূড়ামণি প্রমুখ পণ্ডিত-গণকে যে গুরু জ্ঞানে নব্য সম্প্রদায় প্রশ্ন চ্ছলে তর্ক উপস্থিত করেন, নবজীবন সম্পাদক তাঁহাব সাধারণী পত্রিকায় এ কথা স্পষ্ট বলিয়াছিলেন। সেইরূপ বিনয়-নম্র উক্তিও কি আচার্য্যবরের মনোমত হয় নাই? এরূপ অবস্থায় কে দলাদলির অগ্রণী, জিজ্ঞাসা করিলেও কি নবজীবনের দিকে টানিয়া কথা বলা হয়? না ইহারই নাম নবজীবন হইতে বেদব্যাসকে প্রভেদ ভাবা? সাধারণে এ সকল রহস্য বুঝিতে অক্ষম!

৪। নীলকণ্ঠ বাবু চতুর্থ দফাতে উদারতা কথাটি লইয়া বড়ই বিচার মল্লতা দেখাইয়াছেন। আমাদের প্রবন্ধ একটু বিস্তৃত হইলেও আমরা দেখা-ইতে চেষ্টা করিব,—নীলকণ্ঠ বাবুর প্রবন্ধের ভূমিকায় আর উপসংহারে সম্পূর্ণ মত-বৈষম্য ঘটিয়াছে। নীলকণ্ঠ বাবু বলেন—"নবজীবন সর্ব্ব-জনীন উদারতা চাহেন। তিনি (নবজীবন) বলেন—অন্য কোন ধর্ম্ম বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা করা অনুচিত।" ইহার পরেই নীলকণ্ঠ বাবু বলিতেছেন—যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও মৃত্তিকা, বিষ্ঠা ও চন্দন, হস্তী ও পিপীলিকা, আত্ম ও পর এ সমস্তে তুল্য জ্ঞান করিতে পারেন, তাঁহার উদারতা প্রকৃত উদারতা। পাঠক দেখিলেন, নীলকণ্ঠ বাবু প্রথমে বলিলেন—নবজীবন সর্ব্ব-জনীন উদারতা চাহেন। আবার যখন উদারতার ব্যাখ্যা করিতে বসিলেন, তখন ভাষার চোটে একরূপ দেখাইলেন—বিশ্বজনীন উদারতা। তবেই বুঝান হইল না, নবজীবন সর্ব্ব জনীন উদারতার অপব্যবহার করেন কি না? নীলকণ্ঠ বাবু বলেন,—যদি নবজীবনের এ উদারতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি নবজীবন ও বেদব্যাসে এত প্রভেদ করিতেন না, তাহা হইলে তাঁহার নিকট উভয়ই তুল্য বলিয়া বোধ হইত। এতক্ষণে বুঝা গেল, আমরা যে কারণে নবজীবন ও বেদব্যাসে প্রভেদ আশঙ্কা করিয়াছি, বেদব্যাস সম্পাদক বা নীলকণ্ঠ বাবু আদৌ সে কথা তলাইয়া বুঝেন নাই। "পরম ভক্তিভাজন আচার্য্যদেব শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয়কে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, এবং বেদব্যাসের প্রধান হিতৈষী ও লেখক * * * * * মহাশয়-দিগের উপর অতি তীব্র কটাক্ষ করিতে লেখক কোনরূপ সঙ্কুচিত হয়েন

নাই," কেবল এই এক ধূয়া ধরিয়া নবজীবন ও বেদব্যাসের উদ্দেশ্য ও মত পার্থক্য বুঝাইতে গিয়া বেদব্যাস সম্পাদক বা নীলকণ্ঠ বাবু মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমরা প্রথম প্রবন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে,—বেদব্যাস কেবল সম্প্রদায় বিশেষের মুখপত্র হইতে ইচ্ছুক, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্ম সংস্করণ বা সংরক্ষণ চেষ্টা ফলবতী হইবে না। দলাদলি গালাগালিরই ঘোঁট হইবে। সকল শ্রেণীর হিন্দুকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে ইচ্ছা থাকিলে, সকলের সকল প্রকার প্রশ্নোত্তর মীমাংসা পূর্ণ প্রবন্ধ বেদব্যাসে প্রকাশিত না হইলে উদারতা রক্ষা হইবে না। গোঁড়ামীতে সে ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ গোঁড়ামী নাই বলিয়া নবজীবন ও প্রচারের উদারতার প্রশংসা করা হইয়াছে। এরূপ প্রভেদ প্রদর্শন করাকে বিদ্বেষ বুদ্ধির পরিচায়ক বলা সঙ্গত কিনা পাঠকগণই সে বিচার করিবেন। নীলকণ্ঠ বাবু প্রবন্ধের উপসংহারে বলিতেছেন,—"বেদব্যাস হিন্দুধর্ম্মকে ভক্তি করে। সুতরাং বেদব্যাস হিন্দুধর্ম্মকে অন্য ধর্ম্ম (?) অপেক্ষা ভাল বলিয়া মনে করে। (নবজীবন তবে কি বলে?) ইহা অনুদারতা বা সংকীর্ণতা হইলেও বিকৃত উদারতা নহে।" অথচ প্রবন্ধের ভূমিকাতে বর্ত্তমান লেখককে কটাক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে,— * * * * "কারণ নিরপেক্ষ মীমাংসার মূল সূত্র এই যে, আমি ভিন্ন অন্য সকলেই অজ্ঞানী ও অধার্ম্মিক, অতএব দোষী।" পাঠক দেখিলেন!—(কেমন) অহঙ্কারের ঘৃতে ভাজা, উদারতার ডিম্?

আমরা নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে পারি বা না পারি, "আমরাই কয়েকজন ধর্ম্মধ্বজী কেবল হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিতে অকস্মাৎ ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছি। আমরাই কেবল হিন্দু, আর সকলেই-অহিন্দু," * এরূপ ভাব কোথাও প্রকাশ করি নাই। আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছি,—প্রাচীন ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া ধর্ম্ম সংস্করণ বা সংরক্ষণ চেষ্টা না করিলে, বর্ত্তমান অবস্থার নবজীবন ও বেদব্যাসের চেষ্টায় কোন ফল হইবে না। কেবল পুর্ব্বকালের ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীর সহিত কলেজ-ফেরতা বাবু দলের দলাদলি গালাগালির পুনরভিনয়ই হইবে। উপায় কি? বাঙ্গালীর হিন্দুর প্রতি যে ধর্ম্মরাজ বিরূপ! তাই নবজীবন বঙ্গ দর্শনের উত্তরাধিকারীত্ব করিয়াই বলিতেছেন—'আজ তোমার (হিন্দুর) নবজীবন হইল।' ৺ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সামশ্রমীর পথানুসরণ করিয়াই বেদব্যাস বলিতেছেন—

বেদব্যাস ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থ অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণ হিন্দু সশঙ্কভাবে চিন্তা করিতেছে,—নবজীবন চারি বৎসর বয়সেই অতি বৃদ্ধের ন্যায় যষ্টি ভরে ধীরে ধীরে পদক্ষেপণ করিতেছেন। বেদব্যাসও হয়ত কুরুক্ষেত্র যোগের পর হইতে ক্রমে তপোবনান্তঃস্থবে যোগ নিদ্রায় অসাড় অচল হইয়া পড়িবেন। পাঠকে পড়েন না বলিয়া, নবজীবনের লেখকগণের উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে। গ্রাহকগণ মূল্য দেয় না বলিয়া "বহু পরে যে মূল্য পাওয়া যায়, বা তাও যায় না—তাহার নাম অগ্রিম মূল্য" এবং "সময়ে যাহা কখনই বাহির হয় না—তাহার নাম সাময়িক পত্র"—সম্পাদক শুধুই রহস্য প্রবন্ধে এই প্রকৃত রহস্য প্রকাশ করিয়া সাময়িক পত্রিকা মাত্রেরই অবস্থা ও পরিণামের আভাস দিয়াছেন। বেদব্যাসের কেবল তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ; সুতরাং হুজুক প্রিয় বাঙ্গালী পাঠক বেদব্যাসের গ্রাহক সংখ্যা বাড়াইয়া সম্পাদককে আশ্বস্ত করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু অচিরে বেদব্যাসকেও যে নবজীবনের কান্না কাঁদিতে হইবে না, কে বলিল? তাই বলি পণ্ডিত ও শিক্ষিত মহাশয়গণ! আপনারা জনে জনে সম্পাদক হইয়া ধর্ম্মরাজের লেজ ধরিয়া টানাটানি না করিয়া, একবার মিলিয়া মিশিয়া একখানা সাময়িক পত্রিকা সম্পাদন পূর্ব্বক, হুজুক-প্রিয় দলাদলি-প্রিয় বাঙ্গালা নামের কলঙ্কাপনয়ন করুন না কেন? প্রচার-সম্পাদক যে বলিয়াছেন—সাময়িক পত্রিকার সামান্য মূল্য যে গ্রাহকগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক দেয় না, তাহা নয়, দিতে পারে না বলিয়াই দেয় না। এ কথা কি আপনারা অনুমোদন করেন না?

আমাদের বিশ্বাস এই যে, এখনও ভারতবর্ষ বা বঙ্গদেশবাসীগণ ইংলণ্ড প্রভৃতি শিক্ষিত-সঙ্কুল দেশের অধিবাসীদের ন্যায় সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকার উপকারিতা বুঝিলেও তাহার উন্নতি ও স্থায়ীত্ব বিধান করিতে শিখে নাই, সুতরাং দেশীয় ভাষায় পত্রিকা প্রকাশের আড়ম্বর দেখিয়া আমাদের আহ্লাদে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পত্রিকা যখন নব প্রকাশিত সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করেন, তখন সে আশীর্ব্বচন শুনিলে বাস্তবিকই দুঃখের সহিত হাসি পায়। জল বুদ্বুদ্ প্রায় পত্রিকা সংখ্যার অকস্মাৎ আবির্ভাব, তিরোভাবকে আমরা বাঙ্গালার উন্নতির চিহ্ন বলিতে পারি না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল্মীক পিণ্ডের উত্থান পতন দেখিয়া, বীতশ্রদ্ধ হওয়া অপেক্ষা, শিলাখণ্ড সদৃশ রাজমহলের পাহাড় শ্রেণীকে আমরা ভক্তির চক্ষে দেখি। তাই গৌরব-ভ্রষ্টা প্রাচীনা তত্ত্ববোধিনীকে বহু পরে বাহির হইতে দেখিলেও

মনে একরূপ উৎকট আনন্দ হয়। পরন্তু অপোগণ্ড নবজীবন, প্রচার, কি বেদব্যাসের ত কথাই নাই; লব্ধ প্রতিষ্ঠ বঙ্গ-দর্শনের (যিনি কৈশোর বয়সে পদার্পণ করিতে না করিতেই লীলা সম্বরণ করিলেন, তাঁহার) অবস্থা ভাবিলেও মনে দুঃখ ভিন্ন সুখ হয় না। যে বালক ১০।১২ বৎসর বয়সে অথবা তৎ পূর্ব্বেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, কে তাহার দীর্ঘ জীবন কল্পনা করিয়া আশ্বস্ত হইতে পারে? তাই বলিতে ইচ্ছা হয়,—এ দেশের পত্রিকা গুলির অকস্মাৎ আবির্ভাব (জন্ম) দর্শনেই গয়ালীদিগের ন্যায় শোক, অনুতাপ, রোদন করা উচিত। এবং মৃত্যু হইলেই উৎসব আমোদ প্রকাশ করিলে যেন ঠিক কাজ হয়! আমাদের এই ফলিত জ্যোতিষ বাক্য শুনিয়া পত্রিকা সম্পাদক বা অধ্যক্ষগণ যে দুঃখিত এবং মর্ম্মাহত হইবেন, তাহা আমরা জানি। এবং প্রাগুক্ত ফলিত জ্যোতিষ বাক্যের সত্যতা সমর্থনে তাঁহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকিলেও কেবল মহামায়া বশে পুত্রের 'পত্রিকার' অমঙ্গল চিন্তা যে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিবেন না, ইহাও ঠিক কথা। সুতরাং তাঁহাদের মন-স্তুষ্টিকর কথা আমরা আমাদের দ্বিতীয় প্রবন্ধের উপসংহারে নিরপেক্ষভাবে বলিয়াছি। সেই কথাগুলি এই প্রবন্ধের ভূমিকা স্বরূপ গ্রহণ করিলেও চলে। কিন্তু যাঁহারা আমাদের প্রবন্ধের ভাব বিদ্বেষ-বুদ্ধি-পরতন্ত্র হইয়া উল্টা বুঝিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বুঝাইতে পূর্ব্ব প্রবন্ধের শেষ কথা উদ্ধৃত করিয়া উপসংহার কালে আবার বলিতেছি,—* * * * * সাধারণের সে আশা পূর্ণ করিতে যদি নবজীবন কি প্রচার অসমর্থ হন, তবে আমরা নবজীবন ও প্রচারের দীর্ঘ জীবন কামনা করি না। বেদব্যাস যদি সকল শ্রেণীর হিন্দুর উপদেষ্টা বন্ধু বা গুরুর ন্যায় কুহকাবৃত হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় রহস্য সকল সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারেন, তবে বেদব্যাসকেই আমরা বৃহদাকারে দীর্ঘ কাল বঙ্গীয় সাহিত্য গগণে বিরাজ করিতে দেখিলে সুখী হইব। যে সদুপদেষ্টা সেই আমাদের বন্ধু। আমরা খ্যাতি প্রতিপত্তির খাতিরে আসল কথা ভুলিব না।"

শ্রীচন্দ্রমোহন সেন।

বিজ্ঞাপন।

চৌকী (chairs) বিক্রী।

মিউনিসিপাল্ চেয়ারম্যান ও তাঁহার বাইসের উপবেশনার্থ।

চৌকির উপকরণের বিশেষ বিবরণ।

যথা ;—

প্রথম উপকরণ, কাষ্ঠ ;—মেহগ্নি, শেগুণ, শিশু ইত্যাদি নহে। এক অপূর্ব্ব এবং অলৌকিক গুণ বিশিষ্ট কাষ্ঠ। নাম হেঁজল কাষ্ঠ। বিশেষ বিবরণ আবশ্যক বলিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে যে, পুরাকালে রাজা বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন নামক একখানি উক্ত কাষ্ঠের সিংহাসন ছিল। সে সিংহাসনের অলৌকিক গুণরাশির কথা কাহারো অবিদিত নাই। কালক্রমে রাজার রাজ্য পতনে, রাজ-ভবন ভঙ্গে, সিংহাসন খানি ভূমিসাৎ হয়, এবং ক্রমে তদুপরি মৃত্তিকার স্তূপ গঠিত হয়। রাজ্যখণ্ড যখন জনহীন সমতল ভূমি, তখন ঐ সিংহাসন-প্রোথিত স্থানটি একটি মাটির ঢিপী মাত্র। রাখাল বালকেরা মাঠে আসিয়া গরু ছাড়িয়া দিয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিত; কখন রাজা প্রজা খেলা করিত এবং ঐ মাটীর ঢিপী কথঞ্চিৎ উচ্চস্থান বলিয়া সেইটি সিংহাসন করিত। যিনি রাজা সাজিয়া তাহাতে বসিতেন, তাহারই মস্তকে রাজবুদ্ধির ঢেউ খেলিত। একদা এক দুঃখী ব্রাহ্মণ স্থানান্তরে গমন করিলে ব্রাহ্মণের স্ত্রীর প্রতি লোভাসক্ত এক ব্রহ্মদৈত্য ঐ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া বাটীতে আসেন। যেন প্রকৃত ব্রাহ্মণই বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইলেন। ব্রহ্মদৈত্য ব্রাহ্মণীর সহিত ঘরকন্না করিতে থাকেন। ব্রাহ্মণীর সংস্কার, সেই তাহার স্বামী। তাহার পর প্রকৃত ব্রাহ্মণ প্রত্যাগত হইলে, কে সত্য সেই ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রী কাহার, এই সন্দেহ তর্ক উপস্থিত হইলে, মীমাংসার জন্য রাজ-কর্ম্মচারীর নিকট স্ত্রী সমভিব্যাহারে দুই জনে যাত্রা করেন। কথিত আছে বালকেরা সেইদিন রাজাপ্রজা সাজিয়া খেলা করিতেছিল। পথিমধ্যে তাহারা সবিশেষ অবগত হইয়া স্তূপারূঢ় কল্পিত রাজ-সমীপে বিবাদী সম্প্রদায়কে আনয়ন করে। রাখালরাজ সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়া একটী চর্ম্ম-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র তৈলভাণ্ড গ্রহণ করিয়া বলেন যে, এই ভাণ্ডের মধ্যে বিবাদী

দুই ব্যক্তির মধ্যে যিনি প্রবেশ করিতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত ব্যক্তি, স্ত্রী তাঁহারই। ব্রাহ্মণের শুষ্ক বদন হইল, ছদ্মবেশী ব্রহ্মদৈত্যের মুখে আর হাসি ধরে না। ব্রহ্মদৈত্য তৎক্ষণাৎ আত্মদেহ সংকীর্ণ ও বায়ুবৎ করিয়া ভাণ্ডে প্রবেশ করেন; রাখালরাজ ভাণ্ডমুখ দৃঢ় বন্ধন করিয়া জলমগ্ন করাইলেন এবং ব্রাহ্মণকে স্ত্রীর সহিত বিদায় করিলেন। রাখালরাজের এতাদৃশ চমৎকার সুচতুর রাজবুদ্ধির পরিচয়ে, ব্রাহ্মণ অনেক বিবেচনায় স্থির বুঝিলেন যে, কথিত মৃত্তিকা স্তূপ-নিম্নে নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য আছে, নচেৎ এরূপ রাজবুদ্ধির পরিচালনা কদাপি হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ছিল না যে, তাঁহার অনুমান সত্য কি না, তাহা পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করেন। বিপদোদ্ধারই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া রহস্যভেদের কোন চেষ্টা করেন নাই। তবে একটী সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছিলেন, এই ঘটনাটি এবং ঐ মৃত্তিকা স্তূপের নির্দ্দিষ্ট স্থানটি লিপীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইংরাজ বাহাদুর যখন ভারতের সেই প্রদেশ অধিকার করেন, তখন রাজকার্য্যের নিয়মানুসারে ভাবি বন্দোবস্তের জন্য প্রজাগণের যাবতীয় দলিল দস্তাবেজ রাজ দপ্তরে জব্দ হয়। সেই সঙ্গে ঐ ব্রাহ্মণের লিখিত লিপীখণ্ড আসিয়া পড়ে। এতকাল সেই কাগজ ফরেন আফিসের দপ্তর খানায় পড়িয়াছিল। মহাদক্ষ লর্ড রীপণ ফরেন আফিসের কাগজের পোকা ছিলেন, তাঁহার নয়নে ঐ কাগজ পড়ে। আর যায় কোথা? অম্নি স্থান-নির্ণয়, লোক-নিয়োগ, মৃত্তিকা-স্তূপ-খনন, এবং তন্মধ্যে কথিত অপূর্ব্ব গুণবিশিষ্ট রাজ-সিংহাসন প্রাপ্তি। কিন্তু সিংহাসন খানি ভগ্নাবস্থ। লর্ড রিপণ ভারতের অদ্বিতীয় মঙ্গলার্থী, ভগ্ন সিংহাসন খানির কাষ্ঠে এই সকল চৌকি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

দ্বিতীয় উপকরণ বেত্র;—চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর নামক মহাদেব (এই দেবের নামের উৎপত্তি এবং অর্থ আমরা জানি না) বেত বন হইতে উঠিয়াছিলেন। জেলেরা স্বপ্ন পাইয়া তাঁহাকে তোলে। বেতকে চিঁচিড়া বলিত, এবং তাহাতে ঐ নগরের নাম চুঁচুড়া। সেই বেতবন কাটিয়া বসতি হয়। জেলেরা যত্ন করিয়া সেই বেত অনেক সংগ্রহ করিয়া রাখে। সংস্কার যে এই বেতে মহাদেবের ভূতের আবির্ভাব হয়। গাজনের সময় ঐ বেঁতের এক একটী আটি হাতে করিয়া সন্ন্যাসিরা খাটাখাটুনি করে। বেতের গুণে সন্ন্যাসীদের মাথা চলে, ঘাড় কাঁপে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নানা প্রকার পক্ষাঘাতিক অবস্থা ঘটে। এমন কি মূল সন্যাসী মরিয়া যায়, আবার কপালে বেতের বা মারিলেই বাঁচিয়া

উঠে। বালির হালদারেরা বক্রেশ্বরের পুরোহিত, জেলেরা হালদারদের চেলা। অনেক হালদার লাট সাহেবের কেরানি, তিনিই কতক গুলিন সেই বেত লর্ড রিপণকে দেন। সেই ভূতাবিষ্ট বেতে এই চৌকি গুলিন ছাওয়া।

তৃতীয় উপকরণ, বারণিষ;—সচরাচর স্প্রীটে গালা গলাইয়া বারণিষ প্রস্তুত হয় এবং রঙের জন্য খুনখারাপি দেওয়া হয়। এ চৌকির বারণিষ স্বতন্ত্র প্রকারে প্রস্তুত। স্প্রীটের যে শক্তি, গর্দ্দভের মূত্রেও সেই শক্তি, রসায়ন বিদ্যাবিদেরা লাট সাহেবকে বলিয়া দেন এবং যাহারা স্প্রীট পান করিয়াছেন তাঁহারাও জানেন। গালার পরিবর্ত্তে শজিনা গাছের আটা এবং খুনখারাপির পরিবর্ত্তে ছারপোকার রক্ত। এই তিন দ্রব্যে এই চৌকির বারণিষ প্রস্তুত হয়।

লর্ড রিপণ এই সকল উপকরণে কতকগুলিন চৌকী প্রস্তুত করাইয়া ইলেক্‌টিব্‌ সিষ্টেম জারির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি জেলায় দুইখানি করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন।

চৌকীগুলিন দেখিতে শাদাশিদে।

চৌকীর গুণ।

১। গুণ অসীম; অনেকেই জানেন যে, বিলাতে দুষ্প্রবৃত্তি সাধন জন্য এক প্রকার কলের চৌকী প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাতে বসিলেই কলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এরূপ আটকাইয়া যায়, যে উঠিবার শক্তি আর থাকে না। এই সকল চৌকীতে কল কবজা নাই, কিন্তু একবার বসিলে আর উঠিবার যো নাই। দুই চৌকীতে প্রভেদ এই মাত্র যে, কলের খানিতে বসিলে ইচ্ছা থাকিলেও উঠিবার শক্তি থাকে না, আর এই সকল চৌকীতে বসিলে উঠিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত একেবারে রহিত হইয়া যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

২। চৌকীতে বসিবামাত্রেই মাথা চন্ চন্ করিতে থাকে, ঘাড় কাঁপে, শরীর গরম হইয়া উঠে, আহ্লাদে মন উথলিয়া পড়ে, অহঙ্কারে ফুলিতে হয়, স্ফূর্ত্তির ঢেউ চলে, ভূতে স্বর্গে তুলিয়া দেয়, এবং মনে দৃঢ় সংস্কার জন্মে যে আমিই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা এবং দণ্ড মুণ্ডের মালিক।

৩। সমস্ত রাত্রি হট্ট মন্দিরে খোলা ভাঁটির দোলতে পপাত মা ধরণীতলে, আর অরুণোদয়ে চৌকীতে বসিলেই সচ্চরিত্র, লোকাভিরাম, জিতেন্দ্রিয় সাক্ষাৎ মহাদেব। গুলির আড্ডায় অষ্ট প্রহর অবস্থান, কিন্তু চৌকীতে

জ

বসিলেই স্বয়ং বিষ্ণু-অবতার। গোস্বামী-রূপে মোহিনী-কুঞ্জে সতীত্ব-সংহারের হরি-সংকীর্ত্তনে বিহ্বল, আর চৌকীতে বসিবামাত্রেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিমান্ পবিত্র ধর্ম্মাবতার।

* * * * * * *

৪। চৌকীতে সমস্ত বিদ্যার আবির্ভাব;—বিচারে, আইনের মুণ্ডপাত; (আপিল নাই।) হিসাবে, গোজামিল; (অডিটরের চক্ষে ধুলা নিক্ষেপ।) উপার্জ্জনে, গরীবের শোণিত-শোষণ; (ভিখারীর টেক্স।) ব্যয়ে, টাকার পিতৃশ্রাদ্ধ। নির্ম্মাণ কার্য্যে, প্রতি বৎসর শাঁকোর ও পয়োনালার পুনঃ সংস্কার এবং নর্দমার পঙ্কে গলি রাস্তা মেরামত। স্বাস্থ্যরক্ষায়, পথের ধারে গামলা পুঁতিয়া ছিন্ন দরমার আবরণে পায়ুখানার ব্যবস্থা।

৫। শক্তির সঞ্চারণ;—চৌকীতে বসিলেই ধমনীতে চঞ্চল ছাগরক্তের সঞ্চালন, শরীরে সতেজ ষাঁড়ের বলের আবির্ভাব, এবং মস্তকে বাল-বুদ্ধির উদ্ভাবনা। অকর্ম্মণ্য পঞ্চান্ন-বিপদাপন্ন বৃত্তি ভোগী বাইশ্-মান্ তাহার পরিচয়।

৬। সর্ব্বভেদী দিব্য দৃষ্টি;—আগেকার সাহেব চেয়ারম্যান ও তাঁহার বাইসকে সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইয়া সমস্ত দেখিতে হইত। এ চৌকী-শোভিত অচল দেবতা আপিস ঘরের প্রাচীর চতুষ্টয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সহরের সর্ব্বত্র যাবতীয় কার্য্য দেখিতে পান।

৭। অহোরাত্র ঘোর মিথ্যার নরক সৃজন, মিথ্যা মোকদ্দমার প্রশ্রয়দাতা সাক্ষাৎ অধর্ম্ম অবতার, কিন্তু চৌকীতে বসিলেই ট্যাক্স সম্বন্ধে দরখাস্তকারী মাত্রেই হজুরের সম্মুখে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত।

৮। হৃদয়ের প্রশস্ততা। কুকুরের মূত্রে রাজপথে জল প্লাবন জ্ঞান। জোনাকিপোকায় সহর আলোকময় দর্শন। প্রজার সন্তরণ শিক্ষার্থ বর্ষায় পথে জলাশয় সৃজনের সদ্ব্যবস্থা। গলিতে পদব্রজে কেহ চলেনা, এই সংস্কার। মেথরকে দয়া করিতে দ্বিপ্রহরে অরুণোদয়,—জ্ঞান।

৯। চৌকীর উদারতা গুণ;—অপরিমিত দয়া, বড় মানুষ ও আত্মীয়-গণের উপরেই; প্রমাণ, কীর্ত্তি কলাপ যত কিছু তাঁহাদেরই দ্বারে। অটল ভক্তি, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের শ্রীচরণে; তাঁহারই ঘোটক-ভ্রমণের পথ স্বহস্তে পরিষ্কার। নম্রতা;—স্বয়ং ঢাক ঘাড়ে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বগুণের সংকীর্ত্তন প্রমাণ,—অধমতারণ ষ্টেট্স্ম্যানে।

১০। চৌকিগুলিন নিদ্রার চির বাসস্থান। তবে মধ্যে মধ্যে বড় বড়

কাজের স্বপ্ন দেখিতে হয়; অর্থাৎ জলের কল, টাউন হল, গ্যাস লাইট আর এসপ্লানেড। টাকা,—স্বপ্নের টাঁকশালে তৈয়ার করিতে হইবে।

অতএব অতীব আহ্লাদ সহকারে সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত অভূত পূর্ব্ব শক্তি বিশিষ্ট উপকরণ বিনির্ম্মিত এবং এতাদৃশ দশ দফা গুণাবলি ভূষিত চমৎকার চৌকী আর কথনই সৃষ্ট হয় নাই, এবং কথনই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয় নাই। লর্ড রিপণের আমলেই প্রথম আমদানি। প্রতি তিন বৎসরে মফস্বল টাউনে এক একবার প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হয়। সর্ব্বাগ্রে প্রথম chance এ দেশের পোঁটা-চুন্নীর ছেলে পদ্মলোচনদের এবং আমড়ার ঢেঁকি অবতারদের দেওয়া হয়। কিন্তু উচ্চ মূল্যে বিক্রয় ব্যবস্থা।

মূল্য, ভোট। ভোট,—গল-লগ্নকৃতবাসে তোষামোদ, হাতে পৈতা জড়াইয়া অভিশাপ এবং আত্মহত্যার ভয় প্রদর্শনে পাওয়া যায়। খরিদদারের একটী মাত্র গুণ থাকা চাই; মন ভিজান, মিথ্যাপূর্ণ মিষ্টমুখ; এস খরিদদার, চলিয়া এসো! ভোট লয়ে জল্‌দি এসো—যায় চৌকী যায়! যায় চেয়ার যায়! আয় খরিদদার আয়!!!!

আগমনী।

(মেনকা উক্তি।)

মোহাড়া।

গিরিরাজ হে জামায়ে এন মেয়ের সঙ্গে,—
মেয়ের যেরূপ মন, মায়ে বোঝে যেমন,
পুরুষ পাষাণ তুমি, বুঝ না তেমন,
ভাই শিবের নাম করি, আমার নাম ধরি,
উপহাস করিতেছে রঙ্গে॥

(চিতেন।)

আমি ভুলি নাই আর বারের কথা,
মায়ের মনে, আমি মা হয়ে দিয়াছি ব্যথা,
উমা এলো বাহির দুয়ারে,
কোলে করি ত্বরা করে, জিজ্ঞাসি উমারে,
"আমার শিব ত আছেন ভাল?"
উমা বলে "আছেন ভাল," চখে দেয় অঞ্চল,
বলে 'চখে কি হল? আমার চখে কি হল?'
আমি বুঝিছু সকল, কেন চখে দেয় অঞ্চল,
হিয়ের জল ঝিয়ের চখে উথলিল।

(অন্তরা।)

আমি ভুলি নাই আর বারের কথা,
সরমে মরমের কথা, হিয়েয় আছে গাথা,
কার্ত্তিকে রাখিয়া বুকে, নাচায় গৌরী থেকে থেকে,
সোণার কার্ত্তিক তোমায় দেখে, উঠে চমকে;
বলে তোমায় দেখিয়ে, "মা—ওমা—ওকে দাঁড়ায়ে,"
উমা বলে "তোমার দাদা অই, বাবা, আমার বাবা অই।"
বাপ সোহাগে বাপের ছেলে জড়িয়ে মায়ের ধরে গলে,
বলে, "মা! আমার বাবা কই,
বলে কেন এল না, ওমা বল না,"
বলে, কেশে ধরে টানে, উমা চাহি আমার পানে,
বলে, "কেন এলেন না, তোমার দিদি জানে,"
আমি সেই অবধি, সরমে মরমে, আছি মনো দুখে।

২।

মোহাড়া।

ওহে গিরি গা তোল হে, মা এলেন হিমালয়,
উঠ দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গা কর কোলে,
মুখে বল জয়, জয় দুর্গে জয়॥

কন্যা পুত্র প্রতি বাৎসল্য, তায় তাচ্ছল্য করা নয়।
আঁচল ধরে তারা;
বলে ছিমা, কিমা, মাগো ওমা—
মা বাপের কি এমনি ধারা।
গিরি তুমি যে অগতি বুঝে না পার্ব্বতী
প্রসূতির অখ্যাতি জগন্ময়॥

চিতেন।

গত নিশিযোগে আমি হে, দেখিয়াছি যে সুস্বপন,
এলো হে সেই আমার তারাধন!
দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
বলে মা কই মা কই মা কই আমার,
দেও দেখা দুঃখিনীরে॥
অমনি দু বাহু পসারি, উমা কোলে করি
আনন্দেতে আমি আমি নয়॥

অন্তরা।

মা হওয়া যত জ্বালা,
যাদের মা বলবার আছে, তারাই জানে,
তিলেক না হেরিয়ে মর্ম্মে ব্যথা পাই,
কর্ম্ম সূত্রে সদা স্নেহ টানে॥

চিতেন।

তোমারে কেউ কিছু বলবে না—
দেখে দারুণ পাষাণ,
আমার লোক গঞ্জনায় যায় প্রাণ॥
তোমার ত নাই স্নেহ,
একবার ধরো ধরো, কোলে করো—
পবিত্র হোক পাষাণ দেহ॥
আহা এত সাধের মেয়ে,
আমার মাথা খেয়ে
তিন দিন বই রাখে না মৃত্যুঞ্জয়॥

৩।

মোহাড়া।

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্তে পাই।
উমা অন্নপূর্ণা হয়েছেন কাশীতে
রাজ রাজেশ্বর হয়েছেন জামাই।
শিবে এসে বলে মা
শিবের এখন সে দিন নাই,
যারে পাগল পাগল বলে, বিবাহের কালে
সকলে দিলে ধিক্কার,
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বিভব
কুবের ভাণ্ডারী তার।
এখন শ্মশানে মশানে বেড়ায় না মেনে
আনন্দ কাননে যুড়াবার ঠাঁই।

চিতেন।

ফিরে এলে গিরি, কৈলাসে গিয়ে,
তত্ত্ব না পাইয়ে যার,
তোমার সেই উমা এই এল,
সঙ্গে শিব পরিবার।
এখন যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ,
গঞ্জনা দূরে গেল।
আমার মা কৈ মা কৈ বলে উমা ঐ
ব্যগ্র হয়ে দাঁড়ালো।
বলে তোমার আশীর্ব্বাদে আছি মা ভাল,
দুঃখিনীর দুঃখ ভাবতে হবে নাই।

অন্তরা।

হোক হোক হোক, উমা সুখে রোক,
সদাই হতো মনে।

ভিখারীর ভাগ্যে, পড়েছেন দুর্গে,
তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে ?
দুহিতার সুখ শুনিলে গিরি, যে সুখ হয় আমার,
অন্যে কি জানিবে আর ?
যদি পথিকে কেউ বলে ওগো উমার মা,
উমা ভাল আছে তোর।
যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধেয়ে যাই,
আনন্দে হয়ে বিভোর।
শুনে আনন্দময়ীর আনন্দ সম্বাদ,
আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই।

ফুকো।

এই খেদ হয়, সকল লোকে কয়,
শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
যে দুর্গা নামেতে দুর্গতি খণ্ডে,
সে দুর্গার দুর্গতি একি প্রাণে সয় ?

চিতেন।

তুমি যে কয়েছ আমায় গিরিরাজ
কত দিন কত কথা,
সে কথা আছে শেল সম মম হৃদয়ে গাঁথা,
আমার লম্বোদর নাকি,
উদরের জ্বালায়, কেঁদে কেঁদে বেড়াতো।
হয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোনারো কার্ত্তিক,
ধুলায় পড়ে লুটাতো॥
গেল গেল যন্ত্রণা, উমা বলে মা;
আমি এখন অন্ন অনেককে বিলাই।

মহাশক্তির ধ্যান।

জটাজুট সমাযুক্ত অর্দ্ধেন্দু কপালা,
ত্রিলোচন-যুক্ত মুখে পূর্ণেন্দু উজ্জ্বলা;
সুপ্রতিষ্ঠা সুলোচনা অতসী বরণী,
সর্ব্বাভরণ ভূষিতা নবীন যৌবনী;
পীনোন্নত পয়োধরা সুচারু হাসিনী,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমভাবে মহিষ মর্দ্দিনী;
মৃণাল-বলিত দশ বাহু শোভা করে,
শূল খড়্গ চক্রবাণ শক্তি দক্ষ করে।
খেটক কার্ম্মুক পাশ অঙ্কুশ কুঠার,
কুঠারে বাজিছে ঘণ্টা বামদিকে তাঁর।
মহিষ মস্তক ছিন্ন পদতলে আর,
শিরশ্ছেদোদ্ভব দৈত্য হাতে তলয়ার;
বুকেতে বিঁধেছে শূল, অস্ত্র বিভূষণ,
রক্তারক্তি অঙ্গ তার, আরক্ত লোচন;
নাগ পাশে বদ্ধ সেটা ভ্রূকুটি করেছে,
কেশে পাশে জড়ায়ে মা টানিয়া ধরেছে;
নির্য্যাতনে দৈত্য রক্ত করিছে বমন,
সিংহ দিয়া দেবী তারে করিছে পীড়ন;
'সিংহ প্রতি বলে বধ রে! বধ রে!
আদরেতে হাসি না ধরে অধরে।'
দেবীর দক্ষিণ পদ সিংহোপরি স্থিত
মহিষের পর বাম পদ অধিষ্ঠিত।
শক্র ক্ষয়করী-দৈত্য— প্রতাপ হারিণী,
প্রসন্ন বদনা সর্ব্ব ফল প্রদায়িনী;
চৌদিকে অমর বৃন্দ ঘিরিয়া রয়েছে,
অবিরত স্তব স্তুতি কীর্ত্তন হতেছে;
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা মা চণ্ডের নায়িকা,
চণ্ডা চণ্ডবতী চণ্ড রূপাতিচণ্ডিকা।
অষ্ট শক্তি সুবেষ্টিতা তুমি মহাশক্তি,
তোমার করিব ধ্যান কিবা আছে ভক্তি।
জগৎ জননী তুমি জগতের ধাত্রী,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ দাত্রী।

নবজীবন।

৫ম ভাগ। } কার্ত্তিক, ১২৯৫। } ২য় সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থ-তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ ॥ ৪১।

পদচ্ছেদঃ। ক্ষীণবৃত্তেঃ, অভিজাতস্য, ইব মণেঃ গ্রহীতৃ, গ্রহণ,—গ্রাহ্যেষু, তৎ-স্থ-তৎ-অঞ্জনতা-সমাপত্তিঃ।

পদার্থঃ। ক্ষীণবৃত্তেঃ ক্ষীণা বৃত্তয়ো যস্য সঃ ক্ষীণবৃত্তিস্তস্য সর্ব্ববৃত্তিহীনস্য ইতি যাবৎ অভিজাতস্য নির্ম্মলস্য স্ফটিকস্যেতি যাবৎ ইব যথা, গ্রহীতৃ গ্রহণ গ্রাহ্যেষু আত্মেন্দ্রিয় বিষয়েযু তৎস্থত্বং একাগ্রতা তদঞ্জনত্বং তন্ময়ত্বং তৎস্থশ্চ তদনঞ্জনশ্চ তৎস্থতদঞ্জনৌ, তয়োর্ভাবঃ তৎস্থতদনঞ্জনতা সমাপত্তিস্তদ্রূপ-পরিণামঃ।

অন্বয়ঃ। অভিজাতস্য মণেরিব ক্ষীণবৃত্তেশ্চিত্তস্য গ্রহীতৃগ্রহণ গ্রাহ্যেষু তৎস্থ তদঞ্জনতা সমাপত্তি র্ভবতীতি শেষঃ

ভাবার্থঃ। যথা স্ফটিকোমণিরতিনির্ম্মলস্বভাবতো যস্য জপাকুসুমাদি বস্তুন উপরাগং প্রাপ্নোতি তত্তদ্রূপাশ্রয়াকারেণ নির্ভাসতে তথা স্ফটিককল্পস্য স্বভাবতোনির্ম্মলস্য চেতসো গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষ্ পুরুষেন্দ্রিয়ভূতেষু যত্র যত্র সমাধানং তত্তদ্বস্তুরূপেণ পরিণতির্ভবতি, সা চ তদাকারাপত্তিঃ সমাপত্তি রিত্যুচ্যতে। চিত্তস্য স্বতএব সর্ব্বার্থসাক্ষাৎকারসামর্থ্যমস্তি বিষয়ান্তর ব্যাসঙ্গদোষাদেব তু তৎপ্রতিবদ্ধমতো বৃত্ত্যন্তরপ্রতিবন্ধস্য নিঃশেষতো বিগমে স্বতএব ধ্যেয়বস্তুসাক্ষাৎকারস্তদ্রূপোপপত্তিশ্চ। ধ্যেয়বস্তুনি চ ত্রিবিধানি (১) প্রথমং গ্রাহ্যং তচ্চ স্থূল, সূক্ষ্মভেদেন দ্বিবিধং বাহ্য বিষয়রূপং (২) গ্রহণ

মিন্দ্রিয়ং (৩) গ্রহীতা পুরুষঃ যদ্যপ্যত্র গ্রহীতৃগ্রহণ গ্রাহ্যেষ্বিত্যক্তং তথাপি ভূমিকা ক্রমবশাৎ গ্রাহ্যগ্রহণ গ্রহীতৃষ্বিতি বোদ্ধব্যম্। এতচ্চ বিতর্কবিচারেতি স্থত্রে (১৭।১) বিবৃতমেব।

অনুবাদ। নির্ম্মলস্ফটিকমণি যেমন যে বস্তুর সমীপবর্ত্তী হয় তাদৃশ রূপই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বৃত্তি শূন্য অর্থাৎ নির্ম্মলতাপন্নচিত্ত, চৈতন্যময় পুরুষ, জ্ঞানসাধনইন্দ্রিয় এবং বিষয় এই তিনের মধ্যে যে কোন একটির চিন্তা করত যে সেই ধ্যেয়বস্তুর আকারে পরিণত হয়, তাদৃশ পরিণামের নাম সমাপত্তি।

সমালোচন। বিতর্ক-বিচার ইত্যাদি সূত্রে আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি, চিত্ত প্রথমে স্থূল স্থূল বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে অভ্যাস করে। স্থূল বিষয়ে একাগ্রতা লাভে সামর্থ্য জন্মাইলে সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে থাকে, তাহার পর যে কোন ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া সমাধি অভ্যাস করে, অনন্তর আত্মাকে অবলম্বন করিয়া তন্মন হইয়া তাহারই চিন্তা করে। পূর্ব্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে, চিত্ত যখন কোন স্থূল বস্তু অবলম্বন করিয়া ধ্যান করে তখন কেবল তাহারই চিন্তা করত তাহাতেই একাগ্র হয়, অন্য সকল বৃত্তি উহা হইতে অপসৃত হয় এবং চিত্ত সেই ধ্যেয় বস্তুর আকারে পরিণত হয়। এইরূপ সূক্ষ্ম বিষয়, ইন্দ্রিয় ও আত্মাসম্বন্ধে ও বলা হইয়াছে। চিত্ত যখন যাহার ধ্যান করে অন্য বৃত্তি শূন্য হইয়া কেবল তাহারই ধ্যান করে এবং তদাকারে পরিণত হয়। আমাদের ধ্যেয় বস্তু তিন প্রকার বিষয় বা জ্ঞেয়বস্তু, ইন্দ্রিয় বা জ্ঞানসাধন এবং পুরুষ বা জ্ঞান কর্ত্তা; উহাদের মধ্যে বিষয় বা জ্ঞেয় বস্তু দুই প্রকার স্থূল এবং সূক্ষ্ম চিত্ত প্রথমে স্থূল রূপ জ্ঞেয় বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে অভ্যাস করে, তাহার পর সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মেতে একাগ্রতা লাভ করিয়া জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া সমাধিতে নিমগ্ন হয়। আর তাহার পর স্বয়ং জ্ঞাতা চৈতন্যরূপ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া ধ্যান করে। স্থূল সূক্ষ্ম বিবিধ বিষয়কে গ্রাহ্য বলে, ইন্দ্রিয়কে গ্রহণ বলে এবং পুরুষকে গ্রহীতা বলে। গ্রাহ্য, গ্রহণ এবং গ্রহীতা এই তিনটির মধ্যে চিত্ত যখন যাহাকে অবলম্বন করে তখন অন্যবৃত্তি শূন্য হইয়া কেবল তাহাতেই একাগ্র হইয়া তদাকারে পরিণত হয়। এই তদাকার পরিণামের নাম সমাপত্তি। সমাপত্তি তিন প্রকার গ্রাহ্য-সমাপত্তি, গ্রহণ-সমাপত্তি, গ্রহীতৃ সমাপত্তি। সূত্রে এবং গ্রহীতৃ, গ্রহণ, গ্রাহ্য এইপরন্ধ বিপরীত ক্রমে উক্ত

হইলেও অনুষ্ঠান যোগ্যতানুসারে প্রথমে গ্রাহ্যসমাপত্তি, তাহার পর গ্রহণ সমাপত্তি এবং অবশেষে গ্রহীতৃ সমাপত্তি হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়াছেন সূত্রে স্ফটিকমণির দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাও সূচিত হইয়াছে, যে স্ফটিক মণি যেমন স্বাভাবিক নির্ম্মল চিত্ত ও ঠিক সেই রূপ, আমরা বলি তাহা নহে, কারণ যোগচার্য্যদিগের মতে চিত্ত স্বভাবতঃ সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণ ময় তবে যোগাভ্যাস দ্বারা রজঃ ও তমোগুণ রূপ মলের ক্ষয় হইলে চিত্ত যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বময় হইয়া অবস্থান করে তখন উহা সম্পূর্ণ নির্ম্মল ভাব প্রাপ্ত হয় বটে, এই জন্যই সূত্রকার ক্ষীণ বৃত্তেঃ এই বিশেষণ দিয়াছেন চিত্ত স্বাভাবিক নির্ম্মল নয় কিন্তু ইহার রজঃ এবং তমোময় বৃত্তিগুলির ক্ষয় হইলে উহা স্ফটিক মণির মত নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়। [এই সূত্রে 'সমাপত্তি'র পরিভাষা মাত্র কথিত হইয়াছে। সুতরাং সমাপত্তি কি? এইটুকুমাত্র বুঝানই আমাদের আবশ্যক। বোধ হয় তাহা এক প্রকার বুঝান ও হইয়াছে। তথাপি সংক্ষেপে আর একবার বলি বৃত্তিশূন্য অর্থাৎ একাগ্রতা প্রাপ্ত চিত্তের ধ্যেয়াকারে পরিণামের নাম সমাপত্তি। বিষয় ভেদে এই সমাপত্তি আবার তিন প্রকার গ্রাহ্য সমাপত্তি, গ্রহণ সমাপত্তি এবং গ্রহীতৃ সমাপত্তি। কোন অবস্থায় কিরূপে সমাপত্তি হয় তাহা বিতর্ক বিচার ইত্যাদি সূত্রের সমালোচন স্থলে বিশেষ রূপে বলা হইয়াছে।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥ ৪২।

পদচ্ছেদঃ। তত্র, শব্দ-অর্থ-জ্ঞান-বিকল্পৈঃ, সংকীর্ণা, স-বিতর্কা সমাপত্তিঃ।

পদার্থঃ। তত্র-চতসৃষু সমাপত্তিষু শব্দঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ স্ফোটরূপো বা, অর্থঃ জাত্যাদিঃ, জ্ঞানং সত্ত্ব প্রধানাবুদ্ধিবৃত্তিঃ, বিকল্প উক্তলক্ষণঃ তৈঃ সঙ্কীর্ণা বস্তুতো ভিন্নরূপাণামপি তেষাং পরস্পরং যত্রাভেদেন গ্রহণং ভবতি সা সবিতর্কা স্থূল-বিষয়া সমাপত্তিঃ।

অন্বয়ঃ। শব্দার্থ—সমাপত্তির্ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। সমাপত্তিঃ সবিতর্কা, নিবিতর্কা, সবিচারা নির্ব্বিচারা চ তত্র—কিং নাম সবিতর্কা সমাপত্তি রিত্যত্র বিচার্য্যতে—তত্র সমাহিতো যোগী গবাদিস্থূলবিষয়ং ধ্যায়তি ন তু এষোঽস্য বাচকঃ শব্দঃ এষোঽস্য বাচ্যোর্থঃ এতচ্চ জ্ঞানমিতি বিষয়বিভাগং করোতি, বস্তুতোভিন্নানামপ্যেষাং অভেদে-

নাধ্যাসোবিকল্পঃ ততশ্চ সমাহিতস্য যোগিনঃ সমাধিপ্রজ্ঞায়াং সমারূঢ়ো যোগবাদ্যর্থঃ স যদি শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পেন গৌরিয়ং ভাসতে ইত্যেবং শব্দার্থ জ্ঞানানামভেদ; ভ্রমেণাবিদ্ধো বিষয়ীকৃতো ভবতি তদা সা সংকীর্ণা বিকল্প মিশ্রিতা সমাপত্তিঃ সবিতর্ক সংজ্ঞা ভবতি। ইতি ভাবঃ

অনুবাদঃ। শব্দ অর্থ জ্ঞানের বিকল্পদ্বারা সঙ্কীর্ণ সমাপত্তিকে সবিতর্ক সমাপত্তি বলে।

সমালোচন। যে সমাপত্তিতে শব্দ, তাহার অর্থ, সেই উভয় বিষয়ের জ্ঞান এবং এই তিনটিই মিশ্রিত আছে তাহার নাম সবিতর্ক সমাপত্তি। কাযেই সূত্রার্থ বুঝিতে হইলে শব্দ কি? অর্থ কি? জ্ঞান কি? এবং বিকল্পই বা কি? এই প্রশ্নের সহজে উদয় হয়।

শব্দ বলিতে যাহা কাণে শুনা যায় যেমন 'গৌ' একটি শব্দ অর্থবলিতে প্রতি পাদ্য শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র যাহার বোধ হয় যেমন 'গৌ' এই শব্দটি উচ্চারণ করিবামাত্র যে জীব বিশেষের বোধ হয় উহাই তাহার অর্থ, জ্ঞান বলিতে সত্ত্ব প্রদান অর্থাৎ প্রকাশময় বুদ্ধি বৃত্তি, শব্দ উচ্চারণ করিলে মনের যে পরিণাম হয়, যাহাতে জীব অর্থাৎ বিশেষ রূপ অর্থ চিত্তে প্রতি-ভাসিত হয়; বিকল্প বলিতে বস্তু নাই অথচ তাহার বাচক শব্দ কল্পনা, অর্থ শূন্যে বাচক কল্পনা, অথবা যে বস্তু যাহা নয়, তাহাতে তাহার কল্পনা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্থূল পদার্থ বিষয় সমাধির নাম বিতর্ক বা বিতর্কানুগত সমাধি, স্থূল পদার্থ সকল পঞ্চ তন্মাত্রার কার্য্য পঞ্চ মহাভূত ও তাহাদের কার্য্য সকল, কেহ কেহ আবার অহঙ্কারের কার্য্য ইন্দ্রিয়দিগকে ও স্থূল বলিয়া গণ্য করেন। যাহাহোক শব্দ অর্থ, এবং জ্ঞান ইহাদের ধর্ম্ম সকল ভিন্ন রূপ, শব্দের ধর্ম্ম মধুরতা, উচ্চতা ইত্যাদি অর্থের ধর্ম্ম জড়ত্ব, মূর্ত্তত্ব ইত্যাদি জ্ঞানের ধর্ম্ম প্রকাশ ইত্যাদি সুতরাং শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান ইহারা পরস্পর ভিন্ন। কোন যোগনিরত যোগী যখন কোন স্থূল বস্তুকে আলম্বন করিয়া তাহার বাচক শব্দ, বাচ্য অর্থ এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানের পরস্পর ভেদের প্রতিলক্ষ্য না করিয়া উহাদিগকে ধ্যেয় বস্তুর সহিত অভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়া চিত্তকে তদাকারে পরিণত করে তখন তাহার বিতর্ক সমাপত্তি হয়। মনে কর কোন যোগী একটা পর্ব্বত বা একটা গাছ বা একটা গোরুকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইল, তাহার চিত্ত হইতে অন্য বৃত্তি সকল অপসৃত হইয়া কেবল পর্ব্বতময় বৃক্ষময় বা গোরুময় বৃত্তির প্রাবল্য হইল,

চিত্ত পর্ব্বত, বৃক্ষ বা গোরু আকারে পরিণত হইল। তখন কেবল পর্ব্বত, বৃক্ষ বা গোরু এইরূপ একমাত্র জ্ঞান রহিল; পর্ব্বত বৃক্ষ বা গোরু এই শব্দ উচ্চারণ দ্বারা এইরূপ অর্থের জ্ঞান হইতেছে ইত্যাদি কিছুরই বোধ নাই, অর্থাৎ এই রূপ একটা শব্দ এইরূপে উচ্চারণ করিয়া এইরূপ একটা পদার্থের জ্ঞান করিতেছি মনে এরূপ একটা চিন্তাই নাই, চিত্তে কেবল পর্ব্বত, বৃক্ষ বা গোরু এই শব্দই বল বা সেই শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তুই বল বা তাহার জ্ঞানই বল প্রতিভাসিত হইতেছে অর্থাৎ শব্দ অর্থ ও জ্ঞান ইহারা এক হইয়া প্রতিভাসিত হইতেছে। যোগীর এইরূপ চিত্তের অবস্থাকে সবিতর্ক সমাপত্তি বলা যায়। কেহ কেহ বলেন বাস্তবিক কোন ধ্যেয় বস্তু উপস্থিত নাই অথচ কল্পনা দ্বারা তাহার উপস্থান করিয়া ধ্যান করত একাগ্রতা লাভ করিয়া তদাকারে চিত্তের যে পরিণাম, তাহার নাম সবিতর্ক সমাপত্তি। যদি বল চিত্তের একাগ্রতা এবং সবিতর্ক সমাপত্তি এই দুইএর মধ্যে প্রভেদ কি? ইহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে চিত্তের একাগ্রতা অবস্থায় এ বিষয়ের অবলম্বন থাকে বটে, কিন্তু সে বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার থাকে; সবিতর্ক সমাপত্তি অবস্থায় সেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার থাকেনা, তখন কেবল মাত্র সেই বিষয়েরই একটা স্থূল জ্ঞান থাকে মাত্র একাগ্র অবস্থায় (ধ্যেয় বস্তুর বাচক শব্দ, ঐ শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ ধ্যেয় বস্তু) এবং তাহার জ্ঞান ইহারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাসিত হয়। কিন্তু সবিতর্ক সমাপত্তি অবস্থায় উহারা সকলে অভিন্ন রূপে মিলিত (সঙ্কীর্ণ) হইয়া প্রতিভাসিত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এস্থলে ইহাও বক্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি যে, সমাপত্তি চার প্রকার। সবিতর্ক সমাপত্তি, নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি, সবিচার সমাপত্তি এবং নির্ব্বিচার সমাপত্তি। ইহাদের মধ্যে সবিতর্ক সমাপত্তি এবং নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি স্থূল বস্তু বিষয়ক এবং সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাপত্তি সূক্ষ্ম বস্তু বিষয়ক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্থূল বস্তু দুই প্রকার (১) পঞ্চ ভূত ও তাহার কার্য্য, (২) ইন্দ্রিয়গণ। সূক্ষ্ম ও দুই প্রকার (১) পঞ্চতন্মাত্র (২) অহংকার।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা॥ ৪৩।

পদচ্ছেদঃ। স্মৃতি-পরিশুদ্ধৌ, স্বরূপ-শূন্যা, ইব অর্থ-মাত্র-নির্ভাসা, নির্ব্বিতর্কা।

পদার্থঃ। স্মৃতিঃ (শব্দার্থ-সম্বন্ধঃ স্মরণম্), তস্যাঃ পরিশুদ্ধঃ (প্রবিলয়ঃ), তস্যাং সত্যাং স্বরূপং প্রজ্ঞারূপং জ্ঞানাত্মকং তৎশূন্যইব জ্ঞানরূপং পরিত্যজ্যেব, অর্থমাত্রনির্ভাসা গ্রাহ্যরূপপ্রতিপন্না ইব নির্ব্বিতর্কা নাম।

অন্বয়ঃ। স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ সত্যাং অর্থমাত্রনির্ভাসা স্বরূপ শূন্যা ইব যা সমাপত্তিঃ সা নির্ব্বিতর্কা কথ্যত ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। স্মৃত্যা খলু অস্মাৎ শব্দাদয়মর্থো জ্ঞাত ইতি স্ফুরতি, নষ্টায়াঞ্চ স্মৃতৌ অর্থ এব কেবলং ভাসতে চিত্তঞ্চ অর্থাকারং ভবতি, অহমিদং জানামীতি জ্ঞানমপি ন ভাসতে যত্র, তাদৃশী-সমাপত্তিঃ নির্ব্বিতর্কা ইতি কথ্যতে।

অনুবাদ। ধ্যান করিতে চিত্তের একাগ্রতা ক্রমশঃ আরও বর্দ্ধিত হইলে, এই শব্দ হইতে এতাদৃশ পদার্থের জ্ঞান হইয়াছে এইরূপ স্মৃতির ও বিলোপ হইলে, যখন সেই ধ্যেয় বস্তুটি মাত্র চিত্তে প্রতিভাসিত হয় অথবা চিত্ত ও ধ্যেয় বস্তু একাকারে পরিণত হয়, এবং জ্ঞান ও যেন আপনাররূপ পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ ধ্যাতার মনে "আমি ইহা জানিতেছি" এরূপ জ্ঞান ও না থাকে তাদৃশ ধ্যানাবস্থার নাম নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তিঃ।

সমালোচন। এখন বড় কঠিন সমস্যা, এতক্ষণ আন্দাজী বিদ্যা চলিতেছিল এখন অনুভবের বিষয় পড়িয়াছে, স্বয়ং অনুভব ব্যতীত এ সূত্রের মর্ম্ম বুঝা বা বুঝান বড় কঠিন, কিন্তু সে অনুভব আমাদের মত বিষয়াসক্ত ব্যক্তির পক্ষে একান্তই দুর্লভ, যাহাদের চিত্ত ক্ষণার্দ্ধের জন্য ও এক বিষয়ে সংলগ্ন হইতে অক্ষম, তাহাদের পক্ষে এরূপ ব্যাপক একাগ্রতার বিষয় সমালোচনা একপ্রকার উপকথা কওয়া মাত্র, কাযেই এস্থলে সূত্রের যথাশ্রুত অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত। কিন্তু উচিত কায সকল সময় করে উঠিতে পারা যায় কই? সেই জন্যই উপহাসের ডালি মাথায় করে এ সূত্রের উপর ও কিছু বাক্যব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বে যে সবিতর্ক-সমাপত্তির কথা বলিয়াছি, তাহাতে যে কোন স্থূল আলম্বিত বস্তুর বাচক শব্দ, সেই বস্তু এবং তাহার জ্ঞান এই তিনেরই চিত্তে প্রতিভাস হইবে, অথচ তাহাদের পরস্পরের ভেদ জ্ঞান থাকিবে না, তিন একাকারে জড়িত হইয়া চিত্তের সহিত একতা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ তখন শব্দের এই টুকুসীমা, অর্থের এই টুকুসীমা এবং জ্ঞানের এই টুকুসীমা এরূপ প্রভেদ থাকিবেনা। এই তিনই এককালীন মিলিত হইয়া প্রতীত

হইবে। নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি অবাস্থায় আবার চিত্তের স্থিরতা আরও বৃদ্ধি হইবে, সুতরাং বৃত্তির ও হ্রাস হইবে, তখন শব্দ এবং জ্ঞান এ দুইএরই প্রতি-ভাস হইবেনা, অর্থ অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুর প্রতিভাস হইবেমাত্র। এই সবিতর্ক এবং নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি আবার কখন সবিকল্প এবং নির্ব্বিকল্প নামে ও অভিহিত হয়। এই নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি-অবস্থায় আলম্বন ধ্যেয় বস্তুর অবয়ব বা সমগ্র ধ্যেয় বস্তু (অবয়বী)? এই রূপ আশঙ্কা করিয়া ভাষ্যকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন সমগ্রধ্যেয় বস্তুই ইহার আলম্বন। আমরা এস্থলে আর সেই কঠোর বিচারের কঠোর ভাষায় অনুবাদ করিয়া পাঠকগণের শিরঃপীড়া উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিলাম না।

এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা॥ ৪৫॥

পদচ্ছেদঃ। এতয়া এব সবিচারা, নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্ম-বিষয়া ব্যাখ্যাতা।

সমন্বয়পদার্থঃ। এতয়া সবিতর্কনির্ব্বিতর্করূপয়া স্থূলবিষয়ক সমাপত্ত্যা সূক্ষ্মবিষয়া (সূক্ষ্মতন্মাত্রাদিঃ বিষয়ো যস্যাঃ সা) সবিচার; নির্ব্বিচাররূপা সমাপত্তিদ্বয়ী ব্যাখ্যাতা বিশদীকৃতা অর্থোপরাগানুপরাগসামান্যেনেত্যর্থঃ।

ভাবার্থঃ। দেশকাল ধর্ম্মাদ্যবচ্ছিন্নঃ সূক্ষ্মোঽর্থঃ প্রতিভাতি যস্যাং সা সবিচারা, দেশকালধর্ম্মাদিরহিতো ধর্ম্মিমাত্রতয়া সূক্ষ্মো র্থঃ প্রতিভাতি যস্যাং সা নির্ব্বিচারা। ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। স্থূল বিষয়ক সবিতর্ক এবং নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তির কথা যাহা বলিলাম, তাহাতে সবিচার এবং নির্ব্বিচার সমাপত্তির ও ব্যাখ্যাকরা হইল; অর্থাৎ ইহাদের পরিভাষার জন্য আর স্বতন্ত্র সূত্রের অবতারণা করিবার প্রয়ো-জন নাই।

---o---

ব্রিটেনিয়া

সমীপে

ইণ্ডিয়া।

১

মহাকায় নীল-নিভ নীরধি উপরি,
নিরুপম বেদী এক কতই কৌশলে,
নির্ম্মাণ করেছে, বিধি অতি যত্ন করি,
ঝঞ্জা-বাতে নাহি, কাঁপে নাহি কভু টলে,
উত্তাল তরঙ্গে তার কণা নাহি গলে,
নিটোল অটোল সদা ভীম বল ধরি॥

২

তদুপরি কোন দেবী বিরাট গৌরবে,
উদধি ঈশ্বরী সমা বসি রত্নাসনে,
বিরাজেন বীর দর্পে চমকিয়া সবে।
বসুধা বারিধি দোঁহে মিলিয়া যতনে,
সাজায়েছে চারু তনু বিবিধ ভূষণে,
জমকে শোভিছে বামা বিপুল বিভবে॥

৩

ভাসিছে রজত আভা বিমল বরণে,
অদূর সুদূর দেশ করি আলোকিত,
খেলিছে হর্ষের হাস্য বিকচ বদনে।
বিশাল মুকুট কিবা মস্তকে শোভিত,
সমুকুট শির কত চরণে লুণ্ঠিত,
জ্বলিছে প্রোজ্জ্বল প্রভা বিলোল লোচনে॥

৪

ভীষণ সমর অস্ত্র এক হাতে ধরা,
জনগণে করে যাহা সন্ত্রাসিত ভয়ে,
ভবানীর করে যথা অসি ভয়ঙ্করা।
এ দিকে অপর হস্তে তুলা দণ্ড লয়ে,
মাপিছেন রত্নরাশি আনন্দিত হয়ে।
ক্ষত্রভাবে বৈশ্যভাব মূর্ত্তি চমৎকারা॥

৫

মহিমা মণ্ডলে দেবী বেষ্টিত হইয়া,
আছেন বসিয়া নিজ তেজ গরিমায়
পৃথ্বী-ব্যাপি প্রতাপের ছটা ছড়াইয়া।
প্রকাশে কতই দর্প ভাব ভঙ্গিমায়,
পারেন প্রলয় যেন করিতে হেলায়,
ভূবন বিখ্যাতা দেবী নাম ব্রিটেনিয়া॥

৬

প্রভূত প্রভুতা ইনি ধরায় বিস্তারি,
রাজ রাজেশ্বরীরূপে করেন বিহার;
কোটি কোটি নরবৃন্দ করি আজ্ঞাকারী,
পেতেছেন মহারাজ্য অতি চমৎকার,
রাবণ প্রতাপ সম প্রতাপ ইঁহার,
এঁর রাজ্যে অস্তমিত না হয় ধ্বান্তারি॥

৭

চারি দিকে দেখ এঁর কত রণ তরি,
সিন্ধুজা রাক্ষসী সম ভাসিছে সাগরে,
বজ্রনাদী বজ্র অস্ত্র বক্ষে কক্ষে ধরি।
এঁরি বলে ব্রিটেনিয়া অর্ণব উপরে
শত্রুকুল তুচ্ছ করি আনন্দে বিহরে,
জিমূত মণ্ডলে যথা বৃত্রাসুর অরি॥

৮

আসুক আর্মেডা গর্বে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে,
যুড়িয়া যোজন অর্দ্ধ নীরধির নীর,
'অজেয়' উপাধি ধরি ঘোর অহংকারে,
দেখাক্ যতই ভয় বোনাপার্ট বীর
সমর অনলে করি যুরোপ অধীর,
ব্রিটেনিয়া নাহি টলে,নাহি ডরে কারে॥

৯

আর দেখ,দিকে দিকে ছেয়ে বসুমতী,
বিপুল বাণিজ্য পোত, কে করে গণন,
সাগর সরিৎ বাহি করে গতাগতি,
আনিয়া ধনের রাশি করিছে অর্পণ,
দেখিয়া বিস্মিত অতি ক্ষিতিনাথগণ,
লাঞ্ছিত লক্ষ্মীর গর্ব, ক্ষুব্ধ যক্ষপতি।

১০

বিজয়ের বৈজয়ন্তী সুনীল অম্বরে,
উড়িছে অনিল যোগে তরঙ্গ আকারে,
বিস্তারি বিশাল ছায়া স্থল জলোপরে;
প্রবল পবনে নারে ছিঁড়িতে উহারে,
বজ্রপাত নাহি পারে দণ্ড ভাঙ্গিবারে,
উড়িছে দোলায়ে অঙ্গ সদা গর্বভরে॥

১১

ধনে রণে দৃষ্টি রাখি সুধাংশু বদনী
আছেন নিবিষ্ট সদা বিদ্যা বিনোদনে,
পূজিছে পণ্ডিত কত বলিয়া জননী;
সে মধুর মূর্ত্তি তাঁর হেরিলে নয়নে
উথলে ভক্তির স্রোত সবাকার মনে,
বিরাজেন ভবে যেন সারদা আপনি॥

১২

মানব বৎসলা দেবী অশেষ যতনে,
সাধেন মানব হিত, মানব উন্নতি,
স্বর্গীয় উৎসাহে হয়ে উত্তেজিত মনে;
বিদূরিয়া দীন হীন দাসের দুর্গতি,
করেছেন ঋণপাশে বদ্ধ বসুমতী,
বিরাজিবে যত দিন চন্দ্রার্ক গগণে॥

১৩

দেবীর সন্তান সবে মাতৃভক্তি বলে,
ধরাধামে কাহাকেও না করি সন্ত্রাস,
খেলিছে ভবের খেলা মহাকোলাহলে;
স্বদেশে করুক বাস, বিদেশে প্রবাস,
রেখেছে সদাই অঙ্গে হৃদয় উচ্ছ্বাস,
অমেয় পার্থিব সুখ ভুঞ্জে কুতূহলে॥

১৪

স্থানে স্থানে মহারণ্য উচ্ছেদন করি,
ইন্দ্রপ্রস্থ করি তায় করিছে নিবাস,
স্থানে স্থানে উচ্চ উচ্চ শৈল শৃঙ্গোপরি,
নির্ম্মাণ করিয়া কত সুরম্য কৈলাস,
গৌরীসহ মহাসুখে করিছে বিলাস,
নৃত্যগীতে উথলিয়া আনন্দ লহরি॥

১৫

স্থানে স্থানে কত পুত্র পরের আলয়ে,
গঠিয়া আপন গৃহ রয়েছে পুলকে,
কতস্থানে দেখ তারা পর ধন লয়ে,
করিছে আমোদ নৃত্য কতই জমকে,
চলেছে জীবন পথে কতই ঠমকে,
কতই মনের সাধ সাধিছে নির্ভয়ে॥

১৬

কত পুত্র দেখ তাঁর বেদীর উপরে,
অবিরত কাম্যযাগ করে তন্ত্র লয়ে,
মহাধুমে ধূম তার উঠিছে অম্বরে,
তাদের পূজায় দেবী সুপ্রসন্ন হয়ে,
অভিমত ফল দেন প্রফুল্ল হৃদয়ে,
যে বর যাচিছে তারা, তোষেণ সে বরে॥

১৭

ভবের বাজারে আজি দেখ, ব্রিটেনিয়া,
লভেছেন বলে কলে,সৌভাগ্যের বল,
চারিদিকে জয়ডঙ্কা উঠিছে বাজিয়া;
তাই দেখ, আজি তাঁর সন্তান সকল,
নাচিছে কুঁদিছে দর্পে ব্যাপি ক্ষিতিতল,
'রুল ব্রিটেনিয়া' গীত আনন্দে গাইয়া॥

১৮

দেখ আজি শত শত নরনারী আসি,
দিগ দিগন্তর হতে, করিতে অর্চ্চনা,
দেবীর চরণ পদ্মে দিয়ে ধন রাশি,
জানাইছে কতজন কতই কামনা,
কতজন নিদারুণ মনের বেদনা
নিবেদিছে করপুটে আঁখি নীরে ভাসি॥

১৯

তার মাঝে দেখ এক সুশীলা ললনা,
বিপুল-বয়সা তবু রূপ রমণীয়া
সরল স্বভাবা সতী সুন্দর বরণা—
শ্বেতাঙ্গীর পদে রত্ন অঞ্জলি পূরিয়া
দিয়ে, পূজে অবিরত ভক্তিতে মজিয়া,
কখন সহর্ষ, কভু বিমর্ষ বদনা॥

২০

অপূর্ব্ব শোভিছে অঙ্গ হরিত বসনে,
মণি মুক্তা হীরা তায় ঝল মল করে।
বিশাল কুন্তল জাল লুটায় চরণে;
অক্ষয় রতন কৌটা শোভে এক করে,
রহিয়াছে আর হাতে ভিক্ষাপাত্র ধরে,
মেগে খায়, নিজ ধন দিয়ে অন্য জনে॥

২১

কখন ভকতি ভরে দাঁড়াইয়া পাশে,
পুটাঞ্জলি হয়ে, দিয়ে চেলাঞ্চল গলে,
স্তব স্তুতি করিতেছে সকরুণ ভাষে;
কখন যুগল জানু পাতি ধরাতলে,
নতশিরে প্রণমিছে চরণ কমলে,
বেদীরূঢ় বরাঙ্গীর বর অভিলাষে॥

২২

কভু কোন মনোগত কথা বলিবারে
চাহে,কিন্তু কি কারণে,সেই তাহা জানে,
না পারে বলিতে, খেদ অন্তরে নিবারে।
করেতে কপোল রাখি বিষণ্ণ বয়ানে,
এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে দেবী মুখ পানে;
ছল ছল দুনয়ন সলিলের ভারে॥

২৩

কখন কখন কত অমূল্য ভূষণ,
শ্বেতাঙ্গীর করে বামা দেয় উপহার,
আপনার অঙ্গ হতে করিয়া মোচন;
অপরূপ রত্ন রাজি অতি চমৎকার,
অন্বেষণ কর যদি কুবের ভাণ্ডার,
তবু না দেখিতে পাবে তেমন রতন॥

২৪

ব্রিটেনিয়া দেখে তাঁরে কৌতুকে সম্ভাষে;
"কে তুমি সুন্দরী সতী কাহার অঙ্গনা,
কি লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছ মম পাশে?
কেন বা করিছ এত আমার অর্চনা,
সাধিতে কামনা কিম্বা নাশিতে যাতনা,
মম পুরে আসা তব, বল, কোন আশে?

২৫

মরি! কি মূরতি তব মাধুরির ধাম,
হয়েছে বয়স তবু একি অপরূপ,
অদ্যাপি সবার তুমি অক্ষি অভিরাম!
না জানি যৌবন কালে ছিল কত রূপ,
দেবগণ দেখিবারে হইত লোলুপ,
ভুবন মোহিনী তুমি ভুবন ললাম॥

২৬

রূপ হতে গুণে তুমি আরো কমনীয়া,
ভাসিছে মহত্ব ভাব, সারল্য, শীলতা;
রসনা ভাষিছে ভাষা সুধারে জিনিয়া;
অর্থ দানে প্রকাশিছে যেন কল্পলতা,
ভক্তিমতী বিনয়িনী সদা ধর্ম্মে রতা;
বোধ হয় তুমি বুঝি হইবে ইণ্ডিয়া॥"

২৭

সস্নেহ মধুর বাণী শুনি বিদেশিনী,
গদ্ গদ স্বরে বলে করিয়া বিনয় ;
"সত্য বটে আমি দেবি, সেই অভাগিনী,
বিদেশে ইণ্ডিয়া নামে যার পরিচয়,
স্বদেশে ভারত-ভূমি যারে সবে কয়,
অধুনা হয়েছে যেই তোমার অধিনী ॥

২৮

বসি তব পরাক্রম তরুর তলায়,
তব নাম জপি, আর তব গুণ গাই,
অবিরত থাকি রত তব অর্চনায়।
যখন যা আজ্ঞা কর, করি আমি তাই,
কিঙ্করী কর্ত্তব্য কার্য্যে কভু হেলা নাই,
সঁপিয়াছি তনু মন তোমার সেবায় ॥

২৯

তোমারে তুষিতে যদি নিজে কষ্ট পাই,
যদি কভু হয় ত্যাগ করিতে স্বীকার,
তাহাতেও কভু মম বাধা দ্বিধা নাই ;
সদাই প্রস্তুত আছি, রক্ত আপনার
প্রদানি, করিতে রক্ষা গৌরব তোমার,
তাড়াইয়া দিতে তব আলাই বালাই ॥

৩০

কিন্তু গো এখন আর নাহি মম বল,
নাহি সে প্রতাপ-সূর্য্য যাহার কিরণে,
ছিলাম তপন তলে অতীব উজ্জ্বল,
মহাতেজে তেজস্বিনী সবার নয়নে।
সে রবি হয়েছে অস্ত হলো বহু দিন,
তদবধি আছি পড়ে হয়ে দীন ক্ষীণ ॥

৩১

তদবধি নিদারুণ কতই বিপ্লব,
গেছে বয়ে মম'পরি যেন ঝঞ্ঝাবাত,
ঘটেছে নিষ্ঠুর ভাবে কত উপদ্রব,
সয়েছি পাতিয়া বক্ষ কতই উৎপাত ;
পশেছে হৃদয়ে কত বিষ মাখা শর,
কেঁদেছি কতই মা গো হইয়া কাতর।

৩২

কালে কালে আসি কত অরাতি দুর্জ্জন
লয়েছে রতন কত করিয়া হরণ,
পৈশাচিক পিপাসায় কত শত্রুগণ,
হৃদের শোণিত মম করেছে শোষণ।
এখন অদৃষ্ট চক্রে আবর্ত্তিত হয়ে,
আসিয়া পড়েছি মা গো তোমার আশ্রয়ে॥

৩৩

সৌভাগ্য বলিয়া ইহা ভাবি ব্রিটেনিকে,
ভাবি বিধি অনুকূল পুন মমপ্রতি,
শুভ গ্রহগণ পুন এলো মম দিকে.
অবশ্য ঘুচিবে মম সকল দুর্গতি।
অবশ্য হইবে মম সুদিন উদয়,
তুমি দয়াময়ি যদি হও গো সদয় ॥

৩৪

মহীয়সী শক্তি তব, মহীয়সী মতি,
সাধিতে পরের হিত সদা অভিলাষ,
আমারে অধীন তব করি, বিশ্বপতি
করেছেন মম প্রতি করুণা প্রকাশ।
অস্তমিত সুখ সূর্য্য, তোমার শাসনে
উঠিবে আবার মম অদৃষ্ট গগণে ॥

৩৫

সরল মনেতে আমি ডুবিছি আশায়,
তোমার মহত্ত্ব'পরি করিয়া বিশ্বাস,
আবার হরষে হাসি হাসিব ধরায়,
আবার নাচিবে হৃদে আনন্দ উচ্ছ্বাস।
সতেজ শোণিত পুন তোমার কৃপায়,
প্রবাহিত হবে মম শিরায় শিরায় ॥

৩৬

হইয়াছে পুত্রদের যেরূপ দুর্দ্দশা,
জড় ভাবে রহিয়াছে যেরূপ নিশ্চল,
উদিত না হয় মনে এমন ভরসা,
আবার আমার তারা সাধিবে মঙ্গল;
গভীর নিদ্রায় আছে সবে অচেতন,
অসাড় শরীরে ধরি অসার জীবন।

৩৭

ভুলে গেছে নিজ মান নীচাশয় হয়ে,
মনের উৎসাহানল করেছে নির্ব্বাণ,
নিস্তেজ ভাবেতে আছে নিষ্প্রভ হৃদয়ে,
হারায়ে জাতীয় জ্যোতি সংসারে সম্মান;
আঁধারে জীবন কাল কাটে কোনরূপে,
মণ্ডুক মণ্ডলি যথা তমোময় কূপে॥

৩৮

নাহি আর ব্রহ্মতেজ ব্রাহ্মণের কুলে,
ক্ষত্রগণ হারায়েছে সাহস সমরে,
উন্নতি বাণিজ্য-বৃত্তি বৈশ্য গেছে ভুলে,
কত বা লয়েছে তব পুত্রগণ হরে।
নিরাশ নির্জীব সবে, কাজেতে বিমুখ,
কেবল পরের পদ লেহিতে উৎসুক।

৩৯

পুত্রগণে হেন রূপ হীনদশা হতে,
উদ্ধার করিতে দেবি তব কৃপাবল,
দেখি আমি এক মাত্র উপায় জগতে;
তব কৃপা ভিন্ন আর সকলি বিফল।
তোমার যতনে আর তোমার শিক্ষায়,
জাগিয়া উঠিতে পারে আবার ধরায়।

৪০

দুরিতহারিণি দেবি দয়াশীলা হয়ে,
কৃপায় কটাক্ষপাত কর মম পরে
অতুল আনন্দে মম পুত্রগণ লয়ে,
আরোহিব পুনরায় সৌভাগ্য শিখরে।
সুখের পয়োধি পুন হয়ে উচ্ছ্বসিত,
শোকদগ্ধ হৃদে মম হবে প্রবাহিত॥

৪১

দুর্দ্দশা দেখিয়া হেয় করো না আমায়
এক কাল অবনীর ছিলাম ভূষণ,
অতুল্য ছিলাম বলে, বিখ্যাত বিদ্যায়,
সভ্যতা চন্দ্রমা ছিল ভুবন রঞ্জন।
উন্নতি হয়েছে ভবে যতই প্রকার,
সকলেরি জেন দেবি আমি মূলাধার॥

৪২

ভগবতী সরস্বতী জ্ঞানের ঈশ্বরী,
এখন দেখ গো যিনি য়ুরোপ সমাজ
অপরূপ বিদ্যালোকে আলোকিত করি,
মহোল্লাসে সদা তথা করেন বিরাজ,
আমার উদরে জন্ম লন ক্ষিতিতলে,
ভারতী বলিয়া তাই সম্বোধে সকলে।

৪৩

বিভাসি শৈশবে ইনি নবীন মাধুরী,
থাকিতেন মম অঙ্ক করি সুশোভন,
রূপের ছটায় দীপ্ত করি মম পুরী,
তিমিরে অপর দেশ আচ্ছন্ন যখন;—
বাড়িলেন দিনে দিনে আমার পালনে,
সিত পক্ষে বাড়ে যথা সিতাংশু গগনে॥

৪৪

দেবলোক হতে হন অবতীর্ণা ভবে.
করিবারে দেবতুল্য মানবে মহীতে,
বুঝিয়া মহিমা তাঁর আর্য্য ঋষি সবে,
আরম্ভিল ভক্তি ভাবে যতনে পূজিতে।
সারদার পদে সবে অর্পি অনুরাগ,
সরস্বতী তীরে করে সারস্বত যাগ॥

৪৫

আর্য্যদের অর্চ্চনায় ভারতে ভারতী,
অপার করুণা গুণে প্রসন্না হইয়া,
করিলেন সকলেরে আনন্দিত অতি,
ঋষিদের রসনায় নাচিয়া গাইয়া,
যাচিল যেজন যাহা দেবীর গোচর,
তুষিলেন তারে তিনি দিয়া সেই বর।

৪৬

সেই বরে পূর্ব্বতন ঋষিবরগণ,
সুধা মাখা সামগীত গাইলেন ভবে,
ঋক্ মন্ত্রে করিলেন প্রকৃতি পূজন,
দেবতা কাহিনী কত কহিলেন সবে।
করিলেন ব্রহ্মতত্ত্ব যত্নে নিরূপণ,
সুবিমল উচ্চতম ধর্ম্মের জীবন॥

৪৭

মহর্ষি বাল্মীকি ব্যাস আমারি সন্তান,
অদ্যাপি গর্ব্বিত আমি তাঁহাদের যশে,
গেছে গেছে কিবা তারা পৌরাণিক গান
মাতাইয়া মহীতল কাব্য সুধারসে।
আজো পিয়ে সেই রস যত্নে নরকুল।
যত পিয়ে তত তারা তৃষায় আকুল॥

৪৮

ঋষি ছাড়া আরো কবি উদরে আমার,
জন্মেছিল কালে কালে কত কব নাম,
তার মাঝে কালিদাস অগ্রণী সবার,
বরদার বর পুত্র, কল্পনার ধাম।
বিদ্যার বিনোদ বনে সুকণ্ঠ কোকিল।
করিল মধুর গীতে মোহিত অখিল।

৪৯

ভুবন রঞ্জন গীত অতি চমৎকার,
শত ধারে সুধাধারা ক্ষরে তাহা হতে,
কিবা ভাব কিবা ভাষা কিবা রস তার,
উপমায় অনুপম সাহিত্য জগতে।
কত তাহে কল্পনার তরঙ্গ উচ্ছ্বাস,
প্রকৃতির কত বিধ প্রতিমা প্রকাশ॥

৫০

ভারবি শ্রীহর্ষ মাঘ ভবভূতি আর,
এরাও বিখ্যাত অতি সারদা কৃপায়,
গেছে সবে আলো করি সাহিত্য সংসার,
কবিতার কমনীয় কনক আভায়।
ভাসায়ে দিয়েছে কাব্য প্রেমের তরঙ্গে,
কবিবর জয়দেব জন্ম লয়ে বঙ্গে॥

৫১

এদিকে রাজর্ষি মনু আদি তপোধন,
সুদূরদর্শিতা আর বিদ্যাশক্তি বলে,
করি যত্নে বহুবিধ বিধি প্রণয়ন,
গেছেন সমাজ বাঁধি অপূর্ব্ব কৌশলে।
সেই সব বিধি যেন বিধির প্রণীত,
তারি বলে আর্য্যগণ অদ্যাপি জীবিত॥

৫২

আর দেখ, কণাদাদি দার্শনিক যত,
জড় রাজ্যে মনোরাজ্যে গবেষণা করি,
নানাবিধ গূঢ়তত্ত্ব, নানাবিধ মত,
রেখেছেন ভারতীর রত্নাগার ভরি;
সেই সব তত্ত্ব আর সেই সব মত,
য়ুরোপ মানিছে আজি করি শিরোনত॥

৫৩

এইরূপে সরস্বতী আমার উদরে
জনমিয়া, অবতীর্ণা হন বসুধায়,
বাড়িলেন দিন দিন আমায় আদরে,
আলো করি মম পুরী রূপের ছটায়;
মম পুত্রগণ সবে পূজিয়া তাঁহায়,
নরকুলে নরদেব হইল ধরায়॥

৫৪

তাঁহার কৃপায় মম সুকৃতি গগনে
সুশোভিল জ্ঞান-শশী অতি চমৎকার,
আলোকিত হলো ধাম কৌমুদী কিরণে,
পলাইয়া গেল দূরে অজ্ঞান আঁধার ;
দেশে দেশে সেই আভা হয়ে বিস্তারিত,
সাধিল অশেষ বিধ মানবের হিত ॥

৫৫

এরূপে ছিলাম দেবি অতি সমুজ্জ্বল,
প্রজ্ঞানে বিজ্ঞানে আর ধর্ম্ম বিভূষণে,
সভ্যতার সাজ তায় কিবা ঝলমল,
অতি মনোহর মূর্ত্তি সুরম্য দর্শনে।
তখন কে দেখে দেবি গৌরব আমার,
গরীয়সী গর্ব্ব ভূমি ছিলাম ধরার ॥

এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বে নবজীবনে প্রকাশিত হয় ; পরের অংশ আমার পিতৃদেবের শেষ রচিত পদ্য—ইহা অসম্পূর্ণ, তথাপি আমি প্রকাশিত করিলাম ; ভরসা করি পাঠকগণ ইহাতে কেহ কিছু মনে করিবেন না।

নবজীবন সম্পাদক।

৫৬

এ দিকে সন্তানগণ ছিল গো যেমন,
বিদ্যায় বিখ্যাত অতি জ্ঞানে গরীয়ান্,
সেইরূপ অন্য দিকে অন্য পুত্রগণ,
ছিল রণ-বিশারদ, বলে বলীয়ান,
বীরত্বে সাহসে ছিল কুমার সমান,
শত্রু বিনাশিতে সবে সাক্ষাৎ শমন ॥

৫৭

হিমাদ্রি হইতে যথা সাগর লহরি
নাচিতেছে নিরন্তর ঘেরি স্বর্ণ লঙ্কা,
বিহারিত পুত্রগণ অতিদর্প করি,
অরাতি-দর্শনে কভু করিত না শঙ্কা,
ধাইত উল্লাসে শুনে সমরের ডঙ্কা,
করি-রব শুনে ধায় যেমন কেশরী ॥

৫৮

বলে মহাবল সবে রূপে চমৎকার,
দরশনে দেবতুল্য অতি মনোহর,
সুর কিম্বা সোম লোক হতে অবতার ;
ধরাতলে ছিল হেন কোন বীরবর,
শত্রুভাবে মম অঙ্গে দেয় নিজকর,
মম অপমান করে, সাধ্য ছিল কার ॥

৫৯

বিমুখ হইতে রণে করে নাই শিক্ষা,
'সম্মুখ সংগ্রামে মার, কিম্বা নিজে মর,'
এই দুই সার বাক্যে পেয়েছিল দীক্ষা ;
হউক যেমন অরি—দৈত্য কিম্বা নর,
কিম্বা নরমাংস লাষী ক্রুদ্ধ নিশাচর,
করিত না কারো কাছে জীবনের ভিক্ষা ॥

৬০

হউক শত্রুর শেল যতই দুর্জ্জয়,
রণ ত্যজি নাহি তারা করিত পলান,
থাকিত অটলভাবে পাতিয়া হৃদয় ;
বীরত্ব গৌরবে নাহি দিত বলিদান,
রাখিতে অনিত্য দেহ, অনর্থক প্রাণ,
ইহলোকে লভি নিন্দা, চরমে নিরয় ॥

৬১

বীরেন্দ্র তনয়গণ উৎসাহিত মনে
দিগ্বিজয় সাধিবারে ধাইত যখন,

মহাদম্ভে বীরদর্পে লয়ে যোধগণে,
কার সাধ্য তাহাদিগে রোধে গো তখন,
ভীম ভাবে প্রধাইত যেন প্রভঞ্জন ;
আর কি তাদৃশ দৃশ্য হেরিব নয়নে ॥

৬২

সেদিন অদ্যাপি মনে পড়ে গো জননি !
যেদিন অযোধ্যাপতি রঘু মহারাজ,
সূর্য্যবংশ অবতংশ নৃপ চূড়ামণি,
ধাইলেন সৈন্য সহ ধরি রণসাজ,
লভিতে বিজয় যশ ভূপতি সমাজ,
বাহুবলে একছত্রা করিয়া অবনী ॥

৬৩

চলিল দ্বিরদরাজি অগণন বাজী,
পৃষ্ঠেলয়ে বীরবৃন্দ অতি বলীয়ান,
চলিল বিপুল রথী স্যন্দনে বিরাজি,
সৌরতেজে তেজীয়ান করে ধনুর্ব্বাণ,
শৌর্য্যে আর দরশনে কার্ত্তিক সমান,
প্রভূত পদাতী চলে অস্ত্রে শস্ত্রে সাজি ॥

৬৪

রথের ঘর্ঘর ঘোষ, ঘণ্টার ঠঙ্কনী,
ধন্বীদের ধনুকের টঙ্কার ভীষণ,
বীরের হুঙ্কার নাদ জিনিয়া অশনি,
হয়ের বিকট হ্রেষা, গজের গর্জন,
দুন্দুভি দামামা আদি বাদ্যের বাদন,
তুলিল গগণ ভেদী ভয়াবহ ধ্বনি ॥

৬৫

এরূপে রাঘবী সেনা মহা কোলাহলে,
ধাইছে বিরাট ঠাটে চমকি সংসার,
ভীমনাদী সিন্ধু যেন উথলিয়া চলে ॥
উঠিছে ধূলীর রাশি জলদ আকার,
তার মাঝে রঘু শোভে অতি চমৎকার,
শোভে যেন আখণ্ডল জীমূত মণ্ডলে ॥

৬৬

অমিত সাহসী রাজা বীরেন্দ্র কেশরী,
চলেছেন বীরদর্পে নানা দেশ দিয়া,
অমিত্র রাজন্য বর্গে পরাভব করি ;
বিনা যুদ্ধে বহু ভূপ বিনত হইয়া
বাঁচাইল প্রাণ, পদে শরণ লইয়া ;
রণক্ষেত্রে যমঘরে গেল কত অরি ॥

৬৭

শেষে বীর উপনীত সিন্ধু নদ পারে,
যেখানে যবন গণ হইয়া সত্বর,
রণে হানা দিল আসি ভীষণ আকারে ;
বাধিল তুমুল যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর,
প্রবল উভয় দল সম ধনুর্দ্ধর,
সহজেতে জিনিবারে কেহ কারে নারে ॥

৬৮

আকাশ ছাইয়া ছুটে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর,
সন সন চলে চক্র, শেল পড়ে ঘন,
অসী ঘাতে অনেকের দ্বিখণ্ড শরীর,
অকালে বহুল বীর ত্যজিয়া জীবন,
চলে গেল তমোময় তাপনী ভবন ;
নদীর আকারে বহে নরের রুধির ॥

৬৯

শবের উপরে শব পড়ে স্তরে স্তরে,
দেহ হতে কাটা মুণ্ড পড়ে ঘন ঘন,
অচেতন কত যোধ ধরা পৃষ্ঠোপরে ;
কেবা দেখে,কেবা পোঁতে,কে করে দাহন,
শৃগাল কুক্কুরে আসি করিছে ভক্ষণ ;
অথবা গৃধিনী গণ ছেঁড়া ছিঁড়ি করে ॥

৭০

নির্ভীক হৃদয়ে হেথা রঘুবীরবর
ভ্রমিছেন রণ মাঝে সিংহের সমান,
ভ্রমিছেন হানিছেন শেল শূল শার,

শত শত শত্রু তায় হয় হত প্রাণ,
অব্যর্থ আয়ুধ তাঁর, অমোঘ সন্ধান;
সংগ্রামে বিপক্ষ দলে মরিল বিস্তর॥

৭১

যবন সেনার ক্ষয় হল অতিশয়,
অল্প মাত্র রহে প্রাণে, ভাগ্যনিবন্ধন,
তাহারাও অবশেষে পেয়ে হৃদে ভয়
রণে পৃষ্ঠ দেখাইয়া করে পলায়ন,
শত্রু হস্ত হতে ভবে রাখিতে জীবন॥
তুলিল রাঘব সৈন্য শব্দ জয় জয়,

৭২

এইরূপে ভুজ বলে জিনিয়া যবনে
ফিরিলেন সেনা সহ রঘু নর বর,
অযোধ্যার অভিমুখে আনন্দিত মনে॥
সঙ্গে সঙ্গে বন্দী রাজা চলেছে বিস্তর,
বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তীর উপরে,
বিজয়ের বৈজয়ন্তী উড়িছে গগনে॥

৭৩

সজ্জিত-দ্বিরদে রাজা সজ্জিত হইয়া,
রাজধানী যেই দিন করেন প্রবেশ,
দ্বিধারে দণ্ডায়মান লোক মধ্যদিয়া,
সে দিনের মহোৎসব, নগরীর বেশ,
হেরিলে না থাকে শোক দুঃখ লেশ,
অন্তরে আনন্দ সিন্ধু উঠে উথলিয়া॥

৭৪

তোরণে তোরণে বাজে বিজয় বাজনা,
পুষ্পমাল্যে রম্য হর্ম্ম্য সুশোভিত অতি,
উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করে কুলাঙ্গনা;
নাচিছে গাইছে কত মোহিনী যুবতী,
লাজা বৃষ্টি পুষ্প বৃষ্টি করে কত সতী,
আগে আগে বন্দীগণ করিছে বন্দনা॥

৭৫

রাজকর্ম্মচারী কত বসি গজোপরে,
ছড়াইছে রত্নরাশি পূরিয়া অঞ্জলী
কুড়াইছে দীন দুঃখী প্রফুল্ল অন্তরে;
বিপুল প্রজার কুল হয়ে কুতূহলী,
বিকাশে মনের হর্ষ জয় জয় বলি;
বেদমন্ত্রে ঋষিগণ আশীর্ব্বাদ করে॥”

ন্যাশনাল কংগ্রেস কি ?

'ন্যাশনাল কংগ্রেস্ কি ?' জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত একশ্রেণীর 'শিক্ষিত যুবক' হো হো রবে হাস্য করিয়া বলিবেন,—"ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্ এর বাঙ্গলা অনুবাদ করিলেইত বুঝা যায় ; 'জাতীয় মহাসমিতির' নামই ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্।" প্রজানীতিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বলেন,—("ভারতের) প্রবলা রাজনীতির পাশাপাশি, নিরেট ঘাতসহিষ্ণু শক্ত সমর্থ রক্ত অস্থিময় প্রজানীতি সঙ্গঠনরূপ মহদনুষ্ঠানের নামই—ন্যাশনাল্ কংগ্রেস।" এইরূপ প্রশ্নোত্তর—মীমাংসা অদ্যপ্রায় দুই বৎসর কাল হইয়া আসিতেছে। প্রশ্নকারীগণের প্রশ্নের ঠিক উত্তর এপর্য্যন্ত হইয়াছে কিনা, জানি না। উত্তরকারীগণ কিন্তু মনে মনে ভাবিয়াছেন—"ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্ কি ?' এ প্রশ্নের আমরা ঠিক উত্তর দিয়াছি। তবে যে অনেকেই তাহা বুঝিতে পারে নাই, সে কেবল প্রশ্নকারীগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কের অভাব ; এবং তাঁহাদের বালকোচিত 'কেন' র উত্তর অসম্ভব বলিয়া"। আমাদের কিন্তু বোধ হয়, "ন্যাশনাল্ কংগ্রেস কি ?" 'বঙ্গবাসী' ঐপ্রশ্ন যে ভাবেই উপস্থিত করুন না কেন, কংগ্রেসের অনুষ্ঠাতা, প্রতিষ্ঠাতা, বন্ধুগণ সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলে বা দিতে পারিলে, আপামর সাধারণের মনে 'কংগ্রেস্' বিষয়ে কোন খট্কা থাকিত না। হাজার গালি থাউক তথাপি সকলেই জিজ্ঞাসা করে, "ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্ বলিয়া যে একটা আড়ম্বর আন্দোলন শুনিতে পাই, সেটা কি ?" আমরা আমাদের জ্ঞান বিশ্বাস মত উহার উত্তর দিয়াত কাহাকে নিরুত্তর করিতে পারিই নাই ; কংগ্রেসের বন্ধুগণের (চিহ্নিত বন্ধুগণের) লিখিত প্রবন্ধাবলী সাধারণসমক্ষে উচ্চৈস্বরে পাঠ করিয়াও বুঝাইতে পারি নাই,—'কংগ্রেস্ কি ?' সকলেই একবাক্যে জিজ্ঞাসা করে,—"আমরা সাহিত্যের উন্নতির পরিচায়ক শব্দালঙ্কারে-ভাষিত—কংগ্রেসের-অর্থ শুনিয়া কি করিব ? আমাদের অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত অনুর্ব্বর মস্তিষ্কে যে ভাব প্রবেশ করে, সেইরূপ 'স্বল্পাক্ষরী, সারবর্তী, সন্দেহ শূন্য' ভাষায় শুনিতে চাই,—'ন্যাশানাল কংগ্রেস্ কি ?" রাজনীতি ও প্রজানীতির পরিচর্য্যায় যাপিত জীবন কংগ্রেসের বন্ধুগণ, প্রাগুক্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দিবেন ভরসায়, অদ্য আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

নানা ধর্ম্মাবলম্বী বহুসংখ্যক জাতি পূর্ণ এই ভারতবর্ষের জাতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন বড় সহজ কথা নহে। অথচ শুনিতে পাই, সাত শত বা সার্দ্ধসপ্তশত পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভারতবাসীর একত্র সম্মিলনের নাম,—জাতীয় মহাসমিতি-সঙ্গঠন! আমরা "বঙ্গবাসীর" ন্যায় বলি না,—"এতগুলি শিক্ষিত ভারত বাসীর মধ্যে কেহই জাতীয় প্রতিনিধি হইবার যোগ্য নহেন। শিখাধারি ব্রাহ্মণপণ্ডিত বা দীর্ঘ দীর্ঘ দাড়ি গুম্ফ ধারি মোল্লা না হইলে, চোগা চাপ্‌কান ধারি বাবুর দল জাতীয় প্রতিনিধি হইতে পারে না।" আমরা এই মাত্র বলি, কংগ্রেসের পাণ্ডা অনুষ্ঠাতাগণ যে পাশ্চাত্য শিক্ষিত মাত্রকেই দেশের মুখপাত্র বা জাতীয় প্রতিনিধি বলেন, সে কথা ঠিক নহে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষিতকেই কেহ জাতীয় প্রতিনিধি বলা দূরে আস্তাং, দেশের মুখ পাত্র বলিয়া স্বীকার করিতেও নারাজ। আমরা পল্লিগ্রাম এবং গণ্ডগ্রামের অবস্থা যত দূর জানি, তাহাতে আমরাও এই অংশে 'বঙ্গবাসীর' সহিত এক মতাবলম্বী হইয়া বলিতে পারি, অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষিত ওরফে কলেজ ফের্‌তা বাবুর দল, "গায়ে মানে না আপনি মণ্ডল" হইয়া স্বদেশের, স্বগ্রামের মুখপাত্র বলিয়া, আত্মপরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন না। আমরা দেখিয়া আসিতেছি, অনেক বাবুই স্বীয় জন্মভূমির (যে গ্রামে জন্ম) প্রকৃত উন্নতি আকাঙ্ক্ষী নহেন। তবে যেমন সভাসমিতিতে বক্তৃতাকালে ভাই ভারতবাসী! বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া উপদেশের ছড়াছড়ি করেন, তেমনই সভাক্ষেত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই প্রতিবাসীগণের কথাত মনে থাকেই না, প্রাণতুল্য সহোদর ভ্রাতার সহিতও সম ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হন। এরূপ স্বদেশ হিতৈষি বাবুর সংখ্যা এই ভারতে, বিশেষত এই বঙ্গভূমিতে অল্প নহে। 'বাঙ্গালী চরিত' রচয়িতা 'গোপাল বাবু' নামে যে এক জন স্বদেশ হিতৈষি, বক্তৃতা-প্রিয় 'শিক্ষিত' বাবুর চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন, অনেকে তাহা অতি রঞ্জিত বলেন। আমরা কিন্তু অনেক বাবুকেই উক্ত চিত্রানুরূপ লক্ষ্য করি। এই প্রবন্ধের সহিত বাবুদলের চিত্র প্রদর্শন নিস্প্রয়োজনীয় না হইলে, পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা আমাদের পরিচিত কতকগুলি বাবুর নাম ধাম সহ চিত্রাঙ্কণ করিতাম। সে যাহউক, আমরা যাহা বলিলাম, তাহার কতকাংশও যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এই শ্রেণীর শিক্ষিতগণ কি স্বদেশের দূরে আস্তাং, স্বগ্রামেরও প্রতিনিধি হইবার যোগ্য? যদি না হন, তবে স্বীকার করিতে হইবে, ন্যাশনাল্‌ কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্যই স্বদেশ বা স্বজা-

তির প্রতিনিধি নহেন। অনেকেই কেবল স্বস্ব সত্বার প্রতিনিধিমাত্র। অথচ এই শ্রেণীর অধিকসংখ্যক লোকের একত্র সম্মিলনের সাধারণ নাম, কেহ বলেন,—প্রজানীতি সঙ্গঠনের মহদনুষ্ঠান; অনেকে বলেন,—জাতীয় মহাসমিতির বার্ষিক অধিবেশন বা পূর্ণাধিবেশন। ফলত যাহাদিগকে লইয়া দেশ, যাহাদিগের জন্য প্রজানীতি সঙ্গঠনের চেষ্টার কথা বলা হইতেছে, সেই সকল অর্দ্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত নিরক্ষর ভারতবাসী এক বাক্যে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"বাবুগণ! আপনারা যাহাকে প্রজানীতি সঙ্গঠনের মহদনুষ্ঠান, জাতীয় মহাসমিতির বার্ষিক বা পূর্ণ অধিবেশন বলিতেছেন, আমরা তাহাকে কলিকাতার সেই মহামেলার ন্যায় কোন কোন মহানগরীতে বর্ষে বর্ষে শিক্ষিত প্রদর্শনী হইতেছে, বলিয়াই বুঝি।" তথাপি বিচক্ষণ সর্ব্বনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিতেছেন,—"কংগ্রেস্ অতি গুরুতর ব্যাপার।" তাই বাধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে.—"তবে ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্ কি ?"

সাধারণেত 'কংগ্রেস্ কি ?' তাহা আজও বুঝিতে পারিল না। অথচ 'কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে ?' কংগ্রেসের পাণ্ডাগণের মধ্যে এখন এই কথার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে বলে (সুরেন্দ্রবাবু নিজেও বলেন,) "ভারত সভা ওরফে তিনিই (সুরেন্দ্র বাবুই) কংগ্রেসের অনুষ্ঠাতা বা জন্ম দাতা। এই কথার উত্তর ছলে সেদিন শুনিয়াছি,—গনেশদেব যোষী দিল্লি-দরবারে যে সংবাদ পত্রের সম্পাদক সমিতি সঙ্গঠনের চেষ্টা করেন, তাহারই পরিণাম ফলই—ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্।" আমরা এই উভয় কথাই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবার কোন প্রমাণ দেখি না। এক ভারতসভা ওরফে সুরেন্দ্র বাবুর (চেষ্টা বা যত্নের) দ্বারা—ন্যাশানাল্ কংগ্রেস্ প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না। ঐ কথা বলিয়া যাঁহারা বাহাদুরী দেখাইতে চাহেন, তাঁহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধ বাদীদলের অপেক্ষাও কংগ্রেসের অবমাননা কারী,—সুতরাং পরম শত্রু। এরূপ স্থলে "কংগ্রেস্ অতি গুরুতর ব্যাপার" বলাও ভুল। পক্ষান্তরে গনেশদেব যোষীর প্রস্তাব মত সংবাদ পত্রের সম্পাদক সমিতির কার্য্যক্ষেত্র বা অবয়ব বৃদ্ধির নামই যদি 'কংগ্রেস্' হয়, তবে এই তিন বার্ষিক অধিবেশনে কেবল সংবাদ পত্র সম্পাদক ভাবে একজনকেও 'কংগ্রেসে' উপস্থিত হইতে দেখিলাম না কেন ? 'সংবাদ পত্র সম্পাদক গণের নিমন্ত্রণ হইলনা' বলিয়া 'বঙ্গবাসীর' কান্না কাটি শুনিয়া কংগ্রেসের পাণ্ডাগণের কোথায় কর্ত্তব্য জ্ঞানোদয় হইবে, না—তাহারা 'বঙ্গবাসীকে' টিট্কারী দিয়া জনসমাজে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিলেন। "সংবাদ

পত্র-সম্পাদক গণই একরূপ দেশের প্রতিনিধি হইলে হইতে পারেন” বলিয়া. গনেশ দেব যোষী যে মহদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিলেন, তাহার পরিণাম তবে অন্যরূপ হইল কেন? আমরা মনে করি, সাধারণ ভারতবাসীর বিশ্বাসও যোষী মহাত্মার প্রস্তাবের অনুরূপ। তাই আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কেবল শিখাধারি ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কি দাড়ি গুম্ফ ধারি মোল্লাগণ অথবা স্বার্থান্ধ হুজুক্ প্রিয় কলেজ ফেরতা শিক্ষিতাভিমামী বাবুগণ—ইহাঁরা বর্ত্তমান কালে কেহই সম্পূর্ণ একটি জেলা বা জাতির প্রতিনিধি হইবার যোগ্য নহেন। তবে দেশের জলবায়ু শিক্ষা এবং লোক চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইলে, ভবিষ্যতে কিরূপ দাঁড়ায়, বলা যায় না। যতদিন প্রাশ্চাত্য ও প্রাচ্য প্রথা ফিল্টর হইয়া এক অভিনব ভাবে আত্মশাসন বিধি দেশময় প্রচারিত এবং নিষ্কলঙ্ক রূপে প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, তত দিন বিচক্ষণ চিকিৎসকের মুষ্টি যোগ প্রায়, যোষীমহোদয়ের ব্যবস্থা যাহাতে প্রতি পালিত হয়, কংগ্রেসের প্রকৃত বন্ধুগণের সে চেষ্টা করা সর্ব্বতো ভাবে উচিত। কিন্তু দেশীয় প্রায় সকল সংবাদ পত্র সম্পাদকই এতদ্বিষয়ক আন্দোলন করিয়া কংগ্রেসের পাণ্ডাগণের অবজ্ঞা সূচক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদর্শনে লজ্জায় নীরব হইয়াছেন। সুতরাং সংবাদ পত্র সম্পাদকগণকে কংগ্রেসের পাণ্ডাগণ যে দেশের প্রতিনিধি বলিয়া, যোষী মহোদয়ের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবেন, সে আশা করা বৃথা। ইহার মধ্যে কি যে গূঢ়-রহস্য নিহিত আছে, তাহা সাধারণে বুঝিতে অক্ষম। তাই কংগ্রেসের প্রকৃতি বুঝিতে আমাদিগকে আরও অনেক বার প্রশ্ন করিতে হইবে,—‘কংগ্রেস্ কি?’

যত দিন আপামর সাধারণে বুঝিতে না পারিবে ‘কংগ্রেস্ কি?’ ততদিন সাতশত স্থলে সাত হাজার শিক্ষিত যুবক কংগ্রেসে উপস্থিত হইলেও আমরা ঘাত-সহিষ্ণু, শক্ত সমর্থ, রক্ত অস্থিময়, প্রজানীতি সঙ্গঠনের চেষ্টা এই কংগ্রেসে হইতেছে, একথা স্বীকার করিব না। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ আশা করি প্রাগুক্ত রূপ প্রজানীতির গোড়া পত্তন ন্যাশনাল্ কংগ্রেসে হইবে। যাঁহাতে এহেন উপকারী সৌধ—সুরঙ্গময় স্থানে—কাঁচা ভিত্তির উপর গঠিত না হয়, সকল শ্রেণীর ভারতবাসীরই সে উপদেশ দিবার অধিকার আছে। তাই কংগ্রেসের প্রকৃতি বুঝিতে অনেকে অনেকরূপ প্রশ্নকরে। কংগ্রেসের বন্ধুগণকে তাহাতে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে দেখিলেই মনে হয়, তবে কি প্রজানীতির গোড়া-পত্তন কয়েকজন অসামাজিক লোকের একত্র সম্মিলনে, এবং গলা বাজিতেই হইবে। কংগ্রেসের বন্ধুগণ বলেন,—তাহা কে বলিল? ভারত-

বাসী মাত্রেই ভারতেশ্বরীর প্রজা ; সুতরাং সমস্ত ভারত বাসীর একসুরে সুর বাঁধনের চেষ্টার নামই—'প্রজানীতি সঙ্গঠন'। তবেই আমরা বলিতে পারি, "মুটে মজুর হইতে, রাজা, মহারাজা পর্য্যন্ত, অধ্যাপক হইতে অসভ্য বর্ব্বর পর্য্যন্ত—সকল শ্রেণীর ভারত বাসীকে বুঝাইয়া দেও,— 'কংগ্রেস্ কি ?'

যত দিন আমরা বুঝিতে পারিব না, এবং সাধারণকে বুঝাইতে পারিব না--'ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্ কি ? তত দিন লোক প্রচলিত কোন উত্তর পাই-লেও আমরা নীরব হইব না। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিব,—ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্ কি ?' কংগ্রেসের অনুষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠাতা বন্ধুগণ কি আমাদের প্রশ্নে কর্ণপাত করিবেন না ? যদি তাঁহারা আমাদের প্রশ্ন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করেন, কেহই কোন উত্তর না দেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝিব,—ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্ অর্থে পাশ্চাত্য শিক্ষিতের প্রদর্শনী, বা পাশ্চাত্য শিক্ষিতের মহা মেলা !

শ্রীচন্দ্রমোহন সেন।
কালিয়া চক।
(মালদহ।)

কালিদাসের চৌর্য্যাপবাদ।

চৌর্য্যাপবাদ কথাটার সঙ্গে একত্র যোজিত হওয়ায়, কালিদাসকে আপনাদিগের কোন অপরিচিত লোক ভাবিবেন না। ইনিই সেই সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ মহাকবি কালিদাস। তাঁহার আবার চৌর্য্যাপবাদ—শুনিয়া অবাক হইবেন না, ভাবিয়া আকুল হইবেন না,—বলিতেছি শুনুন্। জানেন ত তাঁহার যেসকল কাব্য ও নাটক আছে তন্মধ্যে কাব্যে কুমারসম্ভব ও নাটকে শকুন্তলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; এই শকুন্তলা এবং কুমার সম্ভবের এক একটি কথা এক একটি পদ সাহিত্য ভাণ্ডারে এক একটি সমুজ্জল রত্ন। কালিদাস নাকি অনেকগুলি রত্ন কোন এক ধনাঢ্য মহাজনের সিন্দুক হইতে অপহরণ করিয়া প্রায় সকল গুলিকেই একটু আধটু ঘসিয়া মাজিয়া লওয়ার পর এবং দুই একটিকে অবিকল পূর্ব্বাবস্থায় রাখিয়া কুমার সম্ভবে "আপনার" বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন—অর্থাৎ শিবপুরাণের অনেক গুলিশ্লোক একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া বা অবিকল ভাবে কুমার সম্ভবের অবয়ব-পুষ্টি করিয়াছে।*

---

* শিবপুরাণ ত্রয়োদশ অধ্যায় ;—

দিশঃ প্রসেদুঃ পবনঃ সুখংববৌ
শঙ্খং নিদধ্মুর্গগনে চরাস্তথা।
পপাত মৌলৌ কুসুমাঞ্জলিস্তদা
বভূব তজ্জন্ম দিনং সুখপ্রদম্॥
মেনা তয়াপূর্ণ নিশেশবক্ত্রয়া
স্ফুরৎ প্রভামণ্ডলয়া ররাজ হ।
যথা বিদূরাচলভূমিরঞ্জসা
ঘনোত্থয়া রত্নশলাকয়া মুনে॥

কুমার সম্ভবের প্রথম সর্গ ;—

প্রসন্নদিক্ পাংশু বিবিক্তবাতম্
শঙ্খস্বনানন্তরপুষ্পবৃষ্টি।
শরীরিণাং স্থাবর জঙ্গমানাং
সুখায় তজ্জন্মদিনং বভূব॥ ২৩।

কু থাটা প্রাচীনদিগের মুখে তখন তখন শুনা যাইত বটে কিন্তু ক্রমে চাপা পড়িতেছিল। তাহার পর তর্কবাচস্পতি মহাশয় বামাল শুদ্ধ দেখাইয়া ছাপাইয়া দিয়াছেন, এবং কালিদাস যে চোর এ বিষয়ে প্রকারান্তরে নিজের সম্মতি দিয়াছেন। কাজেই দেশশুদ্ধ ঢাক বাজিয়া গিয়াছে আর হঠাৎ চাপা পড়িবার যো নাই। যাহাউক আমরা কিন্তু একথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। তাহার প্রথম কারণ অপরের গ্রন্থ কাপি করিয়া জগতের শ্রেষ্ঠকবি হওয়া যায় না; দ্বিতীয়, কালিদাসের পক্ষে জাঁহাবাজ উকীল নিচুল কবি বর্ত্তমান থাকিলেও প্রবল শত্রুদিঙ্নাগাচার্য্য থাকিতে এত বড় গুরুতর অকার্য্য করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

তবে শিবপুরাণের সহিত কুমার সম্ভবের শ্লোক মিলিল কিরূপে? সে বিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। কালিদাসের পরবর্ত্তী মহাত্মা পণ্ডিত-গণ প্রচলিত শিবপুরাণের সঙ্কলন কর্ত্তা। পুরাণের উদ্দেশ্য—ধর্ম্মোপদেশ, ধর্ম্ম কথা প্রচার; কবিত্ব প্রদর্শন তাহার উদ্দেশ্য নহে সুতরাং প্রকরণের অনুযায়ী হইলে পূর্ব্ব কবি প্রণীত শ্লোকাদিও তাহাতে উদ্ধৃত হইতে পারে; এবং এখানে তাহাই হইয়াছে—কালিদাসের শ্লোক গুলি যাহাতে-পুরাণের অনুযায়ী হয়, সেইরূপে একটু আধটু পরিবর্ত্তিত করিয়া শিবপুরাণে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শিবপুরাণের সঙ্কলন যে কালিদাসের পরে হইয়াছে তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মৎস্য পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত, ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ব্রহ্ম পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, বায়ু পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, বরাহ পুরাণ, বামন পুরাণ, আদিত্য পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, কূর্ম্ম পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ ও

তয়া দুহিত্র সুতরাং সবিত্রী
স্ফুরৎ প্রভামণ্ডলয়া চকাশে।
বিদূরভূমির্নব মেঘশব্দাদ্
উদ্ভিন্নয়া রত্নশলাকয়েব ॥ ২৪।

কুমার সম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে ৬৩টী শ্লোক; তাহার মধ্যে ৪৬টী শিব-পুরাণের নকল। অন্যান্য সর্গেও এইরূপ নকল করা শ্লোক বহুতর আছে, নমুনা স্বরূপ প্রথম সর্গের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গারুড় পুরাণ* এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ। ইহার মধ্যে শিব পুরাণের উল্লেখ নাই। তবে কেবল শিব পুরাণের মতে বায়ু পুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের পরিবর্ত্তে শিব পুরাণ ও দেবীভাগবত মহাপুরাণ †। ইহাকেই বলে "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল"। সে যাহাহউক কিন্তু পদ্ম পুরাণে ১৯ অধ্যায়ে উপপুরাণ গণনা প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে "শৈব মাদিপুরাণঞ্চ দেবী ভাগবতং তথা" অর্থাৎ শিব পুরাণ, আদিপুরাণ ও দেবী-ভাগবত উপপুরাণের অন্তর্গত। সুতরাং পদ্ম পুরাণ প্রচারের বহু পরে শিবপুরাণে ঐ শ্লোকটি প্রবেশ লাভ করিয়াছে ইহা-বেশ বুঝা যাইতেছে। শিবপুরাণ আপনা আপনি বড় হইতে চেষ্টা করিলেও, আর কেহ বলুক না বলুক আপনার মহা পুরাণত্ব আপনি ঘোষণা করিলেও, অপরাপর প্রসিদ্ধ মহাপুরাণের ক্ষমতায় তাঁহাকে উপপুরাণের মধ্যে নিবিষ্ট হইতে হইতেছে। উপপুরাণ—সকল, পুরাণ হইতেই সঙ্কলিত ‡ অতএব উপপুরাণ যে পুরাণের পরজাত তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

পুরাণ সকলের মূলপত্তন সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইলেও তাহা বর্ত্তমান আকারে শ্লোকে রচিত, লিপিবদ্ধ, জনসমাজে আদৃত ও প্রচলিত হইতে যে বহুশতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছিল এবং এই কালের মধ্যে যে কোন কোন উপপুরাণের ভিত্তিস্থাপন হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়। আবার পুরাণ প্রচার কালে কোন কোন উপপুরাণের ভিত্তি স্থাপন হইলেও শালিবাহনের ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীর পরে যে তাহাদিগের প্রচলন হইয়াছিল, ইহা বলা যাইতে পারে। মনে করুন, আদিপুরাণ ও বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক উপপুরাণ। তাহাতে লিখিত আছে "কলিযুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অসবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করিবেন না অর্থাৎ পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চতুর্ব্বর্ণীয় কন্যাকে, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাকে, বৈশ্য—বৈশ্যা ও

---

* মদ্বয়ং ভদ্বয়ঞ্চৈব ব্রত্রয়ং বচতুরষ্টয়ম্।
আলিংপাগ্নি পুরাণানি কূস্কং গারুড়মেবচ॥ আদিত্যপুরাণ।

† যত্র পূর্ব্বোত্তরখণ্ডে শিবস্য চরিতং বহু। শৈবমেতৎ পুরাণংহি
ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্রবিদ্যতে তত্তু ভাগবতংপ্রোক্তং॥ শিবপুরাণ

‡ অষ্টাদশভ্যস্তু পৃথক পুরাণং যৎ প্রদৃশ্যতে।
বিজানীধ্বং দ্বিজ শ্রেষ্ঠাস্তথা তেভ্যোবিনির্গতম্। মৎসপুরাণ।

শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারিতেন * কিন্তু কলি যুগে তাহা পারিবেন না, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াকে ও বৈশ্য বৈশ্যাকেই বিবাহ করিবেন।"

কিন্তু কালিদাসের পরবর্ত্তী শালিবাহনের ষষ্ঠ শতাব্দীর বাণভট্ট নিজকৃত হর্ষচরিতের প্রথমোচ্ছ্বাসে আপনার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়া গৌরবের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহার দুই জন পারশব ভ্রাতা ছিল †। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে তৎকালে ঐসকল উপপুরাণের প্রচলন হয় নাই। প্রচলিত হইবার পর হইতেই অসবর্ণ বিবাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এবং "দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা" "কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ" অর্থাৎ কলিকালের প্রথম ভাগে মহাত্মাপণ্ডিত গণ—এই সকল কার্য্য করিতে ব্যবস্থা পূর্ব্বক নিষেধ করিয়াছেন। সাধুদিগের আচার ও নির্ণীত তত্ত্ব বেদবৎ প্রমাণ। বৃহন্নারদীয় পুরাণে এইটুকু থাকায় বোধ হইতেছে বৃহন্নারদীয় পুরাণের প্রচলন কালে কোন ঋষি মুনি বর্ত্তমান ছিলেন না; থাকিলে এত মাথার দিব্য দেওয়ার বা গৌর চন্দ্রিকার প্রয়োজন হইত না। "সময়শ্চাপিসাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ" ঋষি শাসিত আর্য্যগণ জানিত ও মানিত "বেদো ধর্ম্মমূলং তদ্বিদাং স্মৃতিশীলে।" ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া বলাযাইতে পারে আদি পুরাণ বৃহন্নারদীয়পুরাণের মত শিব পুরাণও কালিদাসের পরে সঙ্কলিত। অধিকন্তু প্রামাণিকতা দেখিয়া বোধ হয় আদিপুরাণ ও বৃহন্নারদীয় পুরাণ, অন্য সকল উপপুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন। অথচ যখন (উক্ত পুরাণদ্বয়ের) প্রচারও কালিদাসের পরে; তখন

---

* অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রোভার্য্যাভবন্তি তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য দ্বেবৈশ্যস্য। বিষ্ণুসংহিতা ২৪শ অ।

† "অভবংশ্চাস্য বয়সা সমানাঃ সুহৃদঃ সহায়াশ্চ তথাচ ভ্রাতরৌ পারশবৌ চন্দ্রসেন মাতৃসেনৌ"। হর্ষচরিত প্রথম উচ্ছ্বাস।

শূদ্রজাতীয় পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে সন্তান হয় তাহার নাম "পারশব"।

বিপ্রান্ মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ। স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপিবা।
বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥ যাজ্ঞবল্কসংহিতা অচারাধ্যায় ৯১।৯২ শ্লোক।

অন্যান্য উপপুরাণের কথা আর স্বতন্ত্র বলিবার আবশ্যকতা নাই। ফলত অপরের গ্রন্থ কাপি করিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া যায় না, এই টুকু মনে থাকিলেই সকল তর্ক পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে।

এখন পাঠক বুঝিয়া শুঝিয়া আমাদিগের রায়েই রায় দিন্, আর কালিদাসের প্রেতাত্মাকে চৌর্য্যাপরাধে জেলে দিবার জন্যই আয়োজন করুন, তাহাতে আমাদিগের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

জানানা উপদেশ মালা।

১। পুরুষ ও স্ত্রী মাত্রেই ভ্রাতা ও ভগ্নী। অতএব স্ত্রী মাত্রেই পুরুষকে ভ্রাতৃভাবে নিরীক্ষণ করিবেন। বিবাহিত দম্পতি অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী ঈশ্বরের চিহ্নিত ভ্রাতা ও ভগ্নী।

২। ভ্রাতা ভগ্নীদের মধ্যে ধর্ম্ম-যোজিত যাবতীয় কার্য্য সুফল প্রসব করে। অতএব ভ্রাতাভগ্নী একত্রিত হইলে ভবের অন্য সমুদায় ভাব ঘুচিয়া যায়; একই পবিত্র মঙ্গলের জ্যোতি উঠিতে থাকে।

৩। ভ্রাতাদের নিকট ভগ্নীদের ঘোম্‌টা দেওয়া পরম পিতার অনুমোদিত নহে। কারণ, ভগ্নীদের চন্দ্রবদন সন্দর্শন না করিয়া ভ্রাতাগণ ঈশ্বরের প্রেরিত পবিত্র স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া অনেক সৎকার্য্য এবং তাঁহার মহদভিপ্রায় সাধনে অকৃতকার্য্য হয়েন। অতএব ঈশ্বর স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন, "স্ত্রীগণ তোমরা ঘোম্‌টা খোল"।

৪। যাহাতে মনের প্রীতি জন্মে ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ তাহাই করিবেন। কারণ, প্রফুল্ল এবং সদানন্দ চিত্তই অপ্রক্ষিপ্ত ভাবে ঈশ্বরের নিয়োজিত হইয়া থাকে। অতএব ভ্রাতা ভগ্নীর এবং ভগ্নী ভ্রাতার সরল অন্তঃকরণের যাবতীয় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়া প্রফুল্ল চিত্ত ঈশ্বরে অর্পণ করিবেন।

৫। স্বাধীনতা পরম পিতার অতি আদরের সামগ্রী, পবিত্র মঙ্গলের আকর-স্বরূপ। পিতার ধন বলিয়া ভ্রাতা ও ভগ্নীর স্বাধীনতার সমান অধি-

কার। অতএব ভগ্নীগণ ভ্রাতাদের ন্যায় জুতা পায়ে দিবেন, গাড়ি চড়িবেন, বাগানে যাবেন এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রেমালাপ করিবেন।

৬। পৌত্তলিকদিগের দেবদেবী মান্য করিবে না; কারণ, সে সকল পুত্তলিকা ঈশ্বরের চির শত্রু—সয়তানের স্বরূপ। যাহারা পৌত্তলিক ধর্ম্ম যাজন করে তাহারা একান্ত পরিবর্জ্জনীয়। এমন কি পৌত্তলিক ধর্ম্মবাদী বৃদ্ধ পিতা মাতাও পরিত্যেজ্য।

৭। ভ্রাতাগণের দাড়িই ধর্ম্মের প্রধান পবিত্র চিহ্ন। কারণ, চোপ দাড়িই ভারতে চিরদিন পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরোধী। অতএব দাড়ি শোভিত দক্ষ অবতার ভ্রাতাই ভগ্নীর একান্ত পূজনীয়।

৮। ভগ্নী ও ভ্রাতাদের মধ্যে জাতি ভেদ নাই, অন্নবিচার নাই, ভক্ষ্যা-ভক্ষ্যের প্রভেদ নাই; সকলই একাকার, নিরাকারের ইচ্ছায় সকলই একাকার।

৯। ঈশ্বরের সংসার উদ্যানে ভ্রমণ করিতে ভ্রাতা ভগ্নীগণ পদে পদে পদ-স্খলিত হইলে, নির্দ্দিষ্ট পবিত্র মন্দিরে সভাস্থ হইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া একবার "একমেবদ্বিতীয়ং" বলিয়া ডাকিলেই যথেষ্ট। অতএব ভগ্নীগণ নির্ভয়ে যদৃচ্ছায় ঈশ্বর মালীর সংসার বাগানে বেড়াইবেন।

১০। ঈশ্বরের মঙ্গলময় সংসারে "তিন আইন মতে বিবাহ" একমাত্র প্রশস্ত পবিত্র বিবাহ। সেই বিবাহের সুলভ-সম্পাদন অনুকূলেই মন্দির ও সভার সৃষ্টি। ততএব ভ্রাতা ভগ্নীগণ সমাজে মিলিত হইয়া শুভদৃষ্টিতে দেখাদেখি করিবেন।

১১। এ বিবাহে ভ্রাতা ভগ্নীতে রূপের আকাঙ্ক্ষা করিবেন না, গুণ খুঁজি-বেন না, স্বামীভক্তির অভিলাষ করিবেন না, পুত্রলাভের আশা করিবেন না, কেবল দেখিবেন যে ভগ্নী পবিত্র ধর্ম্মের পবিত্র বীজরোপণের ক্ষেত্র কি না।

১২। ভগ্নীগণও একান্ত স্থির নিশ্চয় জানিবেন যে সুদীর্ঘ দাড়ি-বিভূষিত, থান-চেরা বসন উত্তরীয়-শোভিত, চিরুণী-পরিত্যক্ত মস্তক বিশিষ্ট, এবং পবিত্র ধর্ম্মের তৈলহীন গন্ধের আকর স্বরূপ পবিত্র ভ্রাতাই উপযুক্ত স্বামী।

১৩। ভগ্নীদের অপাত্রে দান অতীব নিষিদ্ধ। কর্ম্মক্ষম পিতা মাতা আলস্যে কাল যাপন করিতে থাকিলে তাহাদের উদর পোষণ করা সংসারা-শ্রমীর অন্যায় দান। কর্ম্মফল কামনা করিয়া ধর্ম্ম প্রচারকদের দেশভ্রমণে

গাড়ি ঘোড়ার বন্দোবস্তের অনুকূলে দানই প্রশস্ত ও প্রধান দান। ইহাই পবিত্র দান ধর্ম্ম।

১৪। যে বিধবা ভগ্নী জগতের মঙ্গলোদ্দেশে পুনরায় বিবাহ করিবেন তিনিই স্বামীর পবিত্র ধর্ম্মপত্নী।

১৫। যে ভগ্নী বিধবা বিবাহের পাত্রী স্থির করিতে সক্ষম হইবেন এবং যিনি তাদৃশ ভগ্নীকে বিরুদ্ধ ধর্ম্মীর গৃহের বাহির করিয়া আনিতে পারিবেন, তিনিই স্বামীর অনুকূল সহধর্ম্মিণী।

১৬। যে ভগ্নী রন্ধনের ভার ভৃত্য-হস্তে, সন্তানের ভার ধাত্রী-হস্তে, এবং রুগ্ন স্বামীর পরিচর্য্যার ভার হাসপাতালের মেথরের হস্তে সমর্পণ করিয়া কায়-মনোচিত্তে অনবরত কাল আশ্রমের ভ্রাতাগণের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন, তিনিই স্বামীর সাধ্বী ধর্ম্মভাগিনী ভার্য্যা।

১৭। যে ভগ্নী, ব্যঞ্জনাদির পরীক্ষার্থ অগ্রে ভোজন সমাপন করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক স্বামীকে পাত্রাবশিষ্ট পরীক্ষা-উত্তীর্ণ উত্তম অন্নব্যঞ্জনে যথাবিধি ভোজন করাইবেন, তিনিই পবিত্র পতিব্রতা ভার্য্যা।

১৮। স্বামীর কল্যাণ সাধন করিতে স্ত্রীলোক মাত্রেই ঈশ্বরের ভগ্নী-প্রকৃতির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। যে সংসারে স্ত্রীর পূজা হয় না সে সংসারের শ্রেয় হয় না। অতএব জড়রূপ পুরুষগণ যাহাতে প্রকৃতি দেবী অর্থাৎ ভগ্নীদের শ্রীচরণ পূজা করেন, ভগ্নীরূপা শক্তিরা সর্ব্বদা সেরূপ শক্তি সঞ্চালন করিবেন।

১৯। ভগ্নীরাই ভ্রাতাদের ধর্ম্ম অর্থ কামের একমাত্র সহায়। অতএব ভগ্নীগণ এমত ভাবে ভ্রাতাদের প্রতি অনুকূল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, যে তাঁহারা যেন ত্রিবর্গ লাভের আশায় পরিপূর্ণ হয়েন, আশার লহরি যেন তাঁহাদের হৃদয়ে খেলিতে থাকে, এবং মধুর ভাব তাঁহাদের মনে উদ্ভাসিত হইতে থাকে।

২০। ভগ্নীগণই ভ্রাতাদের মোক্ষ বিধায়িনী। ভগ্নীগণ স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্ভোগ করিলেই ভ্রাতাদের পরম মোক্ষ।

সংগীত।

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

নরনারী দুহেঁ সম অধিকার স্বাধীনতা ধন অতুল।
দিলেন পিতা দয়ার সাগর, হয়ে সবে অনুকূল॥

এসো ভোগ করি, পিতৃদত্তধন, মিলে ভাইভগ্নী কুল।
পিতার করমে, করো না কো ভয়, সংসার বিপদ সঙ্কুল ॥
প্রীতিরসে মজি রহ অহরহ করো না আত্মপর বিচার।
দেখুক জগৎ হইয়ে অবাক্ ফুটিছে চৌদিকে প্রেম ফুল ॥
ধরা ছাড়ি জরা পলাইবে দূরে হিংসা দ্বেষ আদি রিপুকুল।
হইবে অচিরে পাপ মর্ত্তলোক স্বরগের সমতুল ॥

অপূর্ব্ব মিলন।

(অপরাহ্ন—যমুনাসৈকতে)

প্রেমভক্ত রক্ত রবি ব্যোম চিতাপরে,
রক্ত বস্ত্র পরিধান,
ঢুলু ঢুলু দুনয়ান,
যোগাসনে একমনে প্রেমধ্যান ধরে।
প্রেমদীপ্তি মাথা গায়
পার্শ্বে শক্তি নীলিমায়
বুকে করে যোগী রবি ভাবে ভসে যায়।
শ্যামাঙ্গিনী এ ধরায়
তরু লতা সমুদায়
হাসে প্রেমানন্দে, ভাসে কনক বিভায়।
তপ্ত স্বর্ণ কান্তি ধার
হৃদে বহে যমুনার,
পূর্ণতীর পুণ্যনীর প্রেমে উথলায়।
এহেন যোগের কালে,
এই সৌন্দর্য্যের তালে
কি জানি কে অনুরাগে বাঁশরী বাজায়।
বাঁশী ডাকে উভরায়
প্রেমময়ী শ্রীরাধায়,

করি সেই ভগবৎ-প্রেম-গীতা গান।
নিষ্কাম রাধার পাশে
শুভ প্রেম দীক্ষা আশে
ছুটে যায় জ্ঞানহারা যমুনা উজান।
নিষ্কাম বাঁশরী স্বর
ভয়ে বিশ্ব চরাচর,
বিশ্ববর্গ, সপ্তস্বর্গ ধ্যানে মজে যায়।
অণু পরমাণু তায়
প্রেম ভাবে ভরে যায়,
প্রেমে মিলে গড়ে নব সৃষ্টি সমুদায়।
জুড়িয়ে গগনদেশ
অবিরাম, অনিমেষ,
ক্ষিপ্তগ্রহ লিপ্ত সদা কক্ষে ঘুর্ণিবারে।
পেয়ে বাঁশী প্রেম ধারা,
দাঁড়ায়ে উন্মাদ পারা,
চায় প্রেম আর্দ্র নেত্রে বিশ্বে বারে বারে।
গ্রহ উপ গ্রহ গায়
বাঁশীস্বর ঠেকে যায়,
তাই ঝরে শূন্য হতে উল্কা অশ্রু ধারা।
মাখি সে সঙ্গীত ধার
উথলায় পারাবার,
উজানে ছুটিয়া আসে উন্মাদের পারা।
বাঁশরীর কলস্বরে
রাধারে পাগল করে,
উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসে যমুনা কিনারে।
যেন স্বর মত্ততায়
বেধে যায় পায় পায়,
নিচল নিথর অঙ্গ চলিবারে নারে।
লট পট কেশপাশ,
কটি হতে খসে বাস,

শরীরে নাহিক শক্তি প্রেমের নেশায়।
ননীর পুতলি হায়,
পড়ে ভূমে মূরছায়,
সৌদামিনী খণ্ড খসে, ধুলায় লুটায়।
নাহি শ্বাস নাহি প্রাণ,
শব হেন অনুমান,
যোগবলে-কৃষ্ণ-প্রেম-দীক্ষা-মন্ত্র-বলে—
সূক্ষ্ম দেহ স্থূল হতে
চলে গিয়ে প্রেম পথে,
অনুরাগে মেশে কৃষ্ণ শ্রীপদকমলে।
আলু থালু সখী সবে,
এভাব না অনুভবে,
ভাবে বুঝি এইবার হারানু রাধায়।
কেহ ছুটে চলে যায়,
যথা আছে শ্যামরায়,
ডুবিতে যমুনা জলে কেহ ছুটে ধায়।
কেহ ফুকারিয়া কাঁদে,
কেহ বলে 'উঠ রাধে!
সহচরি ব্রজনারী কাঁদে গো তোমার'।
রাধায় সিঞ্চিয়ে বারি
বলে কেঁদে কোন নারী,
শুন, রাধে শ্যামচাঁদে বাঁধিব এবার।
দুকথা শুনায়ে দিয়ে,
বাঁশিটি কাড়িয়ে নিয়ে,
যথারীতি দিব শাস্তি এই অপরাধে।
দেখিব কেমনে আর,
বাঁকা শ্যাম বার বার
বাঁশরীতে ডাকে 'তোমা রাধে রাধে রাধে।"
আহা সেই অন্তর্য্যামী
বিশ্ব-বিশ্বপ্রেম-স্বামী

বুঝিয়া অবস্থা হেন প্রেমিকা রাধার।
বদনে মুচকি হাস,
আসিয়ে রাধার পাশ,
সখি গণে সম্ভাষিয়ে বলে বারবার।
"যদি চাও কিশোরীরে,
কর্ণমূলে ধীরে ধীরে
বল হরি হরি সবে জাগিবে কিশোরী।"
পেয়ে শ্যাম-উপদেশ,
সখি সব ছুটে শেষে,
সমস্বরে রাধা কর্ণে বলে হরি হরি।
পেয়ে রাধা চেতনায়,
কেঁদে বলে 'হায় হায়!
কি করিলে প্রাণসখি হরি হরি বলে।
ধ্যান জ্ঞান প্রাণ মন,
জীবন যৌবন ধন
সঁপে দিয়েছিনু আজি শ্যামপদতলে।
সে সব ফিরায়ে নিতে
বড় ব্যথা বাজে চিতে,
এনে দাও শ্যামচাঁদে প্রাণ কাঁদে মরি!
না আনিলে শ্যামরায়,
ডুবিব এ যমুনায়,
অথবা তমালে দিব ফাঁশ সহচরি।"
উন্মাদ প্রাণের দায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে হায়
যেমন খুলিয়া আঁখি চাহিল কিশোরী,—
দেখে দাঁড়াইয়ে বামে
মোহন ত্রিভঙ্গ ঠামে,
হৃদয়ের ধন তাঁর প্রেমিক শ্রীহরি—
'রাধে রাধে রাধে' বলে বাজায় বাঁশরী।

দেবশর্ম্মা।

শাস্ত্র ও ধর্ম্ম চর্চ্চা।

একজন চিন্তাশীল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, "দেশ-বিশেষের মানচিত্র দেখিলে, এবং সেই দেশের আকৃতি, প্রকৃতি, জলবায়ু, ভূতত্ব, মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তির বৃত্তান্ত অবগত হইলে, সে দেশের লোক সমূহের সামাজিক, রাজনৈতিক, নীতি-পরায়ণতার, চিত্রবৃত্তির এবং ধর্ম্মতত্ত্বের অবস্থা ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক রূপে বলিতে পারা যায়।" কোন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির নিবিড় অভ্যন্তরে চিন্তা সহকারে প্রবেশ করিলে এই মহাবাক্যের সম্পূর্ণ সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এবং তাদৃশ আলোচনায় ইতিহাস যেরূপ হৃদয়গ্রাহী এবং কৌতুকাবহ, এমত আর কিছুতেই নহে। ভারতবর্ষে, অন্তত ধর্ম্মতত্ব সম্বন্ধে সেই সত্য কি পরিমাণে সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহা একবার দেখা যাক্।

ভারতবর্ষ, সত্যই সংকীর্ণ আকারে সমগ্র ধরা মণ্ডল। কারণ, ভারত কাহারো মুখাপেক্ষী নহে। ইহার আকৃতি ত্রিকোণ বিশিষ্ট, এবং চতুঃসীমা স্বাভাবিক অভেদ্য। ইহার নদ, নদী, অরণ্য, ও পর্ব্বতমালা স্বাস্থ্যের অনুকূল, বায়ু পরিবর্ত্তনশীল, এবং ভূগর্ভ অনন্ত রত্নের আকর। ইহার মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি অসীম, দেবমাতৃক ক্ষেত্র, বর্ষার আশ্রিত শস্য, উদ্ভিজ্জ অতুলনীয় ও অপরিমিত, ফল সকল পুষ্টিকর ও সুস্বাদু, এবং ফুল জগত-বিমোহন ও স্নিগ্ধকর। ইহার স্বাভাবিক শোভা পূর্ণ-মহিমা-যুক্ত এবং লোচনানন্দপ্রদ; প্রকৃতির অনুকূলতা পূর্ণাকারে বিরাজমান, এবং চন্দ্র, সূর্য্য, ষড়ঋতু, ইত্যাদি অবিচলিত ভাবে আজ্ঞাবহ। সৃষ্টিকর্ত্তার লোকভোগানুরাগ-প্রবৃত্তির সচ্ছলতা ভারতেই দেদীপ্যমান; ভগবান্ অনন্ত হস্তে ভারতে ভোগ-সামগ্রী বিতরণ করিয়াছেন, এবং সেই সর্ব্বজীবে-সম-দয়াবান্ একান্ত নিরপেক্ষ বিভু ভারতেই পক্ষপাতের দোষে কলঙ্কিত হইয়াছেন।

এই ভারত হিন্দুদিগের আদিম অবস্থান নহে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, আশিয়া খণ্ডের মধ্যস্থলে বেলুতাগ্ ও মুসতার্গ পর্ব্বতের পশ্চিমাংশে আমুনদীর উৎপত্তিস্থান সন্নিহিত কোন হিমাবৃত উচ্চতম ভূমিখণ্ডে মনুষ্য জাতির সর্ব্বপ্রথম বসতিস্থান। সেই আদিম মনুষ্যকুলই বেদোক্ত আর্য্য-জাতি। আর্য্যগণ তাঁহাদের সেই আদিম বসতি স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক

দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিয়া ভারতে উপবিষ্ট হয়েন, তাঁহারাই পরবর্ত্তী কালে হিন্দুনামে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহারাই হিন্দুজাতি। পণ্ডিতগণ, আর্য্য ঋষিগণের এবং স্বায়ম্ভুব মনুর ভারতশাসন কাল খৃষ্টজন্মের ৪৪৬৩ বৎসর পূর্ব্বে নির্ণয় করিয়াছেন। প্রজাপত্যাধিকার অর্থাৎ ঋষিদের নিজ শাসনই ভারতে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এমতে বলিতে পারা যায় যে, অদ্য হইতে ৬৩৫৬ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ ভারত-শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং তাহারই কিছু পূর্ব্বে, অর্থাৎ আনুমানিক ৬৫০০ বৎসর পূর্ব্বে, আর্য্যগণ ভারতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এই ৬৫০০ বৎসরের অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের কিয়ৎ কালের মধ্যে হিন্দুর রাজ্য কাল ৫৫৬০ বৎসর, মুষলমানের ৮০০ বৎসর এবং ইংরেজের ১৪০ বৎসর।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে নভোমণ্ডলের যে যে স্থানের যে সকল নক্ষত্রের অবস্থান থাকা মহাভারতে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,তদ্দৃষ্টে বেণ্টলি সাহেব গণনা দ্বারা স্থির করেন যে, খৃষ্টজন্মের ১৮২৪ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ অদ্য হইতে ৩৭১০ বৎসর পূর্ব্বে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল। পূজ্যপাদ দ্বৈপায়ন মহাভারত-রচয়িতা, এবং বেদের সংগ্রহকার ও বিভাগ কর্ত্তা। শেষোক্ত কারণেই তাঁহার পদবী বেদব্যাস। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বেই তাঁহার জন্মকাল স্থির করাই সঙ্গত। তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, অদ্য হইতে আনুমানিক ৩৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ সংগৃহীত হইয়াছিল। এবং তাহাই বেদের চরমাবস্থা। বেদের চরমাবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে, কথিত হইয়াছে যে, সর্ব্বাগ্রে প্রণব ও কতকগুলি বীজের উৎপত্তি হয়, তৎপরে দ্বি অক্ষর শব্দের সৃষ্টি, তৎপরে তাদৃশ শব্দ-নিষ্পন্ন মন্ত্র, এবং তাহার পর গায়ত্রী ছন্দের সৃষ্টি হয়। উহাই বেদ। স্বায়ম্ভব মনুর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মনুর সময়ে ভগবান্ মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বেদ উদ্ধার করেন, অর্থাৎ সেই সময়ে বেদের ব্রাহ্মণভাগ* শ্লোক রচিত হয়। বেদ মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছিল বলিয়া ইহার অপর নাম "শ্রুতি" †। স্বায়ম্ভব হইতে চাক্ষুষ মনুর কালের ব্যবধান আনুমানিক ১৫০ বৎসর। এমতে বেদের প্রথমাবস্থা আরও পূর্ব্বে;

---

* ব্রাহ্মণ ভাগ শ্লোক নহে, সংহিতা ভাগ শ্লোক। ন, জী, সং।

† শুনে শুনে চলিয়া আসিয়াছিল, অনেকটা সঙ্গত। স্পষ্টকরে বলিতে হইলে গুরুমুখে শুনে শুনেই অভ্যাস করা হইত, বলিয়া উহার নাম শ্রুতি।

অর্থাৎ আর্য্যগণের ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই বলিতে হইবে। আর্য্যেরা ভারতে বেদ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, এ কথা বলিতে পারা যায় না; কারণ, তাহা হইলে অন্য আর্য্য-সম্প্রদায়, যাঁহারা ধরা মণ্ডলের অন্যস্থানে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্তত বা বেদের প্রথমাবস্থার একাক্ষর দ্বি অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ সকল কোন না কোন সময়ে বিদ্যমান থাকিত। কিন্তু তাহা নাই। অতএব আর্য্যগণের ভারতাগমনের পরেই বেদের উৎপত্তি বলিতে হইবে। ভারতই বেদের উৎপত্তি-স্থান। এই বেদের উৎপত্তি ঘটিত ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সূত্র ধরিয়া সমালোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আর্য্যগণ ভারতে উপস্থিত হইয়া ভারতের ভোগ-ঐশ্বর্য্যের আতিশয্য বিমোহিত হইলে স্বতই তাঁহাদের অন্তঃকরণে সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব একান্ত অনুভূত হইয়া উঠিল; এবং তাঁহাদের সরল হৃদয় হইতে ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা সূচক আনন্দ-লহরি স্তববন্দনাদি আপনা হইতেই উছলিয়া উঠিল। ইহাই বেদ। এবং হিন্দুগণ যে স্বভাবত প্রথম হইতেই নিরতিশয় ধার্ম্মিক, ধর্ম্মপ্রিয় এবং ধর্ম্মানুগত, দয়াময় ভগবানের এই অপরিমিত সচ্ছলতাই তাহার মূলীভূত কারণ। নচেৎ সীমাশূন্য সাহারা মরুভূমি কিম্বা অনন্ত সাগর বেষ্টিত নবজাত ক্ষুদ্র দ্বীপবাসি মনুষ্যগণ,যাহারা উদর পোষণে অনবরত বিব্রত, বাসার্থ মৃত্তিকা গহ্বরের জন্য বন্য-পশুদের সহিত বিবাদে রত, এবং যাহাদের নয়নের দৃষ্টি-সীমার মধ্যে ঈশ্বরের নির্ম্মাণ কৌশলের কিম্বা মনুষ্য-ভোগ্য পদার্থ মাত্রেরও অভাব, তাঁহাদের হৃদয়ে কি প্রকারে অসীম দয়াবান্ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস রূপ ব্রহ্মানন্দ আপনা হইতেই উদিত হইবে; এবং তাহাদের স্বভাবে কি বলিয়াই বা আপনা হইতে ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইবে। যেখানে ভগবান্ প্রকৃতিকে চারু মূর্ত্তিমতী করিয়া সহস্র হস্তে অনন্ত ভোগৈশ্বর্য্য বিতরণ কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন, সেই খানেই তাঁহারই বিস্তারিত হস্তে মনুষ্য হৃদয়ক্ষেত্রে বপনার্থ ভগবানের প্রতি বিশ্বাস এবং ধর্ম্মের বীজ অবস্থান করিতেছে। আর্য্যগণ বিনা পরিশ্রম লব্ধ সেই অসীম ভোগৈশ্বর্য্য মধ্যে অবস্থান করিয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ও প্রতিভার বলে সেই সকল সম্যক প্রকারে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য অল্পায়াসেই সেই আদিম অবস্থাতেই শিল্পকর্ম্মাদির পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, হিন্দুগণ প্রথমেই শস্যোৎপাদনের উপকরণ অর্থাৎ হলাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বস্ত্র বিভূষিত হইয়াছিলেন এবং বাসার্থ গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই অতীব

পুরাতন বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যেরা সেই প্রথমাবস্থাতে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি ঐশ্বরিক আংশিক শক্তি সকলের আরাধনা এবং স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন; অর্থাৎ শস্যোৎপাদন সূত্রে ঐহিক সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাই তখনকার ধর্ম্মচর্চ্চা।

আর্য্য প্রজাপতিগণ সর্ব্বাগ্রে পরাক্রান্ত মনুকে, ভারতের অনার্য্য জাতির ক্ষত হইতে রক্ষা হইবার উদ্দেশে "ক্ষত্র" রূপে বরণ করিয়াছিলেন, এবং আপনাদের ব্রাহ্মণ নাম চলিত রাখিয়াছিলেন। হিন্দুদের বর্ণভেদের এই প্রথম সূত্রপাত। তাহার পর সর্ব্বজ্ঞ মনু যখন দেখিলেন যে, ভারতে অপরিমিত সুলভ সামগ্রীর নৈসর্গিক কারণ প্রভাবে আর্য্যগণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবলতা লাভ করিল এবং উন্নতির সোপানে দ্রুত বেগে আরোহণ করিতে লাগিল, তখনই রাজ্যের মঙ্গলার্থ আর্য্যগণের বর্ণবিভাগ, সমাজ সংগঠন এবং আশ্রম নির্দ্দিষ্ট করা অনিবার্য্য বলিয়া তিনি তাহা নিষ্পন্ন করিলেন। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উন্নতমনা, সর্ব্বদা পঞ্জাবের সুরম্য সপ্তনদীর তীরে অমৃতময় বেদের আনন্দময় গানে প্রতিনিয়ত নিযুক্ত, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণবর্ণে, বলবিক্রম বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অনার্য্য জাতির দৌরাত্ম্য নিবারণ এবং রাজ্য বিস্তার কার্য্যে, ক্ষত্রিয় বর্ণে, কতক লোককে কৃষিকার্য্যের বহুলবিস্তার, বাণিজ্য বর্দ্ধনে এবং ধনসঞ্চয়ে রাজ্যের বলস্তম্ভ স্বরূপ, বৈশ্যবর্ণে, এবং আশ্রিত ও পরাজিত অনার্য্যগণকে তিনবর্ণের সেবার্থ শূদ্রজাতিতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন।* এবং অভিনব প্রস্ফুটিত মানব হৃদয়োচিত পবিত্র ধর্ম্মের ভিত্তিতে হিন্দুর সমাজ এবং তৎসম্বন্ধে যাবতীয় বৈধ প্রণালী অতি সুন্দরভাবে সংগঠন করিলেন। সেই কালই হিন্দুদের সত্যযুগ। অতএব মনু আর্য্যগণকে বর্ণবিভক্ত করিয়া বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাদি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। স্বায়ম্ভুব মনু স্মৃতি রচনা করিয়া মরীচি প্রভৃতি মুনি দিগকে শিক্ষা দেন, তন্মধ্যে মহর্ষি ভৃগুই সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হয়েন, তিনিই মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকে সংহিতা রূপে নিবদ্ধ করিয়া মুনিদিগকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। দক্ষিণদেশবাসি পরশুরাম নামক জনৈক

---

* শূদ্রেরা অনার্য্য কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত একথা বলেন। ন, জী, সং

রাজা মনু-সংহিতা পুস্তকাকারে সঙ্কলন করিয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণে ঐ রাজার একটী অব্দ প্রচলিত আছে, তাহা খ্রীষ্টাব্দের ১১৭৬ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে মান্যবর সর্ প্রসন্ন কুমার ঠাকুর এবং সর্ উইলিয়ম জোন্স্ সাহেব মীমাংসা করেন যে, পুস্তকাকারে মনুসংহিতার বয়ক্রম আজ ৩০৬৫ বৎসর।

কবিকুল কেশরী মহামুনি বাল্মীকি রামচন্দ্রের সমকালীন লোক ছিলেন, কারণ বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া লবকুশের দ্বারা রামচন্দ্রের সমক্ষে গীত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের অধস্তন ৩১ পুরুষ বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত হন। শতবর্ষে চারি পুরুষের জীবনকাল ধরিলে ৩১ পুরুষের জীবনকাল ৭৭৫ বৎসর হয়। কথিত যুদ্ধ আজ হইতে ৩৭০০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, এ কথা উপরে বলা গিয়াছে। এমতে বলিতে পারা যায় যে, আজ হইতে ৪৪৭৫ বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র রাজ্য করিয়াছিলেন, এবং রামায়ণ সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল। যাহাহৌক্ রামায়ণ মনুসংহিতার পরবর্ত্তী গ্রন্থ; কারণ মনুতে রামায়ণের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না, রামায়ণোক্ত শিব ও বিষ্ণু উপাসনার প্রসঙ্গ ও নাই; কিন্তু রামায়ণে মনুর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতেই বর্ণিত হইয়াছে যে, বেদব্যাস চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকময়ী ভারত সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন†। শ্লোকময় মহাভারত পরবর্ত্তী কালের পরিবর্দ্ধিত কলেবর মাত্র। সেই মহাভারতে মনুসংহিতার উল্লেখ ও রামায়ণের ইতিহাস বর্ণিত আছে। অতএব মহাভারত ও রামায়ণ মনুসংহিতার পরবর্ত্তী গ্রন্থ। যাহাহৌক্ চতুর্ব্বেদ, মনুসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুদের আদিম কালের গ্রন্থ এবং আদিম ধর্ম্মশাস্ত্র। এবং জগতের যাবতীয় লোক রাশির সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলস্বরূপ। তবে এখনকার প্রচলিত আকার বিশিষ্ট পুস্তক মূলগ্রন্থ নহে, ইহা অবিবাদে বলিতে পারা যায়।

যাহা হৌক, মনুর সময় হইতে দ্বাপরের শেষে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের অবসান কাল অতিবাহিত করিয়া তৎপরবর্ত্তী আরও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত, ভারত সকল বিষয়েই সম্যক্ প্রকারে তীব্র বেগে উন্নতির পথে ধাবমান হইয়াছিল। ভারত ধর্ম্ম বিষয়েও সেই সময়ে অন্যান্য সকল বিষয়ের মত সর্ব্বোচ্চ পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এবং উন্নতির চরমাবস্থায় পৌঁছিয়াছিল, এস্থলে ইহাই বক্তব্য মাত্র। দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন উন্নতি উত্তরোত্তর উৎকর্ষতা লাভ করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই উহা স্থগিত হইয়া পড়ে। প্রবল স্রোতের সেই বদ্ধাবস্থা।

কিন্তু স্থগিতাবস্থা অস্থায়ী। হয়, আরো উন্নতির পথে অগ্রসর হও, না হয় অবনতির সূত্রপাত হইবে, এবং ক্রমশঃ বিপরীত দিকে স্রোতের গতি ফিরিবে। অতুল ঐশ্বর্য্য এং সুখ সম্পদ যখন অযাচিত ভাবে লোকের সেবায় নিযুক্ত হইতে লালায়িত হয়, এবং যখন প্রচুর সচ্ছলতার মধ্যে অবস্থান করিয়া যৎ-সামান্য পরিশ্রমে জীবনের আবশ্যকীয় যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ হইতে থাকে, তখনই সেই দেশের লোকরাশি আলস্যপ্রিয় এবং শ্রম-কাতর হইয়া পড়েন। প্রকৃতির নিবিড় অভ্যন্তরে কি অমূল্য রত্নরাজি অবস্থান করিতেছে, সে রহস্যভেদ করিয়া প্রতিনিয়ত নূতন আবিষ্কারের পরিশ্রম সাধনে পরা-ঙমুখ হইয়া পড়েন। কিন্তু শারীরিক অচলাবস্থার সঙ্গে মনের অচলাবস্থা সম্ভব নহে। মন নিশ্চিন্ত কিম্বা বদ্ধাবস্থায় থাকিবার সামগ্রী নহে, সর্ব্বদাই কার্য্যপ্রিয় এবং কার্য্যের প্রতি ধাবমান। শিল্প কিম্বা বিজ্ঞান জগতে মন বিচরণ করিতে না পারিলেই ধর্ম্মপ্রিয় মনুষ্য চিত্ত স্বতই ধর্ম্মজগতে অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত হইয়া পড়ে। এই কারণে ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা-পরিপূর্ণ ভাবতে হিন্দুদের মন তখন, কিসে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে, এইচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দীর্ঘকাল গভীর চিন্তার পর স্থিরীকৃত হইল যে, এই পৃথিবী দুঃখের ও যন্ত্রণার আকরভূমি; দেহ জড়মাত্র এবং অকিঞ্চিৎকর; জড়দেহে আত্মার অববোধ কেবল শুভাশুভ কর্ম্ম জনিত; কর্ম্ম ভোগাশ্রয়; এবং আত্মার উন্নতি ও মুক্তি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ঈশ্বর চিন্তায় প্রাপ্য। বেদের অবিরোধী সমস্ত দর্শন ও উপনিষদ্ একবাক্যে এই সত্য সংস্থাপন করিল। এই প্রকারে হিন্দুধর্ম্ম এতাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়া পড়িলে, হিন্দুরা ক্রমশঃ কার্য্যজগতে অনাস্থা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়া উঠি-লেন, এবং সম্যক্ প্রকারে নিশ্চেষ্ট, উদ্যমহীন এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন; মনের স্বাভাবিক মহৎ তেজ যখন অন্যান্য সকল বিষয়ে এইরূপে অস্ত-মিত হইল, তখন অগত্যা হিন্দুচিত্ত কল্পনা ও সাহিত্যের দিকে ধাবিত হইল। সম্মুখে সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত মহিমা পূর্ণ মহান্ গৌরবান্বিত কীর্ত্তি সকল, সাধারণ লোক-হৃদয় কথিত প্রখর দর্শন শাস্ত্রের যুক্তিবীজ ধারণে অক্ষম, কাজেই দার্শনিক সূত্র অবলম্বনে অথবা সাহিত্যের পুষ্টি সাধনে অনন্ত কল্পনা ক্ষেত্রের সৃজন করিলেন। ইহারই ফলে আমাদের অসীম সমুদ্র সম পুরাণশাস্ত্র, যোগবাশিষ্টের জ্ঞান কাণ্ড ও কর্ম্ম কাণ্ডের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে গোলযোগ, এবং গীতার জগদ্বিখ্যাত পুঙ্খানুপুঙ্খ বাদানুবাদে যোগ-

ধর্ম্মের অদ্বিতীয় মীমাংসা। আবার কালক্রমে মূল ধর্ম্ম বহুভাগে বিভক্ত এবং শাখা প্রশাখায় ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত হইল, হিন্দুগণ অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন; এমন কি গণনা করিয়া হিন্দু সংখ্যা সম্প্রদায়ের স্থির করিবার উপায় পর্য্যন্ত থাকিল না। বস্তুতঃ বিংশ কোটি লোকের ধর্ম্মালোচনার জন্য হিমালয় সদৃশ একটী সীমাশূন্য ধর্ম্ম-গ্রন্থের স্তূপ হইয়া পড়িল, এবং বিংশ কোটী লোকের উপাসনার জন্য তেত্রিশ কোটী হিন্দু দেবতা স্থিরীকৃত হইল। আর হিন্দুরা যেন কতই দুর্ব্বৃত্ত! দুরন্ত হিন্দুকে সংসারে যাবতীয় বিষয় হইতে নিশ্চেষ্ট রাখিয়া পরকাল চিন্তায় এবং পরমার্থ তত্ত্বে নিরতিশয় আবদ্ধ রাখিতে এত নিয়ম এত পদ্ধতি এবং এত শাসনবাক্য অবধারিত হইল যে, আকাশের তারকারাজি কিম্বা সমুদ্র তটের বালুকা কণা বরং একদিন গণনা করা যাইতে পারে, তথাপি এ সকল গণনা করিয়া স্থির করা যাইতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাতেও এখনো হিন্দুর তৃপ্তি নাই, এখনো প্রতিদিন নূতন নূতন দেবদেবী এবং নূতন নূতন মন্ত্রতন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে।

আদিম কালে হিন্দুর ধর্ম্মভিত্তিতেই হিন্দুর জাতিবিভাগ। সংস্থাপন কালে তাহা যতই মঙ্গল বিধান করিয়া থাকুক, এখন উহা কি ভয়ানক অমঙ্গল ও অনিষ্টের হেতু, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। ধর্ম্মের অনুরোধেই হিন্দু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বৈরীভাব। অতএব বলিতেই হইবে যে, হিন্দুর অমৃত ময় ভ্রাতৃস্নেহবিশিষ্ট একজাতিত্ব হিন্দুর ধর্ম্মানুরোধে বিধ্বংসিত। ধর্ম্মের অনুরোধেই হিন্দুর জীবনের অবসান। অন্যদিকে হিন্দুর দেশহিতৈষিতা স্বার্থে পর্য্যবসিত। ধর্ম্মবিষয়ে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের নিজকল্পিত স্বত্বের অপ্রতিহত প্রভাব রক্ষা করিতে গিয়া ক্রমে লোকরাশির শাস্ত্রপাঠ এবং শাস্ত্রস্পর্শ পর্য্যন্ত নিষেধ করিলেন; অমোঘ ব্রাহ্মণ বাক্যই তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত শাস্ত্র-স্থানীয় করিয়া দিলেন; এবং ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞাই তাঁহারা পশুবৎ প্রতিপালন করিবেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। ফলত স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই বিদ্যালাভেও বঞ্চিত হইয়া পড়িল। অতএব আর্য্যগণ ভারতাগমন করিলে আদি কালে যে সনাতন ধর্ম্ম সরস্বতী-তীরে উদিত হইয়াছিল, মধ্যকালে বদরিকাশ্রমে তীব্র তেজ প্রদান করিয়াছিল, অবশেষে নৈমিষারণ্যে স্নিগ্ধকর হইয়াছিল, আজ সেই পবিত্র ধর্ম্ম প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন হইয়া অস্তমিত হইল। শাস্ত্রে অন্ধবিশ্বাস

এবং কুসংস্কার এই অন্ধকারের ফল। দেবানুকূল দেশে ধর্ম্মের পরিণাম এইরূপ।

সর্ব্ব-সুপ্রতুল কারিণী কামধেনু ভারত ভূমি কোন দেশের নিকট কখনই ঋণী এবং কাহারো মুখাপেক্ষিণী নহেন। এই অহঙ্কারে ভারতবাসিগণ চিরদিনই স্ফীত এবং অন্ধ হইয়া আছেন; এবং এই জন্যই পার্শ্ববর্ত্তী প্রতি-বেশী দেশ সমূহের সহিত কখন কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই। সে সকল দেশাভ্যন্তরে সংসারের যাবতীয় অত্যাবশকীয় বিষয়ে উন্নতির তীব্র বেগের এবং তাহাদের জাতীর ক্ষমতার পরিমাণ যে কত উচ্চ হইতেছিল, তাহার কোন সংবাদই তাঁহারা কখনই লইতেন না। হিন্দুর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, পার্শ্ববর্ত্তী দেশবাসিরা বর্ব্বর, বন্য এবং অনার্য্য জাতি. অনন্তকালেও তাহাদের কোন বিষয়েও কোন উন্নতি সম্ভব নহে, অতএব হিন্দুরা তাহা-দের প্রতি নিরতিশয় ঘৃণা ও তাচ্ছল্য প্রকাশ করিতেন, এবং তাহাদের কোন আন্দোলনে হিন্দুরা কর্ণপাত করিতেন না। এই কারণে হিন্দুদের নৈসর্গিক ঘটনা-পরিদর্শন-ক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং সহানুভূতি প্রবৃত্তি সেই পরিমাণে ক্ষীণ হইয়াছিল। ফলত ভারতকেই সমগ্র ধরামণ্ডল কল্পনা করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। এই জন্যই ভারতে প্রবাদ যে পৃথিবী ত্রিকোণা। হিন্দুরা ভাবিতেন যে, তাঁহারাই মনুষ্য এবং অপর সকলেই পশু, তাঁহারাই পবিত্র এবং অপর সকলেই অস্পৃশ্য এবং ম্লেচ্ছ; এই কুসংস্কার যখন তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল, তখন পার্শ্বস্থ মুসলমানদের রাজ্য সিন্ধুনদের পরপার হইতে আট্‌লান্‌টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রকৃত ধরামণ্ডলের অর্দ্ধাংশে, বিস্তীর্ণ হইয়াছে, এবং তাহাদের ধর্ম্মের অর্দ্ধচন্দ্র কেতন সেই সীমাশূন্য ভূভাগে অপ্রতিহত ভাবে উড্ডীয়মান হইয়াছে। এ দিকে আমাদের পুরাণকর্ত্তাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ-তত্বজ্ঞ প্রত্যাদিষ্ট ও ভগবদভিপ্রায়-বক্তার অভাব ছিল না। তাঁহারা শাস্ত্রে লিপীবদ্ধ করিয়াছেন যে, ম্লেচ্ছ-কর-কবলিত হওয়া ভারতের অদৃষ্টলিপী, অখণ্ডনীয়। শাস্ত্রবাক্য অমোঘ। শাস্ত্রে হিন্দুর অন্ধ বিশ্বাস। ফলত হিন্দুরা নিরুৎসাহ, ভগ্নহৃদয়, হইয়া যুদ্ধবৃত্তি পরিচালনে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। গিজনির মামুদ এই কারণে ক্ষত্রিয় গণকে পরাভূত করিলেন। এই কারণে বক্তিয়ার খিলিজি ১৬ জন মাত্র মর্কটাকৃতি তুরষ্ক সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া বিনা কণামাত্র শোণিত পাতে, বঙ্গদেশকে চিরদিনের জন্য ম্লেচ্ছপদ-দলিত করিলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সেন শাস্ত্রের গৌরব রক্ষায় আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। অতএব ভারতের পরাধীনতা ও অধঃপতনের কারণ যিনি যাহাই বলুন, আমরা নির্ভয় চিত্তে অবশ্য বলিব যে, হিন্দু শাস্ত্র এবং শাস্ত্রে অন্ধ বিশ্বাসই এই সর্ব্বনাশের কারণ। অথবা হিন্দুর অসাধারণ প্রতিভা—এবং ধর্ম্মতত্ত্বই হিন্দুর পরম শত্রু।

মুসলমান অধিকারে যবনান্নে, যবন-তরবারে, এবং যবন-দৌরাত্মে অনেক হিন্দুকে মুসলমান হইতে হইয়াছে, এ কথা সত্য বটে; কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মচর্চ্চা, শাস্ত্রপ্রণয়ন, দেবদেবী-আবিষ্কার এবং সম্প্রদায় সৃষ্টি—যথা বিধানে চলিয়াছিল ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। বৈষ্ণবদের গ্রন্থাবলি এবং শাক্তদিগের তন্ত্র সকলের অভ্যুদয় এই কালে। বৈষ্ণবদের সম্প্রদায় বিভাগ এই কালে। এবং এই কালেই মুসলমানের সত্যপীর, সত্যনারায়ণ হইয়া এবং ওলাবিবি ওলাইচণ্ডী হইয়া হিন্দুদেবীর শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। লোক মধ্যে বিদ্যার বিমল জ্যোতি তাদৃশ ভাবেই নিরতিশয় অভাব; এদিকে শাস্ত্রে অন্ধবিশ্বাস সেই রূপ অপ্রতিহত। পুরাতন গ্রীক্‌দিগেরও অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণের যে কারণ নির্দ্দেশ করেন, পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া যে পরিভ্রমণ করেন, পৃথিবী যে নিরাধার ও গোলাকার এবং আপন নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রাম্যমান, এসকল কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া পুরাণের কুসংস্কার তাঁহাদের হৃদয়ে একান্ত বদ্ধমূল;—অর্থাৎ রাহু, চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করিয়া গ্রহণ উৎপাদন করেন, পৃথিবীর অবস্থান বাসুকি-মস্তকে, পৃথিবী ত্রিকোণ বিশিষ্ট, সূর্য্যদেব স্বর্ণরথে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে বিচরণ করেন এবং পর্ব্বত কন্দরে রাত্রে নিদ্রা যান, ইত্যাদি।

তাহার পর ইংরাজের লোক-বিমোহন রাজ্যশাসন ভারতে প্রবর্ত্তিত হইলে, হিন্দুর ধর্ম্মজগতে আবার এক নূতন মহাবিপ্লব উপস্থিত হইল। সত্য বটে, ইংরাজ প্রশস্ত হস্তে বিনা বর্ণবিচারে বিদ্যা বিতরণ করিতে থাকিলে, হিন্দুর চির কুসংস্কার-পরিপূর্ণ তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীন চিন্তার পবিত্র আলোক সঞ্চারিত হইল। সত্য বটে, শূদ্রেরা পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতির স্বাভাবিক স্বত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণারোপিত অন্যায় অবরোধ সতেজে ভগ্ন করিয়া হিন্দুশাস্ত্র-সাগরে প্রবেশ পূর্ব্বক পাশ্চাত্য বিদ্যাবলে শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ আবিষ্কারে কৃতসংকল্প হইলেন। সত্য বটে, হিন্দু জড়ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরাধীন অবস্থায় যতদূর সম্ভব সংসারের যাবতীয় কার্য ক্ষেত্রে চিত্তকে

বিচরণ করিতে নিযুক্ত করিলেন ; এবং সত্য, বটে ভারতের ভাবি মঙ্গলাশা ক্ষণপ্রভার ন্যায় লোকের হৃদয়ে সমুদিত হইল ;—কিন্তু ইংরাজের ধর্ম্মচর্চ্চার পরিপাটী বন্দোবস্তর লোভটা অনুকরণপ্রিয় হিন্দুরা কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের চিরাবদ্ধ ধর্ম্মচর্চ্চার অপ্রতিহত তেজ পুনরুদ্দীপিত হইল, কিন্তু এবার ধর্ম্মচর্চ্চা নববিধানে। অর্থাৎ সমস্তই মৌখিক। সমস্তই ভণ্ডামির রাজভাণ্ডার। মৃত রাজা রামমোহন রায় পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়া কালক্রমে বহুল যত্নে যে প্রশস্ত বৃক্ষটী উৎপাদন করিয়া গিয়াছিলেন, কালে কেশববাবু সেই রাজ-যত্ন-প্রতিপালিত বৃক্ষে বাইবেলের অনুকরণে সাহেবী ধরণে এক পরগাছা তুলিয়া দেন। পরগাছার নাম "উন্নত", কিন্তু পরগাছে ফল ধরিতে না ধরিতে বাবুর কন্যার বিবাহের ঝড়ে গাছটী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। সেই সময় হরিনাম-সংকীর্ত্তনের অনুকরণে খোলবাজানো ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচলিত হয়। মূলগাছে এবং পরছায় জোড় মিলাইয়া নূতন ধরণের দুইটী কলমের চারা প্রস্তুত হয়। এই চারার চারা তস্য চারা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং প্রবল প্রবল বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে; অনেক নাবালকের দল সেই সকল গাছে চড়িয়া ফল ভক্ষণ করিতেছেন। এদিকে হরিসভার ছড়াছড়ি এতদূর হইয়া উঠিয়াছে যে, সভা স্থাপনের স্থান পর্য্যন্ত পাওয়াই কঠিন। হরিসভার মূলমন্ত্র হরিনাম। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" এই মহাবাক্য লোকের বদন হইতে অনর্গল নির্গত হইতেছে। সভার সভ্য ও শ্রোতাদের ধ্রুব বিশ্বাস এই দাঁড়াইয়াছে যে, যতই কেন পাপ কর না, একবার হেলায় শ্রদ্ধায় হরিনাম করিলেই সকল পাপ কাটিয়া যায়। থিয়েটরওয়ালাদেরও ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবারও কসুর নাই : খেম্‌টারনাচের সঙ্গে হরিনামের ঢেউ তুলিয়া আবালবৃদ্ধবনিতাকে মাতাইয়া তুলিতেছেন ; এবং সুন্দরী বেশ্যাদের কৃষ্ণচৈতন্য সাজাইয়া ভগবানের প্রকৃত রূপরাশি দেখাইয়া লোকের মনকে ধর্ম্মের দিকে টানিতেছেন। নাটক রচয়িতারা হরিগুণানুবাদ ভিন্ন আর নাটক লেখেন না। নাটকের সমস্ত রস্‌কস্ এক হরিনামে। গিরীশ বাবু ও রাজকৃষ্ণ বাবুর নাটকই এখন হিন্দুশাস্ত্র। অপর দিকে সংবাদপত্র চিরদিনের স্থাপিত ব্রত পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে মতি দিয়াছেন। সাময়িক পত্রে ধর্ম্মচর্চ্চা ও শাস্ত্রালোচনা ভিন্ন অন্য প্রবন্ধ প্রায় দেখা যায় না। মাথামুণ্ড ব্যাখ্যা, আধ্যাত্মিক অর্থ আবিষ্কার, রূপকচ্ছেদ এবং রহস্যভেদ তাঁহা-

দের একমাত্র ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নূতন নূতন ধর্ম্মপত্রিকা নিত্য নিত্য প্রকাশ হইতেছে। আর এক দিকে একদল যোগী বড়ই মাথা তুলিয়া উঠিয়াছেন। ঘাটে মাঠে, পথে প্রান্তরে পরিস্কার পরিধেয়োত্তরীয়-সুশোভিত সেই যোগীবর সকল। রেলের গাড়িতে, ট্রামকারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যোগীরা আসন করিয়া বসিয়াছেন, এবং চাদর চাপা দিয়া যোগ সাধন করিতেছেন। ইঁহারা মৃগচর্ম্ম মহার্ঘ করিয়া তুলিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্লীহা, যকৃৎ, বহুমূত্র, অর্শ প্রভৃতি রোগের যোগী, আর অনেকেই সুরাদেবী প্রসাদাৎ। যে শূদ্র দৈবাৎ একটী 'ওঁ' বলিলে আপনাকে মহাপাপী জ্ঞানে মনস্তাপে মরিতেন, আজ তাঁর ইড়া ও পিঙ্গলা আর জড়াজড়ি করিয়া থাকে না, এবং তাঁহার উদর মধ্যে প্রণব অনবরত মেঘবৎ হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। এই যোগীদের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় যে, জগত সমস্তই অনিত্য, দেহ কিছুই কিছু নহে, আমার কিছুই নহে, ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহার একগাছি তৃণ গ্রহণ কর অমনি তিনি খড়্গাহস্ত। কেহ তত্ত্বমসির দোহাই দিয়া কখন কখন স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান হইয়া বসিতেছেন। গোয়ালার ছেলে 'চ্যা চোঁ' ছাড়িয়া যোগ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যোগশিক্ষা দিতেছেন। কর্ম্মকার ভায়া একলক্ষ টাকা পাইলে সূর্য্যমণ্ডলস্থ বৈরাজ পুরুষকে দেখাইয়া দিতে বিজ্ঞাপন দিয়া প্রতিশ্রুত। কাশীর জনৈক স্ত্রীপুত্রওয়ালা বাবুযোগী পঞ্চ মুদ্রা এনটারেনস্ ফি লইয়া যাহাকে তাহাকে এক কথায় যোগী করিয়া দিতেছেন, এবং শিষ্যের চক্ষু অবরোধ করিয়া পরম জ্যোতি দেখাইয়া দিতেছেন। কোন কোন নব্য যোগীর ক্ষমতা এত দূর হইয়া উঠিয়াছে শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা স্ত্রীলোকের সহিত চক্ষে চক্ষে কিছুক্ষণ চাওয়াচায়ি করিয়া বন্ধ্যার ক্রোড়ে সন্তান সমর্পণ করিতেছেন। ইঁহাদের এক প্রস্থ ঔষধ আছে ; শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাহা সকল রোগেই খাটে, কিন্তু যোগী দেহ ভিন্ন অন্য দেহে খাটে না। ডাক্তার বাবু বিলাতি ঔষধের দ্বারা কোন যোগীবরের গঙ্গাযাত্রা বন্ধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সংস্কার যে, কোন ভ্রাতৃযোগীর প্রদত্ত জলপানে তিনি রোগ মুক্ত। এই যোগীরা হিন্দুশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ কদাপি গ্রহণ করেন না। গ্রন্থ যাহাই হোক্, যাবতীয় গ্রন্থের যাবতীয় ব্যক্তিগণের নামের আধ্যাত্মিক অর্থ আছেই আছে, ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় সংস্কার। অক্ষয় বাবুর গ্রাবু খেলার আধ্যাত্মিক অর্থের ন্যায়, ইঁহারা সমস্ত মহাভারত খানার মায় ঐতিহাসিক

নাম সকলের আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিয়াছেন। এই দলের কোন মহা-যোগী সম্প্রতি মনুসংহিতার একখানি আধ্যাত্মিক অর্থের পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। মনুতে ব্রহ্মাবর্ত্তের ও আর্য্যাবর্ত্তের সীমা বর্ণন, টীকাকার কুল্লুকভট্ট ও মেধাতিথি যে অর্থে ভারতের যে স্থানকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আজ তাহা ভ্রম হইয়া পড়িয়াছে; ইনি বলিয়াছেন, উহা যোগীদের অমুক অমুক স্থান মাত্র; অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অর্থ। মহাভারত রামায়ণের সঙ্গে বোধ হয় এবার মনুও যান। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, শাস্ত্র আলোচনার গোলযোগটী এবার কিছু গুরুতর। সর্ব্বজ্ঞ ভগবানই জানেন, এ স্রোতের পরিণাম কোথায়? তবে আমাদের ভয়, না জানি ভারতবর্ষের অদৃষ্টে শাস্ত্রে আরো কি বিষম বিভ্রাট সঞ্চিত আছে।

ভগ্ন-প্রণয়।

নিশীথে নীদের ঘোরে স্বপনে নিরখি তোরে,
জাগিল পূর্ব্বের স্মৃতি হৃদয়ে আবার!
পুন তপ্ত অশ্রুবিন্দু মথিয়া বিষাদ সিন্ধু
বিশুষ্ক নয়ন সিক্ত করে অনিবার!!
সেই দিন সেই দেখা মুছাই বিষাদ রেখা
দেখামাত্র একবার দেখিলাম চোখে!
বিরহ শয্যায় শুয়ে মাটীতে মাথাটী থুয়ে
ভাবিয়া সেদিন আজ ভাসিতেছি শোকে!
সেই হাসি ফুল্ল মুখে বিজলী খেলিয়ে সুখে
ফুটাইলে হৃদে মোর ভাল বাসা-ফুল!
না মিটিতে মন সাধ ভাঙ্গিলে প্রেমের বাঁধ
চলে গেলে তুমি মোরে করিয়া আকুল!!

সেফুল্ল কমল মুখ স্মরিলে বিদরে বুক
হরিণ নয়নে সেই প্রেমের চাহনি !!
সেই যেতে যেতে ধীরে কত যে কহিলে ফিরে
ভাবিতে এখন তাহা হৃদে দংশে ফণি।
বিস্তৃত বকুল তলে সেই বসে কুতূহলে!
দাঁড়ায়ে সঙ্গিনী কাছে হাসি মাখা মুখে!
শাখী গায় পাখী গুলি সুস্বর লহরী তুলি!
তরুরে ব্রততী বাঁধে আলিঙ্গনে বুকে !!
মৃদুল অনিলে ধীরে ফুটে কলি তরু শিরে,
মধুলোভে চারিদিকে মধুকরগুঞ্জে!
হেরি অবসান বেলা সাঙ্গ দিনেশের খেলা
কুমুদ ভাতিল নীরে তাই পুঞ্জে পুঞ্জে !!
নলিন মলিন মুখে মদিল নয়ন দুখে!
সুদূর গগণে চাঁদ চাহে উঁকি দিয়ে !!
বলে—"আর কি ভাবনা? প্রেমে কোথা প্রবঞ্চনা?
পেয়েছি তোমারে এবে কুমুদিনী প্রিয়ে!
"যাও ভানু অস্তে যাও নলিনীর মাথা খাও!
সারা নিশি বাস মম নীরদের কোলে!
বৃথা কেন কর রোষ সময়ে সবারি তোষ!
প্রভাতে আমিও পড়ি এইরূপ গোলে !!'
বিদ্রূপে দিনেশ হায় ক্রোধে আরক্তিম কায়!
রক্ত-বৃষ্টি হল যেন নেত্র দিয়ে তাঁর,
কচিপাতা সাদা সিধে সে জ্যোতি ধরিল হৃদে
সরল প্রাণের এক অদ্ভুত ব্যাপার !!
সে জ্যোতি ও মুখে প্রিয়ে হেরি তৃপ্ত হল হিয়ে,
ভাবিলাম মনে হয়ে হরষে বিভর!
বৈজয়ন্ত মনো লোভা মন্দার কুসুম শোভা
এর চেয়ে সুষমায় নহেত সুন্দর !!
উত্তপ্ত কাঞ্চন সম তনুরুচি মনোরম!
শিল্পীর নৈপুণ্য তায় কতই প্রকাশ!

পদ্মের পরাগ ছানি বিরলে বদন খানি !
গড়েছে চতুর বিধি লয়ে অবকাশ !
কি আর বলিব প্রিয়ে যার হৃদি বিদারিয়ে !
সহস্র বৃশ্চিক তায় দংশে অনিবার !
বিস্তৃত নিরাশা মরু নাহি রে আশ্রয় তরু !
বিরহ তপন তাপে তপ্ত চারিধার !
শুষ্ককণ্ঠ এ পথিক নাহি জ্ঞান দিগ্বিদিক !
শ্রান্ত পিপাসিত সেই মরু মাঝে চলে !
প্রেম পুণ্য পয়োধির বিশুদ্ধ সুশীত নীর !
ভ্রান্তিতে পড়েছে তবু মরীচিকা-ছলে !!
নিরখি বদন তোর কিদশা ঘটেছে মোর !
নাহি দিতে পরিচয়, না মিটিতে সাধ !
তুমিত আমারে ফেলে সচ্ছন্দে চলিয়া গেলে !
আমারি ঘটিল সাধে বিষম বিষাদ !!
অ রে ভালবাসা তোর একি রে বিষম জোর !
তোর গুণে হয় কত অসাধ্য সাধন !
পাষাণে তরঙ্গ ছোটে শুস্কগাছে ফুল ফোটে,
নীরস জীবনে হয় প্রেমের সিঞ্চন !
তাইত তাহারে দেখে গিয়েছি বিষম ঠেকে,
দুর্ব্বল মানস মোর হয়েছে পাগল।
হেরিয়ে নশ্বর রূপ মুগ্ধ-মন এইরূপ !
রূপ-সাগরের একি সামান্য হিল্লোল !!
এই যে চাঁদের হাসি সুগন্ধ কুসুম রাশি,
বিচিত্র বিমানে শোভা-জলধর দল !
পল্লবিত তরু চয় মলয় অনিল বয়,
তর তর করে যত তটিনীর-জল !!
নলিনী ফুটিছে নীরে উড়িছে মধুপ ধীরে !
ফুল্ল কুমুদিনী ঘুমে মুদিতেছে আঁখি !
তরুণ অরুণ উঠে আঁধার পলায় ছুটে ;
বিহঙ্গের কলকণ্ঠে আরাবিত শাখী !

শিশু জননীরে পেয়ে যেতেছে কোলেতে ধেয়ে,
অর্দ্ধস্ফুট স্বরে পুন ডাকে "মামা" বলে!
সে স্বর শুনিয়া কাণে পাগল জননী প্রাণে!
দেহ ছাড়ি শোক তাঁর যায় দূরে চলে!
ওই যে রমণী মুখ যা দেখি ভুলিল দুখ,
এসব সৌন্দর্য্য হায় যাঁহার সৃজন!
রূপের সাগর তিনি যোগীন্দ্র মানস-মণি,
সে মোহনরূপে এবে মুগ্ধ হও মন!!
ফের ভালবাসা স্রোত ভেঙ্গে ভেল অবরোধ,
নশ্বর পার্থিব রূপে চল ত্যজি যাই,
হেরি গে বিশ্বের ভূপ অনন্ত যাঁহার রূপ!
সে রূপসাগরে গিয়ে এরূপ মিশাই!
ছাড় মন ছাড় ভ্রান্তি পাইবে অপূর্ব্ব শান্তি,
এ তটিনী ধরে চল সাগর সঙ্গমে!
পাবে পূর্ণ ভালবাসা মিটিবে প্রণয় আশা,
এ ভগ্নপ্রণয়ে আর মরিবে না মরমে!!

আখিরা-গ্রাম
রামপুর হাট-পোষ্ট।

শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
আখিরা-গ্রাম

ভারতে দাস ব্যবসায়ের ইতিহাস।

ইতিহাস পাঠকেরা ইংলণ্ড এবং আমেরিকার দাস ব্যবসায়ের কথা অনেক পাঠ করিয়াছেন, অনেক জানেন। কিন্তু পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতে যে দাস ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, ও এখনও পূর্ব্ব বাঙ্গলায়, আসামে এবং ভারতের অপর কোন কোন স্থানে একরূপ ভাবে প্রচলিত আছে, অনেকে তাহা জ্ঞাত নহেন। ভারতে কিরূপ ভাবে দাস ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, ও ইংলণ্ড এবং আমেরিকার দাস ব্যবসায়ের সহিত ভারতের দাস ব্যবসায়ের প্রভেদ কি, এই প্রবন্ধে তাহার কিছু পরিচয় দিব।

ইংলণ্ডে উইলবরফোস যে সময় তথাকার দাস ব্যবসায় লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন, সেই সময় ভারতের দাস ব্যবসায়ের কথা, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদিগের প্রথম কর্ণগোচর হয়; ডিরেক্টরদিগের মধ্যে অনেক উইলবরফোস, ক্লার্কগণ, বাক্সটন প্রভৃতি দাসত্ব উচ্ছেদকারীদিগের বন্ধুও ছিলেন, কিন্তু সে সময় কোম্পানি একে আপন ব্যবসা বাণিজ্য লইয়া ব্যস্ত, তাহাতে এদেশ সম্বন্ধে তখন তাঁহাদিগের জ্ঞান অতি অল্পছিল, এই সকল কারণে তখন এসম্বন্ধে বিশেষ কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ হয় নাই। ১৮৩২ সালে কোম্পানি ভারতে বাণিজ্যের এবং ভারত শাসনের নিমিত্ত যে, নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন, (Charter Act of 1832) তাহাতে এই দাস ব্যবসায় সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ থাকে ও যাহাতে শীঘ্র বিনা গোল যোগে এই নিষ্ঠুর ব্যাপার রহিত করা হয়, তজ্জন্যও উপদেশ প্রদত্ত হয়। পরে এই সম্বন্ধে ডিরেক্টরদিগের সহিত কোম্পানির (ভারত গবর্ণমেণ্টের) আরো লেখা লেখি চলে।

এই সকলের ফলে ১৮৩৫ সালের ১৫ই জুন ল কমিসন নামে কমিসন বসে, তৎকালিক গবর্ণমেণ্টের আইন প্রণেতা মেকলে সাহেব এই কমিসনের সভাপতি হইয়া কার্য্যারম্ভ করেন। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা, বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী এবং সিংহলের বিচার বিভাগের বিজ্ঞ সিবিলিয়ানগণ ইহার সভ্যের কাজ করেন। ভারতে ফৌজদারী আইন (Indian Penal Code) লিপিবদ্ধ হইবার এই প্রথম সূত্রপাত। এই কমিসনে এদেশীয় দাস ব্যবসায় ও দাসদিগের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক চিঠি পত্র কমিসনের সভ্যদিগের হস্ত গত

হয়, সেই সকল চিঠিপত্রের দ্বারা এদেশীয় দাসদিগের সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ কমিসনরের গোচর হয়, তাহা পাঠ করিয়া কমিসনের সভ্যেরা এই সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান লইয়া স্বতন্ত্র আইনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই সকল চিঠিপত্রের লিখিত বিবরণ সত্য বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া, আর স্বতন্ত্র অনুসন্ধানের অনুমোদন করেন নাই।

পরে এই সম্বন্ধে এক রিপোর্টের নিমিত্ত ১৮৩৯ সালে ল কমিসন উদ্যোগী হন; ১৮৪১ সালের ১৩ই জানুয়ারি এক প্রকাণ্ড পুস্তকাকারে এই রিপোর্ট বাহির হয়। এই রিপোর্টে সমগ্র ভারতের জজ, মাজিষ্ট্রেট ও পলিটিকাল কর্ম্মচারীদের সাক্ষ্য, মতামত, সরকারী, বেসরকারী লোকের সাক্ষ্য, দাস ব্যবসায়ী সাক্ষ্য ও অনেক দাসের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হয়। এতদ্ভিন্ন ইহাতে এ দেশের প্রত্যেক বিভাগের সবিশেষ বিবরণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাসন কালে দাস ব্যবসায়ের বৃত্তান্ত ও আরো আরো অনেক প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় বিষয় ইহার অন্তর্নিবিষ্ট থাকে।

সে সময় সমগ্র ভারতে কত ক্রীত দাস ছিল, যদিও তাহার ঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই, তথাপি যেরূপ হিসাব দেখা যায়, তাহাতে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ইংরেজদিগের উপনিবেশ সমূহে যত দাস ছিল তাহার অপেক্ষা ভারতের দাস সংখ্যা যে অধিক ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কমিসনের গড় হিসাবে আশী হইতে নব্বই লক্ষের ভিতর বোধ হয়। ১৮৩৪ সালের ১লা আগষ্ট ইংরেজেরা আপন দেশে ও উপনিবেশ সমূহে যে দাসদিগকে মুক্ত করিয়া দেন, তাহার সংখ্যা আট হইতে দশ লক্ষের ভিতর, এবং ১৮৬০ সালে আমেরিকায় যে সকল ক্রীতদাস স্বাধীনতা লাভ করে, তাহার মোট সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ, সুতরাং উভয় দেশে পঞ্চাশ লক্ষের অধিক নয়, কিন্তু একা ভারতে আন্দাজী হিসাবে তাহা অপেক্ষাও ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ অধিক; হিসাবটা পাকা হইলে আরো কিছু বাড়া অসম্ভব নয়। এক বাঙ্গালায়, যদিও সমুদায় সংখ্যার ঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই, তথাপি এক অষ্টমাংশ, এক ষষ্ঠাংশ, এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ, এমন কি কোন কোন জেলায় অৰ্দ্ধেক লোকও এই শ্রেণীস্থ বলিয়া হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় যে আটচল্লিশটি জেলার হিসাব লওয়া হইয়াছিল, তাহার সকল গুলিই এইরূপ সংখ্যায় একটা না একটার অন্তর্গত। ১৮৩৯।৪০ সালে এই হিসাব গ্রহণ করা হয়। তখন বাঙ্গালায় এখন কার মত

অন্ন কষ্ট উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং সকল ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবার মধ্যেই এইরূপ দাস রাখা প্রথা প্রচলিত ছিল। সে সময় প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত জমিদারেই দুই শত, আড়াই শত, তিন শত বা আরো অধিক সংখ্যা দাস রাখিত; এই শ্রেণীস্থ পরিবার মধ্যে কাহারও কাহারও প্রত্যেকের জন্য এক হইতে কুড়ি জন পর্য্যন্ত দাস নিযুক্ত থাকিত। এস্থলে মনে রাখা উচিত, এখনকার ন্যায় তখনকার জমিদারদিগের এত ভগ্ন দশা উপস্থিত হয় নাই।

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে অনেক জমিদার এক এক রাজার ন্যায় ক্ষমতার সহিত জমিদারী করিয়া গিয়াছেন। তখনকার অনেক জমিদার যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, এখন হায়দ্রাবাদের নিজাম, ভূপালের বেগম, গোয়ালিয়োর ও ইন্দোরাধিপতিরও ইংরাজানুগ্রহে সে ক্ষমতা নাই। বাঙ্গলায় প্রায় সকল জমিদার ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা প্রধানত কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত এই সকল দাস সংগ্রহ করিতেন। এই সকল কৃষিজীবী জমিদারদিগের মধ্যে কোন কোন জমিদার কৃষিকার্য্যের জন্য দুই সহস্র করিয়া দাস প্রতিপালন করিতেন, এইরূপ জমিদার সংখ্যাও প্রায় আড়াই শত ছিল। এক্ষণে বাঙ্গলায় যে সকল ইতর জাতীয় কৃষিজাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের অনেকের পূর্ব্বপুরুষ এই দাস শ্রেণীর অন্তর্গত।

বাঙ্গালার সহিত উত্তর পশ্চিম ও মধ্য ভারতের দাসদিগের এই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখনকার ভদ্রলোকেরা যেমন প্রধানত কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত দাস সংগ্রহ করিত, তথাকার ভদ্রলোকেরা ইহার পরিবর্ত্তে গৃহকর্ম্মের নিমিত্ত দাস প্রতিপালন করিত। অতি অল্প সংখ্যক লোকেই চাষ বাসের জন্য দাস ক্রয় করিত। আর বাঙ্গালার সহিত আরও প্রভেদ এই, এখানে যেমন তৎকালে ভদ্রলোক মাত্রেই অল্প বিস্তর দাস ক্রয় করিত, ও সকল স্থানে তাহার পরিবর্ত্তে কেবল বড় বড় সহরের লোকেই দাস রাখিত।

ইংলণ্ড এবং আমেরিকার দাসদিগের সহিত এদেশের দাসদিগের এই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় যেমন কেবল কাফ্রী এবং আদিম আমেরিকানদের ধরিয়া আনিয়া জোর করিয়া দাস করা হইত, ও তাহার একটা রীতি মত ব্যবসা চলিত, এ দেশে ঠিক সেরূপ ভাবে দাস ব্যবসায় চলিত না। অনেক স্থলেই দাসেরা আপন প্রয়োজন বশত বা পুরুষাণুক্রমিক

চলিত নিয়মানুসারে অনেকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক এই দাসখৎ লিখিত। তবে একবারে যে চুরি করিয়া ধরিয়া আনয়ন ব্যাপার ছিল না, তাহা নহে, তবে ইহার তুলনায় তাহার সংখ্যা অতি যৎসামান্য। আমরা এ স্থলে দাসদিগের শ্রেণী বিভাগ করিয়া একটা তালিকা প্রদান করিলাম, ইহাতে সকলে বুঝিতে পারিবেন, এ দেশে কয় শ্রেণীর দাস ছিল, ও কোন শ্রেণী কোন সূত্রে দাসত্বে আবদ্ধ হইত।

১ম শ্রেণী। দুর্ভিক্ষ বা অপর কোন প্রকার কষ্টে পড়িয়া পিতামাতা অর্থের অনাটনে আপন সন্তানকে কিছু অর্থ লইয়া প্রদান করিত, যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ করিত, সে চিরকাল তাহারই অনুগত হইয়া চলিত, ও তাহার সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত হইত।

২য়। বেহার অঞ্চলে মাতা বা মাতৃপক্ষ কর্ত্তৃক সন্তান বিক্রয় হওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহাও যে প্রতিপালনে অক্ষম হওয়া প্রযুক্ত তাহার সন্দেহ নাই।

৩য়। স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রী বিক্রয়। সচরাচর নীচ জাতীয় লোকের স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস জন্মিলে বা বিবাদ বিসম্বাদ হইলে এই কাজ করিত। এখনও বিলাতের ছোট লোকেরা মদের জন্য স্ত্রী বিক্রয় ও বন্ধক দিয়া থাকে।

৪র্থ। কুমাউণ প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলে পরিবারস্থ বিধবা স্ত্রীলোক দিগকে প্রতিপালনে অক্ষম হইলে তাহার পুত্র বা যাহার উপর তাহার প্রতি-পালনের ভার পড়িত, সে তাহাকে বিক্রয় করিত।

৫ম। দুর্ভিক্ষ কালে বা অর্থের প্রয়োজন হইলে অনেক লোক আপ-নাকে আপনি বিক্রয় করিত। ইহারা সুবিধা হইলে বিক্রয়ের মূল্য ফেরত দিয়া খালাস হইত। ইহা এক প্রকার আপনাকে বন্ধক দেওয়ার ন্যায় ছিল, ইহার লেখা পড়া ও রসিদ থাকিত। এই প্রকার দাসই যে কষ্টে পড়িয়া সেচ্ছা-ক্রমে দাসত্ব স্বীকার করিত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইংরেজদিগের দেশস্থ দাসের সহিত এই দাসদিগের কোন সংশ্রব নাই, তাহা সকলে বুঝিতে পারিতেছেন। এই প্রথা এখনও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। এই পাঁচ প্রকার ছাড়া কমিসন আর পাঁচ প্রকার দাসের এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করেন।

১ম। অপরাধী দাস। কোন কোন রাজা অপরাধী বিশেষকে দাস শ্রেণী ভুক্ত করিয়া লইতেন, ইহা দিগকে পুরুষাণুক্রমে রাজ অধীনে কাজ করিতে হইত।

২ য়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে বহুকাল প্রচলিত একপ্রকার দাস ছিল, এই দাসগণ ভারতের আদিম অধিবাসীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারা বিজিত হইয়া অবধি দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। ইহারাই বোধ হয় ভারতের আদিম দাস জাতি। শেষে, ইহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা যাইবে।

৩ য়। বিবাহাদি সূত্রে দাসত্বে বদ্ধ। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোক বা পুরুষ বিবাহ সূত্রে বা প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া দাসের সহিত সহবাস করিত; সেই সহবাস জনিত সন্তানেরা প্রভুর অন্নে পালিত হইয়া তাঁহার দাস শ্রেণী মধ্যে গণিত হইত।

৪ র্থ। পূর্ব্বে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল হইতে আরব বণিকেরা বালক বালিকা ও যুবা দাস আমদানী করিত। কলিকাতা এই শ্রেণীর দাস বিক্রয়ের এক সময় আড্ডা ছিল। ইহাদের পুরুষদিগকে প্রায় খোজা করিয়া আনা হইত, ও সম্ভ্রান্ত ধনী মুসলমান, নবাব ও দিল্লীর সম্রাটের নিকট ইহাদিগকে বিক্রয় করা হইত। এই দাসদিগের বিষয় অনেকে জ্ঞাত থাকিতে পারেন। ইহাদিগকে হাবসী গোলাম ও স্ত্রীলোক দিগকে বাঁদী বলিয়া ডাকা হয়। ইহারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সাহসী বলিয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকেরা জানিতে পারেন, এই হাবসী গোলামগণ কেহ কেহ ক্ষমতাপন্ন হইয়া বাঙ্গালার সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ছিল। বোধ হয়ত, এই শ্রেণীর দাসদিগের মধ্যে অনেককে চুরি করিয়া আনা হইত।

এই চারি শ্রেণী ভিন্ন আর এক শ্রেণীর কথা উল্লেখে, ল কমিসন তাহাদিগকেও দাস শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহাদিগকে যদিও চুরি করিয়া আনা হইত, কিন্তু ইহাদিগকে দাস শ্রেণীর অন্তর্গত করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

বালিকা চুরি করিয়া আনিয়া সহরের অসৎসম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদিগকে বা যাহারা নৃত্য গীতের ব্যবসা করে তাহাদিগকে বিক্রয় করা হইত। ইহা এখনও ভারতের সকল স্থানে অল্প বিস্তর চলিত আছে ও এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা ধরা পড়িলে এখন ছেলে ধরা (Kidnapper) বলিয়া সাজা পাইয়া থাকে। এরূপ মোকদ্দমার সংখ্যাও বড় কম নয়। ইহা ছাড়া পূর্ব্বে ঠগেরা ছেলে চুরি করিয়া দলভুক্ত করিত, কিন্তু তাহারা বিক্রয়ের ব্যবসা করিত না। ঠগেরা অনেকে একটি বালকের জন্য এক একটা পরিবার নষ্ট করিয়া

ফেলিত। তবে অনেকে ঠগীদের বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ব্যবসা চালাইত। এই সকল বালকেরা বড় হইয়া ঠগী ব্যবসা আরম্ভ করিত, কিন্তু ইহাদিগকেও ঠিক দাস শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে আমরা আসল কথা বলিব। ইংরেজদিগের দাস ব্যবসায় উঠাইবার মূল কারণ, দাস প্রভুরা তাহাদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিত বলিয়া। আর আজ কাল আসামের কুলী লইয়া যে এত আন্দোলন চলিতেছে, তাহারও মূল কারণ এই অত্যাচার, নহিলে কেবল লোক ঠকাইয়া আনিয়া কুলি দলে প্রবিষ্ট করাইলে, আজ কখন এত আন্দোলনের রব উঠিত না; ও এই অত্যাচার না থাকিলে আজ ইংলণ্ড এবং আমেরিকার দাস ব্যবসায়ও অটুট থাকিত। এক্ষণে ভারতীয় দাসদিগের প্রতি তাহাদিগের প্রভুরা কিরূপ ব্যবহার করিত একবার দেখা যাউক। এ দেশীয় ক্রীতদাসদিগের অবস্থা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত ল কমিসন স্থানীয় জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজ কর্ম্মচারীদিগের যে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, তাহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার ন্যায় এ দেশের প্রভুরা আপন দাসদিগের প্রতি (অতি নিষ্ঠুর লোক ছাড়া) কখন কোন প্রকার অত্যাচার করিত না। আর অত্যাচারী নিষ্ঠুর প্রভুর সংখ্যা অতি অল্প ছিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত এ দেশের প্রভুদের এই প্রভেদ ছিল, তাহারা ব্যবসার জন্য দাস সংগ্রহ করিত, ক্রীত দাসেরা তাহাদের পণ্য দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত, আর এ দেশের প্রভুরা সকলেই আপন প্রয়োজনের নিমিত্ত দাস রক্ষা করিত। তদ্ভিন্ন ইংরাজ ও এ দেশীয় সমাজের মধ্যে রীতি নীতির এমন একটা পার্থক্য আছে, যাহাতে সেই রীতি নীতির বশবর্ত্তী হইয়ায় একজন এ দেশের লোক অত্যন্ত নির্দ্দয় পাষণ্ড হইলেও একজন ওই দলের ইংরাজের তুলনায় তাহার অন্তর নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হইবে। অপেক্ষাকৃত আর শুদ্ধ ভারতবাসী কেন এসিয়া বাসীগণ যে তাহাদের দাসদিগের প্রতি ইংরাজ এবং আমেরিকানদের অপেক্ষা চিরকাল অধিকতর সদয় ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, ইংরাজদিগের মুখেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ল কমিসনের রিপোর্ট দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশীয় দাসদিগের প্রতি তাহাদের প্রভুরা তাহাদের বেতন ভোগী ভৃত্যদিগের ন্যায় সম ব্যবহার করিত এবং অনেক স্থলেই ইহারা প্রভুদিগের নিকট বেতন ভোগীদিগের অপেক্ষা সদ্ব্যবহার পাইত, কমিসন তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। এই

সকল দাসেরা প্রভুদিগের নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইত ও ব্যামোহ ব্যারামে চিকিৎসিত হইত; এ সম্বন্ধে প্রভুদিগের তাচ্ছল্যের কথা কমিসনের রিপোর্টে উল্লেখ নাই বরং ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে ইতর জাতীর গরিব লোক বেতন ভোগী দাসদিগের অপেক্ষা সুখে সচ্ছন্দে থাকিবার নিমিত্ত, বিবাহের ব্যয় এড়াই বার নিমিত্ত, এবং বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য অবস্থায় অন্নের সংস্থানের নিমিত্ত অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক এই দাসত্বে আপনাকে বাঁধা দিত বা বিক্রয় করিত। কারণ দাসপ্রভুরা সমস্ত জীবন খাটাইয়া অকর্ম্মণ্য ও বৃদ্ধাবস্থায় তাহাদের অন্নের একটা সংস্থান না করিয়া, কখন তহাদের তাড়াইয়া দিত না, ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে বৃদ্ধ দাসের একটা অন্নের সংস্থান করিয়া দিতে হইত, নতুবা সমাজে তাহার বড় নিন্দা হইত; এখনকার মত তখন সমাজের নিন্দার ভয়কে কেহ অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইত না। আর এক কথা, এই সকল দাস দিগকে বিক্রয় করিবার, ভাড়া দিবার বা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা তাহাদের প্রভুদের হস্তে থাকিলেও সহসা তাহাদিগকে কেহ বিক্রয় করিত না, করিলে বড় নিন্দা হইত; বরং অবস্থা হীন হইলে অনেকে দাসদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন করিয়া দিত তথাপি লোক নিন্দার ভয়ে বিক্রয় করিত না। আর ইহাদিগের প্রতি যে বড় একটা নিষ্ঠুর ব্যবহার হইত না, তাহার আর একটা প্রমাণ এই, এই সকল দাসেরা কোন প্রকারে যদি কিছু উপার্জ্জন করিত, তাহা হইলে হিসাব মত সেই উপার্জ্জিত অর্থ তাহার প্রভুর হইত, কিন্তু কমিসনের রিপোর্টে দেখা যায়, প্রভুদের প্রায় কেহই এই অর্থ গ্রহণ করিতেন না, ইহা তাহাদিগের থাকিত। আর দাসদিগের প্রতি অত্যাচার করিলে তাহার প্রতি রাজদণ্ডেরও বিবিধ ব্যবস্থা ছিল। মোটের উপর এ দেশীয় ক্রীতদাসদিগের অবস্থা ইংলণ্ড ও আমেরিকার ক্রীতদাসদিগের অপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল ছিল, এবং বেতন ভোগী ভৃত্যদিগের অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা মন্দ ছিল না। সকলের অবগতির নিমিত্ত কমিসনের মন্তব্যের আমরা ইংরাজি অংশ টুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"The food, clothing, and lodging provided for slaves by their masters were not worse than those of the free labourer."

"On the whole, the commissioners consider that the system of Indian slavery was usually of a very mild character, the slaves having frequently a better lot than the hired servant."

এ দেশে যে রীতিমত একটা ক্রীতদাসের ব্যবসায়ের প্রথা ছিল না, কেবল লোকে আপন কার্য্যের জন্য দাস রাখিত, ও দাসদিগের প্রতি তাহাদের প্রভুরা অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতেন তাহার আর একটা প্রমাণ, আইন দ্বারা পঞ্চাশ বৎসর মাত্র যে এত বড় একটা গুরুতর নিষ্ঠুর অত্যাচার জনক ব্যাপার বন্ধ করা হইয়াছে, সেই ব্যাপারটা অনেকেই জ্ঞাত নহেন। এমন কি, আধুনিক যে সকল সুশিক্ষিত লোক এ দেশ সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন বৃত্তান্ত ইতিহাসাদিতে জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও এ দেশে যে এক সময় দাস ব্যবসায় নামক একটা নিষ্ঠুর ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, অতি অল্প লোকেই তাহা জ্ঞাত আছেন। দ্বিতীয় এ দেশের কোন প্রাচীন পুস্তকে এ সম্বন্ধে কিছু মাত্র উল্লেখ নাই, যদি প্রকৃত পক্ষে একটা ভীষণ নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কোন গ্রন্থেই কি তাহার উল্লেখ থাকিত না? তৃতীয়, যদি প্রকৃত পক্ষে ইহার একটা ব্যবসা থাকিত, তাহা হইলে যে ইংরাজকে বিশ কোটি টাকা দিয়া স্বদেশের, ও অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পর আমেরিকার দাস ব্যবসায় উঠাইতে হইয়াছিল, যদি এ দেশে ইহার রীতি মত একটা ব্যবসায় থাকিত, তাহা হইলে কি ইংরাজ, কেবল মুখের কথায় তাহা উঠাইতে সক্ষম হইতেন, এ সম্বন্ধে কি দাস-প্রভুদিগের পক্ষ হইতে কোন একটা আপত্তি উঠিত না? ক্রীতদাসদিগের প্রতি তাহাদের প্রভুরা যে সদ্ব্যবহার করিতেন, তাহার আর একটা প্রমাণ এই, এসিয়া খণ্ডের লোকের একটা প্রধান গুণ এই যে, যাহাকে নিজস্ব বলিয়া জানে, তাহার প্রতি তাহার মায়া মমতা, স্নেহ স্বাভাবিক অধিক হয়, তাহাকে তাহারা আপন পরিবারের অন্তর্গত মনে করে, তাহার প্রতি যদিও কখন ক্রোধ পরবশ হইয়া কোন নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তাহাও কেবল তাহাকে আপনার ভাবে বলিয়া। বেতন ভাগী দাসদিগের অপেক্ষা এই শ্রেণীর দাসদিগকে তাহাদের প্রভুরা অধিক আপনার জ্ঞান করিত, সুতরাং ইহাদের প্রতি ইহাদের প্রভুরা যদিও কখন কোন অসদ্ব্যবহার করিত, তাহা হইলেও তাহা যে ইংরাজ ও আমেরিকানদের মত নহে, ইহা দৃঢ় করিয়া বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে ল কমিসনের মেম্বরেরা কি বলেন দেখুন; The punishment for misconduct which masters considered they had the right of infliction were usualy as a father would inflict on his child, or a master on his apprentice." যদি কাহারও কোন দাস একান্ত অবাধ্য

হইত, বা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইত, তাহা হইলেও তাহার প্রভু তাহাকে দূর করিয়া দিত "The turning of a slave away, and so, depriving him of his masters protection, is mentioned occasionally as a pun ishment for incurable vice and obstinacy, the general treatment could not in such cases have been very severe. প্রভুদের এরূপ কার্য্যে দাসদিগেরই দুঃখ হইত, তাহারা স্বাধীন হইয়া অপর এক স্থানে আপনাকে বাঁধা দিয়া বা বিক্রয় করিয়া দাস খৎ লিখিত। তথাপি ইংরাজদিগের এমনি দয়ার শরীর, এ দেশের এই প্রথাটাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবিয়া আইন দ্বারা তাহা উঠাইয়া দেশের অনেক ইতর জাতীয় গরিব দুঃখীলোক যাহারা দুবেলা দুমুঠা অন্নের চিন্তায় এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিল, তাহাদের সেই বাড়া ভাতে ছাই দিলেন।

এই ক্রীতদাসদিগের বিবাহের কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি, প্রভুদিগকে এই বিবাহের ভার বহন করিতে হইত। বাঙ্গালার এই বিবাহের মধ্যে একটু মজা ছিল, সেটা স্ত্রী দাসীর বেলা। আমাদের দেশে যেমন অনেক মেয়ের বাপকে ঘর জামায়ে বর পালন করিতে হয়, তেমনি এই ক্রীত দাসীদের প্রভুদের কাহারও কাহারও ভাগ্যে ঘর জামায়ে দাস জুটিত, অনেক অলস নিষ্কর্ম্মা লোক একবারে আট দশটা এইরূপ দাসীকে বিবাহ করিত, জমাই বাবু পায়ের উপর পা দিয়া জেল হাঁসপাতালের মত বিনা শ্রমে দুই বেলা আহার পাইতেন, গৃহিণীরা সকলে নিজের নিজের অংশ হইতে সকলে তাহাকে প্রতিপালনকরিত, প্রভুদিগের সহিত এই জামাই বাবুদের কিছু সংস্রব থাকিত না।

মান্দ্রাজ অঞ্চল ও অপরাপর অনেকস্থানে ফরাসীদের বিবাহের ন্যায় অনেকে কণ্ট্রাক্ট করিয়া বিবাহ করিত, মনের অমিল ঘটিলে বা ফরাসীদের ও অনেক ইংরেজদের ন্যায় মনের সাদ মিটিলে, কণ্ট্রাক্ট মত এই বিবাহ অমনি কর্ত্তা গিন্নীতে null and void করিয়া লইত। ইহারা বোধ হয় ইংরাজী আলোক পাইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ দেশের লোক সচরাচর গৃহ কার্য্যে ও চাসবাসের জন্যই প্রায় দাস রাখিত, কিন্তু অনেক স্থলে বিশেষত বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোক দাঙ্গা হাঙ্গামা ও ডাকাতির জন্য এই দাস ক্রয়

করিত, ঐ সকল স্থলের কোন লোকের সহিত তাহার সামান্য বিবাদ উপস্থিত হইলে ইহারা আপন আপন দাসদিগকে দাঙ্গা করিতে নিযুক্ত করিত, উহারা দাসদিগকে শত্রু পক্ষীয়ের শিরশ্ছেদ করিতে স্পষ্ট আদেশ করিত। এই দাঙ্গা হাঙ্গামাতে প্রায় খুন জখম হইত, ও যে দাস যত শত্রু পক্ষ নিপাত করিতে পারিত, সে তত প্রভুর প্রশংসা পাইত। রামগড় অঞ্চলে এই কাণ্ডটার বাড়াবাড়ি ছিল। আসামের অনেকে ডাকাতির জন্য দাস রাখিত। যদি দাসদিগের প্রতি কেহ নিষ্ঠুরতা করিত, তবে সে এই শ্রেণীর প্রভুরা।

প্রবন্ধ অনেক দীর্ঘ হইয়া পড়িল, আরো অনেক বলিবার কথা থাকিলেও আর একটা মাত্র মজার কথা বলিয়া ইহা ইতি করিব। মান্দ্রাজ অঞ্চলে হিন্দুয়ানীর কিছু বাড়াবাড়ির জন্য ক্রীত দাসদিগকে সকলে কিছু বেশী মাত্রায় ঘৃণা করিত, ও তাহাদিগকে এজন্য অনেক আদব কায়দা রাখিয়া চলিতে হইত। তথায় ক্রীত দাসদিগকে অপর লোকদিগের জাতি বিবেচনায় চব্বিশ পদ হইতে বাহাত্তর পদ পর্য্যন্ত পথে ঘাটে অন্তর হইয়া চলিতে হইত। পাছে কোন লোক এই অন্তরে থাকা হইতে সাবধান না হইতে পারে, এই জন্য দাসেরা পথে চলিবার সময়, চারি পাঁচ পা অন্তর এক প্রকার চিৎকার দ্বারা স্বাধীন লোক এবং ভদ্র জাতীয় পথিকদিগকে সাবধান করিয়া দিত। ভদ্রজাতীয় বা স্বাধীন লোকের কোন শিশু সন্তানের বেলাও দাসদিগকে এই কঠিন নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হইত। ছোট রাস্তা হইলে এই দূরত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত দাসদিগকে চলিতে চলিতে এই জন্য সর্ব্বদা পশ্চাৎ পদ হইতে হইত, আর কেবল যে স্বাধীন মনুষ্য ও ভদ্রজাতীয়ের বেলা এই নিয়ম পালন করিলে যথেষ্ট হইত তাহা নহে, ভদ্র পল্লীর ভিতর দিয়া যাইতে হইলেও লোকের গৃহ হইতেও এইরূপ দূরে দূরে চলিতে হইত, পাছে ক্রীতদাসের হাওয়ায় তাহাদের বাটী অপবিত্র হয়। আজ পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে, তথায় শূদ্রদের অবস্থা বড় ভাল নহে, গবর্মেণ্ট আফিসের চাকরি ব্রাহ্মণদের প্রায় এক চেটিয়া।

রামানন্দের ঝাঁপি।

—oo—

সম্পাদকের হোটেল।

নানা গুণে আমি কমলাকান্তকে ভাল বাসিতাম। আফিঙ্গের আবশ্যক হইলে কমলাকান্তের নিকট প্রায় সকল সময়েই ধার পাওয়া যাইত; অনেক সময়ে অমনিও মিলিত। তদ্ভিন্ন কমলের তামাকের বড় সুবন্দোবস্ত ছিল। নশীরামবাবুর বাটীতে অবস্থানকালে কমলাকান্তের মন্দিরে যখনি প্রবেশ করিয়াছি, তখনি দেখিয়াছি, তাহা তাম্রকূটের ধূমে আচ্ছন্ন, আর তাম্বুল, কস্তুরী, একাঙ্গী, আতর গোলাপ প্রভৃতি তাম্রকূটের মশালা-দ্রব্যের সৌরভে সে স্থান আমোদিত। শারদীয়া দুর্গোৎসবে আরতির সময় পূজার দালানে গিয়া ধূপ-ধুনা-গুগ্‌গুল-কর্পূর প্রভৃতির ধূমে ও তদুদ্ভূত সুসৌরভবাহী বায়ু-রাশির মধ্যে বিচরণ করিয়া যত না আনন্দিত হইতাম,—কমলার সে তাম্র-কূটের ধূমাচ্ছন্ন গৃহে গিয়া তাহার অধিক প্রীতি পাইতাম। পূজার সময়ে শঙ্খ-ঘণ্টা-ঢাক-ঢোল প্রভৃতির বাদ্যোদ্যমে প্রাণ যত না নাচিয়া উঠিত,—কমলার গৃহে গড়্‌গড়ার সেই বুড়্‌ বুড়্‌ বুড় বুড়্‌ গম্ভীর জীমূত মন্দ্রে অন্তর ততোধিক নাচিয়া উঠিত। আর তথায় উপাধানে বাহু সংন্যস্ত করিয়া সেই সুদীর্ঘনলসঙ্কুল আল্‌বোলা বা গড়্‌গড়ায় তাওয়া-দেওয়া খাস্‌ খাম্বিরা চড়াইয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে টানিতে টানিতে যখন স্বর্গসুখ উপভোগ করিতাম—আফিঙ্গের মৌতাতটুকু বেশ জমাট বাঁধিয়া আসিত—তখন ভাবিতাম যে, কমলাকান্ত যথার্থই বড় ভাগ্যবান্, তাই এই "অশ্বমেধাযুতং পুণ্যং টানে টানে" লাভ করিতেছে। বল দেখি, এত গুণে কোন্ অহি-ফেন-সেবী না কমলাকান্তকে ভাল বাসিবে?

বাস্তবিক লোকটার নিরুদ্দেশ হওয়ায় আর কাহারও কিছু ক্ষতি না হউক, [illegible] হইয়াছে। সে সরস 'দপ্তরের' লহরও কোথাও মিলে না; সে তামাক-টীকা-গুলের বাহারও কোথাও দেখিতে পাই না। কম-

লাকান্তের ন্যায় সুহৃদ এবং সাধু-সঙ্গ হারাইয়া ও সেই রঙ্গরসের-বুকনি-দেওয়া জ্ঞান-ভরা অমৃতোপম 'দপ্তরের' রসাস্বাদ বিহীন হইয়া সংসার নিতান্ত বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে কান্‌ব্যাস্‌-ব্যাগ্‌টীতে তল্পী-তল্পা পূরিয়া ঠন্‌ঠনিয়ার চটী জোড়াটী পায়ে দিয়া মল্‌মলের উড়ানি খানি স্কন্ধে ফেলিয়া, নানাবর্ণের বহুতালি সংযুক্ত পৈত্রিক ছাতিটী মাথায় দিয়া বাহির হইলাম। অভিপ্রায়—একবার কমলার খোঁজ করিব। কমলার দেখা কোথা পাইব ?

ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রিটিশ-রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অন্যত্র বিশেষ পরিচয়ের অভাবে, পরিচিতের বাস-স্থানের সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে, এক হোটেল বা Messএ গিয়া মিশিলাম। দেখিলাম, Mess যথার্থই এক Regular Mess ! দিব্য পবিত্রস্থান—দ্বিতীয় জগন্নাথ ক্ষেত্র বলিলেও চলিতে পারে !

এই জগন্নাথ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া কমলার কথা ভাবিতে ভাবিতে অন্য মনে একদা মাত্রা বাড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম! তখন সেই মেশের শ্মশান ক্ষেত্রে পতিত থেলো-হুকাটী (আহা! তবুও তাহা অন্তর্লোলরস ও কত মনোমুগ্ধকরী!) কুড়াইয়া আনিয়া অল্পে অল্পে তাহার মুখচুম্বন করিতে করিতে নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল। দিব্য চক্ষে তখন অকস্মাৎ দেখিতে পাইলাম যেন,—সমস্ত সংবাদ ও সাময়িক পত্রের আফিসগুলি এক একটী হোটেল হইয়া দাঁড়াইয়াছে! পাঠক বা গ্রাহক সম্প্রদায় তাহার মেম্বর :—সম্পাদকগণ মেসের ম্যানেজার (অধ্যক্ষ)। হোটেলের অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য—প্রত্যেক মেম্বরের নিকট হইতে মাসিক খরচ আদায় করিয়া প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহারের যোগাড় করিয়া দেওয়া। সম্পাদকের কার্য্য—গ্রাহক-গণের নিকট হইতে মূল্য আদায় করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে পত্রিকা প্রেরণ করা। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে—কি মেম্বর, কি গ্রাহক—উভয় দলই ক্রোধে আরক্ত-লোচন হন। তবে তাহার উপর যদি ভোজনের ভালরূপ বন্দোবস্ত থাকে, তাহা হইলে মেম্বরদের সে রাগ অনেকটা উপশান্ত হইতে দেখা যায়। পত্রিকাতে প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য ও মনোরম হইলে গ্রাহক বা পাঠকও কাগজের অল্প বিলম্বজনিত দোষ বড় একটা মনে করেন না।

এক একটী প্রবন্ধ এক একটী ব্যঞ্জন স্বরূপ। আমার বোধ হয়, মাংস ও মৎস্যের তরকারী—উপন্যাস। উপন্যাস নহিলে পত্রিকার আদর নাই—

পত্রিকা চলেও না। মাছের তরকারী দেয় না—এরূপ হোটেল কেহ দেখিয়াছ? তবে বঙ্কিম, রমেশ প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাস কিছু সকলেই সকল সময়ে দিতে পারেন না। পাঁটা কিম্বা পাকা রুই মিরগেল ভেট্‌কী মাছও সকল হোটেলে বা সকল সময়ে জুটে না; কচি পোনা ও বাটাতে অনেকেই কায সারে। হরিদাস, তারক বিশ্বাস প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাসই প্রায় সকল কাগজে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে সকল হোটেলে কেবল বাগ্‌দা চিঙ্গড়ী খাওয়ায়, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, সেখানে কোন ভদ্রলোক খান না। "মদন মোহনের" ন্যায় উপন্যাস যে কাগজে থাকে, তাহার কোন ভাল পাঠক নাই।

দাল—পদ্য। দাল একটা আবশ্যক আহার্য্য। পদ্যও কাগজে থাকা চাই। তবে আজকাল বঙ্গদেশে কেরাণীর সংখ্যা ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়াতে প্রায় সকলেই পেট-রোগা হইয়া পড়িয়াছে। তাই মুগের দালই সকলে খাইতে চায়। নাচনীছন্দের বাক্যমাত্রসার কচি পদ্যেরই আদর বেশী। অরহর দালের কেহ বড় একটা আদর করে না, কেন না হজম করা কঠিন। তাই সারবান্ হইলেও কোন হোটেলে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। মেঘনাদ বধ, বৃত্র সংহার, দশমহাবিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় লেখার বিশেষ আদর দেখা যায় না—মর্ম্ম বুঝাও বুঝি কঠিন। তবে রবিঠাকুরের ন্যায় সোনামুগের দাল, সুসিদ্ধ ও ভাল রন্ধন হইলে খাইতে মন্দ লাগে না—মুখরোচকও বটে। তবু কোন কোন ডাক্তার (সমালোচক) বলেন,—ইহার সারভাগ অল্প। কিন্তু আজকাল সোনামুগের অনুকরণে 'অশ্বমুগ' বলিয়া যে এক প্রকার দালের আমদানী হইয়াছে,—তাহার না আছে স্বাদ, না আছে সৌরভ। অধিকাংশ হোটেলে এই দালেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়; তাহাও না কি আবার, অনেক সময় শুনিতে পাই, ভাতের মাড়-মিশানো!

পল্‌তার ঝোল, নিম্‌ঝোল বা শুক্তানি—ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক প্রবন্ধ। খাইতে ভাল লাগে না বটে, কখন কখন মুখরোচক; কিন্তু সকল সময়েই বড় উপকারী। কে কবে দেখিয়াছ, সাধু, সদ্‌বুদ্ধিমান্ অথবা ভীষণ-তরঙ্গ-সঙ্কুল-বৈতরণী-ভয়-ভীত লোক ভিন্ন ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ পড়িতে চায়?

দাল্‌না—আলঙ্কারিক লেখা (Ornamental writing)! সকল হোটেলে বা সকল পত্রিকাতে সকল দিন পাওয়া যায় না। কিন্তু পাওয়া গেলে গরম-মসলার গন্ধে একরূপ মন্দলাগে না।

চাট্‌নি—রঙ্গরস বা রহস্য (Wit and Humour)। ইহা বড় হোটে-লেই এক আধটু রাখিয়া থাকে; অন্যত্র মিলিবার সম্ভাবনা অল্প। বঙ্কিম বা * * * * ন্যায় চাট্‌নী প্রস্তুত করিতে সকল কাগজ জানে না। তবে চাট্‌নীর পরিবর্ত্তে একটা খাট্টা বা অম্বল অধিকাংশ হোটেলে পাওয়া যায়; তাহা যেমনি টক্‌, তেমনি অম্লরোগোদ্দীপক; সকল কাগজেই কখন কখন এক আধটু রঙ্গরস বা তাহার বিকার 'অম্বল' থাকে বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই শ্রুতিকটু অথবা কুরুচি-উদ্দীপক।

এই সকল হইতে স্বতন্ত্র একটা তরকারী সকল হোটেলেই দিয়া থাকে, এবং তাহাই হোটেল সকলের "জান"। ইহার অপর কোন ভাল নাম না থাকাতে ইহাকে "গোলাম-ঘণ্ট" বলিয়াই অভিহিত করা হয়। এই গোলাম-ঘণ্টের ন্যায় হাব্‌জা-গোব্‌জাপূর্ণ বাজে লেখার দ্বারাই অধিকাংশ পত্রিকা আজকাল পূর্ণ থাকে। এবং তাহার দ্বারাই পাঠক গণকে 'নিজগুণে কৃপা করিয়া' একরূপ উদরপূর্ত্তি—শ্রীবিষ্ণু—পাঠেচ্ছানিবৃত্তি করিতে হয়।

ভাজা, ভাতে, পোড়া প্রভৃতিগুলিও বাজে তরকারী। সুতরাং তাহা-দের বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজনাভাব!

হোটেলের অধ্যক্ষরূপী সম্পাদকগণ এইরূপ নানাবিধ প্রবন্ধ-ব্যঞ্জনদ্বারা তাঁহাদের হোটেল বা পত্রিকা চালাইতেছেন ও খরিদ্দার বজায় রাখিতেছেন। সকলেরই ইচ্ছা অল্পখরচায় কাগজ-হোটেল চালাইবেন। এই উদ্দেশ্য সাধ-নার্থে অনেক সম্পাদক শস্তাদরে রাজ্যের ঝোড়ো পেঁপে, জোলো পটল ও শস্তার মূল্যে আনিয়া খরিদ্দারের কেবল গোলামঘণ্ট খাওয়াইতেছেন। আমিস উপন্যাসের বেলাতেও 'কোঁকড়া-রুই' ওরফে "Lobster বা বাবা লোক"! বলা বাহুল্য যে, এরূপ হোটেল কোন সুখ্যাতিই কিনিতে পারেন না। ভাল ভাল খরিদ্দার অল্পদিনেই ভাগিয়া পড়েন। আবার এমন খরি-দ্দারও আছেন, যাঁহারা ভাল খাইতে পাইলেও কিছুদিন এক হোটেলে খাইয়া তাঁহাদের নিকট প্রাপ্য টাকার জন্য তাগাদা করিলেই অন্য এক হোটেলে গিয়া উপস্থিত হন। এইরূপ খরিদ্দার হইতেই অনেক হোটেলও অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়! কিন্তু আজকাল এরূপ এক সম্প্রদায় হোটেলকারীও দেখা দিয়াছেন—যাহারা খরিদ্দারের নিকট হইতে নানা প্রলোভন দেখাইয়া অগ্রিমমূল্য আদায় করেন ও ২।৪ দিন খাওয়াইয়া তার পর অকস্মাৎ এক

রাত্রি যোগে গা-ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়েন! এইরূপ প্রবঞ্চক ব্যবসাদার হইতেই অনেক ব্যবসা মাটী হইয়া গিয়াছে!

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম,—পটলডাঙ্গার এক হোটেলে বসিয়া কমলাকান্ত খালি নিমভাজা ও পলতার ঝোল দিয়া ভাত মারিতেছে! আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"এ কি, কমলাকান্ত,—এখানে এ কি?"

কমলাকান্ত উত্তর করিল—"আর ভাই! আমাশয় ও ক্রিমিরোগাক্রান্ত হওয়াতে কবিরাজ মহাশয় এইরূপ আহারই আমার পক্ষে পথ্য ও হিতকারী বলিয়াদিয়াছেন। তিনি বলেন—নিম, পলতা, চিরেতা প্রভৃতি তিক্তপদার্থের আশ্চর্য্য ক্রিমিনাশক ক্ষমতা আছে।"

বুঝিলাম, লোকটার নিশ্চই বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। প্রকাশ্যে বলিলাম —"তোমার কবিরাজের ভুল হইয়াছে! তিনি তোমার ধাত ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, তাই এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন। তুমি কি জান না, যে ব্যক্তি কালাচাঁদের প্রেমে নিমগ্ন, তাহার নিকটে যম ঘেঁসিতে পারে না; ক্ষুদ্র ক্রিমি ত ছার পদার্থ! উঠিয়া আইস, আর তোমার পল্‌তার ঝোল দিয়া ভাত মারিতে হইবে না। কেন? আফিঙ্গের অপেক্ষা কি পল্‌তা অধিক তিক্ত? তিক্ত খাইলে যদি ক্রিমির ভয় না থাকে, তবে আফিঙ্গের মাত্রা—"

আমার বাক্য শেষহইতে পাইল না। আফিঙ্গকে তিক্ত বলাতেই কমলাকান্ত ভাত ফেলিয়া ক্রোধ সংরক্ত নয়নে বলিয়া উঠিল,—"কি পাপিষ্ঠ! আমার নিকট আফিঙ্গের নিন্দা? আফিঙ্গ তিক্ত? তুমি পাঁচ ভরি আফিঙ্গ জলে গুলিয়া আমায় দিয়া দেখ, আমি চন্দ্রবদনে রসগোল্লার স্বতারে তাহা এখনি উদরস্থ করিয়া ফেলিব! বৃথায় আমি এতদিন ধরিয়া তোমায় আফিঙ্গ খাওয়াইয়াছিলাম! আজিও আফিঙ্গের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলে না? দূর হও আমার সম্মুখ হইতে, পামর!—"

হঠাৎ উরুদেশে একটা জ্বালাবোধ হওয়াতে চাহিয়া দেখি, হস্তস্থ থেলো হুঁকার কলিকা হইতে (বোধ হয়, কমলার ধমকে চমকিয়া উঠিয়াছিলাম!) একখানি সাগ্নিক টীকা ভ্রষ্ট হইয়া বস্ত্রভেদ করত উরুদেশ পর্য্যন্ত দগ্ধকরিতেছে।

শ্রীরামানন্দ শর্ম্মা।

নীরবে নয়ন-জলে সম্ভাষ আদর!

১

অর্দ্ধভগ্ন হৃদে ভেসে নয়নের জলে,
নীরবে দুজনে যবে হনু ছাড়াছাড়ি,
দোঁহে দোঁহা একযোগে বহু দিন তরে;
তখনি কপোল তব মলিন শীতল,
শীতল শীতলতর চুম্বন তোমার,
এ দুখের পূর্ব্বাভাস বলে ছিল মোরে।

২

তরুণ উষার সেই শিশিরের কণা
বিধে ছিল কপোলেতে তীক্ষ্ণ বাণ সম,
তখনি তা বুঝেছিনু পূর্ব্বাভাস বলে,
এখন যা অনুভবি সদা অন্তস্তলে;
প্রতিশ্রুতি সব তব ভেঙ্গেছে এখন,
যশোগীতি যত তব হয়েছে বিলয়;
তোমার মধুর নাম শুনি লোকমুখে,
লাজে মরি লোকে যবে তব নিন্দা করে।

৩

লোকে যবে তব নাম করে মোর আগে,
সমাধি-ঘটিকা ধ্বনি সম বাজে কাণে,
অমনি যে শিহরিয়ে উঠে মোর দেহ;
কেন তুমি ছিলে মম এত প্রিয়তম?
জানে না তাহারা, আমি জানি যে তোমায়,
জানার মতন জানা জানিত যেজন!
নীরব গভীর ভাবে আজীবন তরে,
কাঁদিবে তোমার লাগি এপরাণ মম।

৪

নিরজনে সংগোপনে মিলেছি দু'জনে,
নীরবে কাঁদিছি তাই ভেবে মনে মনে,

ভুলিবারে পারে মোরে তোমারো হৃদয়,
ছলনা করিতে জানে তোমার অন্তর !
কে জানে কখন যদি বহুদিন পরে
দৈবযোগে চারি চোখে হয় সম্মিলন,
কেমনে করিব আমি অভ্যর্থনা তব ?
নীরবে নয়ন জলে-সম্ভাষ আদর !

(Lord Byron)

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

মধুর হরিনাম কে শুনিবি আয় !
বাহু তুলি গৌর ঐ ডাকিছে সবায় ॥
কিবা সুন্দর গৌরবরণ, পূর্ণচন্দ্র শোভা সুবদন,
আলোময় শ্রীঅঙ্গ আভায়।
প্রভু ভক্তি অবতার, কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণভক্তি করেন জগতে প্রচার,
অদেয় দুর্লভ ভক্তিধন সামান্য জীবে বিলায় ॥
কিবা দুঃখী কিবা ধনী, কিবা মূর্খ কিবা জ্ঞানী,
সকলের ত্রাণের উপায়, (হরিনাম)
বাহুতুলি গৌর আমার, ডাকি সবে বলেন বারে বার,
ভক্তি বিনে ভজন পূজন যোগ যাগ সকল অসার,
ভক্তি পথে খোলা পাবি মুক্তির দুয়ার,
দাঁড়ায়ে নগর-বাসী বল কেন আর ?
ত্বরা করি এসো সবে মিছে মায়ায় দিন বয়ে যায়।

নবজীবন

৫ম ভাগ। } অগ্রহায়ণ, ১২৯৫। } ২য় সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

(৪৪ সূত্র)

সমালোচন। সূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি বলিলেন "ইহাদ্বারাই সবিচার এবং নির্ব্বিচার সমাপত্তির ব্যাখ্যা করা হইল," আমরাও যদি ঐ কথা বলিয়া সূত্রান্তর আরম্ভ করি, তা হইলে "হরিবোল হরি" বলিয়া পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত ঐ খানেই পাঠ শেষ করিবেন, সুতরাং আমাদের কিঞ্চিৎ বাক্যব্যয় আবশ্যক হইতেছে। "ইহা দ্বারাই" সবিচার এবং নির্ব্বিচার সমাপত্তির কিরূপ ব্যাখ্যা হইল, তাহা ঠিক বুঝান যাউক বা না যাউক, বুঝাইবার চেষ্টা করা উচিত হইতেছে। এই কথাটি বুঝিতে হইলে একবার "বিতর্ক, বিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ" (১৭ সূ, ১ অ,) এই সূত্রটির উপর দৃষ্টি করা উচিত। এই সূত্রে বলিয়াছে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চার প্রকার :—বিতর্কানুগত, বিচারানুগত, আনন্দানুগত এবং অস্মিতানুগত ; তাহার মধ্যে ;—বিতর্কানুগত স্থূলবিষয়ালম্বী, বিচারানুগত সূক্ষ্ম বিষয়ালম্বী ইত্যাদি। সেই স্থূল বিষয় আশ্রয় কারী বিতর্কানুগত সমাধির আবার দুই প্রকার অবস্থা হয় ;— (১) সবিতর্কসমাপত্তি, (২) নির্ব্বিতর্কসমাপত্তি। সবিতর্কসমাপত্তি কিরূপ এবং নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তিই বা কিরূপ ইহা পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইল। তাহার পর সূত্রকার বলিলেন ইহাদ্বারা সবিচার এবং নির্ব্বিচারসমাপত্তির কথা বলা হইল অর্থাৎ স্থূল বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান করত চিত্তের যেরূপ অবস্থা হইলে সবিতর্ক সমাপত্তি হয়, সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান করত সেইরূপ অবস্থা হইলে সবিচার সমাপত্তি বলে এবং স্থূল বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান করত চিত্তের যেরূপ অবস্থা হইলে নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি হয়, সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন

করিয়া সেইরূপ অবস্থা হইলে নির্ব্বিচার সমাপত্তি হয়। সবিতর্কের সহিত সবিচারের সর্ব্বাংশেই তুল্যতা,—কেবল আলম্বনীয় স্থূল, সূক্ষ্ম ভেদ; সেইরূপ নির্ব্বিতর্কের সহিত নির্ব্বিচারের সর্ব্বাংশেই তুল্যতা,—কেবল আলম্বনের স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ; এই জন্যই সূত্রকার বলিয়াছেন "ইহা দ্বারাই সবিচার এবং নির্ব্বিচার সমাপত্তির ব্যাখ্যা হইল"।

তন্মাত্র হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান করত চিত্ত যখন তদাকার প্রাপ্ত হয়, তাহার সহিত অভিন্ন হয়, অথচ সেই সঙ্গে সেই সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধি দেশ, কালাদিরও অনুভব হইতে থাকে, তখন সেই অবস্থার নাম সবিচার সমাপত্তি। আর যখন সেই সকল দেশ কালাদি কিছুরই অনুভব হয় না, এক মাত্র সূক্ষ্ম বিষয় চিত্তাকারে পরিণত হইয়া ভাসমান হয়, তখন নির্ব্বিচার সমাপত্তি হয়।

ভাষ্যকার এইরূপে সবিচার এবং নির্ব্বিচার সমাপত্তি বুঝাইয়া পরিশেষে এই উভয়ের ভেদ দেখাইয়াছেন যথা—তত্র মহদ্বস্তুবিষয়া সবিতর্কা, নির্ব্বিতর্কা চ, সূক্ষ্ম বিষয়া সবিচারা নির্ব্বিচারা চ। এবমুভয়ো রেতয়ৈব নির্ব্বিতর্কায়া বিকল্পহানি ব্যাখ্যাতেতি"।

এক্ষণে জানা গেল সমাপত্তি চারপ্রকার, সবিতর্কা, নির্ব্বিতর্কা, সবিচার এবং নির্ব্বিচার। এই চার প্রকার সমাধির মধ্যে সবিতর্ক এবং নির্ব্বিতর্ক এই উভয় বিধ সমাপত্তিই স্থূল বস্তুবিষয়ক এবং সবিচার এবং নির্ব্বিচার এই উভয় বিধ সমাপত্তি সূক্ষ্ম বস্তুবিষয়ক এবং নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি বিকল্প শূন্য হওয়ায় সবিচার এবং নির্ব্বিচার এই দুই প্রকার সমাপত্তিই বিকল্প শূন্য; তাহার কারণ বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, যখন সবিচারের পূর্ব্ববর্ত্তী নির্ব্বিতর্কাবস্থায় বিকল্প ত্যাগ হইয়াছে তখন সবিচারে আর বিকল্প হইতে পারে না। কেহ বলেন স্থূল বলিতে সমুদায় বিকৃতি, তাহাদের মতে ইন্দ্রিয় এবং পরমাণু ইহারাও স্থূলের মধ্যে পরিগণিত। কেহ কেহ আবার ইন্দ্রিয়গণকে সূক্ষ্মের মধ্যে গণনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারপ্রকার (১) বিতর্কানুগত, (২) বিচারানুগত, (৩) অনন্দানুগত (৪) অস্মিতানুগত। ইহাদের মধ্যে বিতর্কানুগতের দুই প্রকার অবস্থা সবিতর্কসমাপত্তি এবং নির্ব্বিতর্কসমাপত্তি; এই রূপ বিচারানুগতেরও সবিচার সমাপত্তি এবং নির্ব্বিচারসমাপত্তি এই দুই রূপ অবস্থা হয়। গ্রাহ্য সমাপত্তির এই চারপ্রকার ভেদ; এইরূপ সানন্দানু-

গত সমাধির চরমাবস্থাকে সানন্দ সমাপত্তি, (ইহাই গ্রহণ সমাপত্তি) এবং অস্মিতানুগতের চরম অবস্থাকে অস্মিতা সমাপত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (উহাই অস্মিতা সমাপত্তি)। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে সমাধি এবং সমাপত্তির মধ্যে প্রভেদ কি? ইহার উত্তরে আমরা বলিব, সমাধি বলিতে চিত্তের ধ্যানরূপ ক্রিয়া, দেহকে স্থির করিয়া কোন এক বিষয়কে আশ্রয় করিয়া ধ্যান করত সেই বিষয়ের সহিত চিত্তের একাকার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমুদয় ধ্যান ক্রিয়ার নাম সমাধি-সুতরাং সমাধির মধ্যে ভঙ্গ হওয়া সম্ভব। সমাপত্তি সমাধির চরমাবস্থা ; ধ্যান করিতে করিতে ধ্যেয় বস্তুর সহিত একাকার প্রাপ্তির নাম সমাপত্তি, সমাপত্তি লাভ হইলে আর সমাধি ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গপর্য্যবসানম্ ॥ ৪৫।

পদচ্ছেদঃ। সূক্ষ্ম-বিষয়ত্বং, চ-অলিঙ্গ-পর্য্যবসানম্ (পরি-অবসানম্)।

পদার্থঃ। সূক্ষ্মঃ বিষয়ো যস্যাঃ সা তস্যাভাবঃ সূক্ষ্মবিষয়ত্বং সূক্ষ্মবিষয় সমাপত্তিত্বং ইতি যাবৎ, অথবা সূক্ষ্মশ্চাসৌ বিষয়শ্চেতি সূক্ষ্মবিষয়স্তস্য ভাবঃ চ পুনঃ অলিঙ্গপর্য্যবসানং ন কচিল্লীয়তে, নবা কিঞ্চিল্লিঙ্গয়তি গময়তীতি অলিঙ্গং প্রধানং প্রকৃতিরিতি যাবৎ তত্র পর্য্যবসানং অন্তো যস্য তৎ প্রধান পর্য্যন্তমিতি যাবৎ।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ

ভাবার্থঃ। সবিচার নির্ব্বিচারয়োঃ সমাপত্ত্যোঃ সূক্ষ্মবিষয়ত্বং উক্তং অথ কিম্পর্য্যন্তং তৎ সূক্ষ্মবিষয়ত্বং ইত্যাশঙ্ক্যাহ সূক্ষ্মবিষয়ত্বমিতি প্রধানপর্য্যন্তমেব সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চিত্তং যদা সূক্ষ্মবিষয়াকারং ভবতি তদা প্রধান এব তস্য পর্য্যবসানং ভবতি, প্রধানাৎ পরং সূক্ষ্মং নাস্তীতি ভাবঃ। তথাহি গুণানাং পরিণামে চত্বারি সর্ব্বাণি (১) বিশিষ্টলিঙ্গং, (২) অবিশিষ্টলিঙ্গং, (৩) লিঙ্গমাত্রং, (৪) অলিঙ্গঞ্চেতি-তত্র বিশিষ্টলিঙ্গং ভূতানি, অবিশিষ্টলিঙ্গং তন্মাত্রেন্দ্রিয়াণি, লিঙ্গমাত্রং বুদ্ধিঃ, অলিঙ্গং প্রধানং প্রকৃতিরিতি। প্রধানস্য ন কুত্রচিল্লয়া বর্ত্ততে, তত্রৈব সূক্ষ্মতায়াঃ পর্য্যবসান মিতি ভাবঃ।

অনুবাদ। প্রকৃতিই চরম সূক্ষ্মবিষয়।

সমালোচন। সবিচার এবং নির্ব্বিচার এই উভবিধ সমাপত্তিকে সূক্ষ্মবিষয় বলা হইয়াছে। সেই সূক্ষ্ম বিষয়ের সীমা কতদূর অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শেষ,

যাহা অপেক্ষা আর সূক্ষ্ম নাই, এমন কোন বস্তু?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ৪৬ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন; সূত্রকার বলিলেন অলিঙ্গ অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতিই চরম সূক্ষ্ম, তাহা অপেক্ষা আর কোন সূক্ষ্ম বস্তু নাই। ভাষ্য-কার যথাক্রমে সূক্ষ্ম বিষয়ের একটি তালিকা দিয়াছেন যথা—

পার্থিব পরমাণুর সূক্ষ্ম বিষয় গন্ধ-তন্মাত্র; জলীয় পরমাণুর সূক্ষ্ম বিষয় রস-তন্মাত্র; তৈজস পরমাণুর রূপ-তন্মাত্র; বায়বীয় পরমাণুর স্পর্শ-তন্মাত্র; এবং আকাশীয় পরমাণুর শব্দ-তন্মাত্র। এই সকল তন্মাত্রের সূক্ষ্ম অহঙ্কার, অহ-ঙ্কারের মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্বের প্রকৃতি। প্রকৃতি অপেক্ষা সূক্ষ্ম আর কিছুই নাই। যদি বল পুরুষ অর্থাৎ চিৎ শক্তিও ত সূক্ষ্ম; প্রকৃতি অপেক্ষা তাহাকে সূক্ষ্ম বলিয়া গণনা করা না হয় কেন? ইহায় উত্তরে ভাষ্যকার বলেন এস্থলে উপাদান-কারণতা অনুসারে সূক্ষ্মত্বের গণনা করা হইয়াছে। পুরুষ সূক্ষ্ম হইলেও উহা অপরিণামী; কাহারও উপাদান কারণ নয় সুতরাং এস্থলে তাহার গণনা হইতে পারে না, উপাদান-কারণতা অনুসারে প্রকৃতিই সর্ব্বা-পেক্ষা সূক্ষ্ম। পুরুষ কাহারও উপাদান নয়, তবে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া, মহদাদি সৃষ্টির প্রতি নিমিত্ত কারণ বটে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই কথা বলা হইয়াছে যথা—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" আমার অধিষ্ঠান বশেই প্রকৃতি এই সচরাচর জগতের সৃষ্টি করেন। অন্যান্য পুরাণেও এইকথার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাএব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬।

পদচ্ছেদঃ। স্পষ্টম্।

পদার্থঃ। তাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্যেষু সমাপত্তয় এব (অবধারণে) সবীজঃ বীজেন আলম্বনেন সহ বর্ত্তত ইতি সজীবঃ সমাধিঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ যোগ ইত্যর্থঃ। উদ্দেশ্যবিধেয়স্থলে লিঙ্গবচনয়োরতন্ত্রতেতি সমাধাবেকবচনত্বং ন দুষ্টং।

অন্বয়ঃ। কথ্যত ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। সর্ব্বাসাং সমাপত্তীনাং সালম্বনত্বাৎ সবীজত্বমিতি ভোজ রাজঃ। যোগপ্রভাকরস্তু—তাএব সবীজঃ সমাধিঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ বিবেক স্যাভাবেন বন্ধবীজসত্ত্বাৎ সবীজত্বং দ্রষ্টব্যমিত্যাহ।

অনুবাদ। পূর্ব্বকথিত সমাপত্তি গুলিই সবীজ সমাধি অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সমালোচন। এই সূত্রের উপর ভাষ্যকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "তাশ্চতস্রঃ সমাপত্তয়ো বহির্ব্বস্তুবীজ" ইতি সমাধিরপি সবীজঃ তত্র স্থূলে-হর্থে সবিতর্কো নির্ব্বিতর্কঃ সূক্ষ্মেহর্থে সবিচারো নির্ব্বিচার ইতি চতুর্দ্ধোপ সঙ্খ্যাতঃ সমাধিরিতি"।

বিজ্ঞানভিক্ষু এই ভাষ্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন পূর্ব্বোক্ত গ্রহীতৃ, গ্রহণ এবং গ্রাহ্য বিষয়ক সমাপত্তিই সবীজ সমাধি অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত যোগ। যদিও যোগের স্বাভাবিক কোন ভেদ নাই তথাপি সমাপত্তিরূপ সাক্ষাৎকারের উৎপাদন হেতুক যোগে সমাপত্তিত্ব ধর্ম্মের আরোপ হইয়াছে। এই সকল সমাপত্তি বহির্বস্তু বীজ অর্থাৎ সংস্কারাদি দুঃখ বীজের কারণ। সেই সমা-পত্তির সহিত সম্বন্ধ থাকায় এ স্থলে সম্প্রজ্ঞাতযোগও সবীজ বলিয়া অভি-হিত হইয়াছে। যদি বল বাস্তবিক ধরিতে গেলে সমাপত্তি ছয় প্রকার হয় (১) সবিতর্ক, (২) নির্ব্বিতর্ক (৩) সবিচার, (৪) নির্ব্বিচার, (৫) সানন্দ, (৬) সাস্মিতা তবে ভাষ্য কার চারপ্রকার সমাপত্তি বলিলেন কেন? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য ভাষ্যকার নিজেই বলিতেছেন যে স্থূল আলম্বন জন্য সমাপত্তি এবং সূক্ষ্মালম্বন জন্য সমাপত্তি এক একটি বলিয়া ধরিতে হইবে। এই নিমিত্তই পূর্ব্বে (১৭।১ সূত্রে) বিতর্কানুগতাদি রূপে সমাপত্তি চার প্রকারে পরিগণিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র বলেন সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার এবং এবং নির্ব্বিচার এই চার প্রকার সমাপত্তিই সবীজ; বিজ্ঞান ভিক্ষু ইহা খণ্ডন করিয়াছেন তিনি বলেন সম্প্রজ্ঞাত যোগই সবীজ; কারণ সম্প্রজ্ঞাত যোগে সংস্কার থাকায় দুঃখের বীজ থাকে। সেই সম্প্রজ্ঞাত যোগ চার প্রকার;— বিতর্কানুগত বিচারানুগত আনন্দানুগত এবং অস্মিতানুগত। সুতরাং এই চার প্রকার সমাধিই সবীজ উহাদের মধ্যে কেবল বিতর্কানুগত ও বিচারানুগত সমাধিকে সবীজ বলিলে সূত্রকারের ন্যূনতা হয়। সকল প্রকার সমাপত্তির মধ্যে নির্ব্বিচার সমাপত্তির শ্রেষ্ঠতা দেখাইতেছেন।

নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥৪৭।

পদচ্ছেদঃ। নির্ব্বিচার-বৈশারদ্যে-অধ্যাত্ম (অধিআত্ম) প্রসাদঃ।

পদার্থঃ। নির্ব্বিচারত্বং ব্যাখ্যাতং বিশারদস্য ভাবঃ বৈশারদ্যং নৈর্ম্মল্যং

নির্ব্বিচারস্য নির্ব্বিচারায়াঃ সমাপত্তেঃ বৈশারদ্যে প্রকৃষ্টাভ্যাসবশাৎ নৈর্ম্মল্যে সতি অধ্যাত্মপ্রসাদঃ আত্মনি বুদ্ধৌ বর্ত্ততে ইত্যধ্যাত্মং তাদৃশঃ প্রসাদঃ স্ফুট প্রজ্ঞালোকঃ।

অন্বয়ঃ। ভবতীতিশেষঃ।

ভাবার্থঃ। যদা নির্ব্বিচারস্য সমাধেঃ বৈশারদ্যং প্রকৃষ্টাভ্যাসবশাৎ রজস্তমোভ্যামনভিভূতত্বাৎ তত্র সমাধৌ চিত্তস্য দার্ঢ্যং ভবতি তদা সত্ত্বোৎকর্ষাৎ প্রজ্ঞালোকস্য সম্যক্ স্ফুটতা জায়তে। ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। নির্ব্বিচার সমাধিতে চিত্তের দৃঢ়তা জন্মাইলে জ্ঞানালোকের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়।

সমালোচন। বৈশারদ্য শব্দের ভাষ্যকার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"অশুদ্ধ্যাবরণমলাপেতস্য প্রকাশাত্মনো বুদ্ধি সত্ত্বস্য রজস্তমোভ্যামনভিভূতঃ স্বচ্ছঃ স্থিতিপ্রবাহী বৈশারদ্যং"। অশুদ্ধি বলিতে পাপবুদ্ধি; সেই পাপবুদ্ধি রূপ যে আবরণ মল তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত অতএব প্রকাশ-স্বরূপ বুদ্ধির রজঃ এবং তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত এবং ধ্যেয় বস্তুর সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ যে একাগ্রতা তাহার নাম বৈশারদ্য অর্থাৎ দর্পণ যেমন মলদ্বারা আচ্ছন্ন হইলে তাহাতে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে না, কিন্তু মাজিয়া ঘষিয়া মল দুর করিলে স্বীয় স্বাভাবিক নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া বস্তুর প্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ হয়, সেই রূপ অনবরত ধ্যান করিতে করিতে পাপ বুদ্ধি রূপ মল অপগত হইলে বুদ্ধি নিজ স্বাভাবিক সত্ত্বময় প্রকাশ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন উহাতে রজঃ এবং তমোগুণের সম্পর্ক না থাকায় উহা এরূপ নির্ম্মল হয় যে ধ্যেয় বস্তুর সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব আসিয়া উহাতে প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুর সহিত সম্পূর্ণরূপে একাকারতা প্রাপ্ত হয়; অবিচ্ছেদ রূপ সেই একাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকার নাম বৈশারদ্য। নির্ব্বিচার সমাধিতে যখন চিত্তের সেই বৈশারদ্য উৎপন্ন হয় অর্থাৎ চিত্ত নিরন্তর ধ্যেয় বস্তুর সহিত একাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিতে সমর্থ হয়, তখন উহার জ্ঞানালোক এরূপ প্রস্ফুট হয় যে, উহাতে একেবারে সমুদয় তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ হইতে প্রতিভাসিত হয়। যোগী তখন ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান সমুদয় বিষয় একেবারে নখ দর্পণের মত জানিতে পারেন। যেমন উচ্চপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া নিম্নস্থ সমুদয় বস্তু একেবারে দর্শন করিতে সমর্থ হয় সেইরূপ যে যোগীর প্রজ্ঞারূপ আলোক সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়, তিনি সমুদয় জাগতিক পদার্থকে একেবারে দর্শন করেন।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮।

পদচ্ছেদঃ। ঋতম্ভরা, তত্র, প্রজ্ঞা।

পদার্থঃ। ঋতং সত্যং বিভর্ত্তি কদাচিদপি ন বিপর্য্যয়েনাচ্ছাদ্যতে সাঋতম্ভরা, তত্র তস্মিন্ অধ্যাত্ম প্রসাদে প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ।

অন্বয়ঃ। তত্র তস্মিন্ সতি প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। তত্র অধ্যাত্ম প্রসাদে সতি সমাহিত চিত্তস্য যা প্রজ্ঞা জায়তে সা ঋতম্ভরেতি কথ্যতে, যথার্থা চ সা যতঃ সা সত্যমেব বস্তুনঃ প্রকৃতং স্বরূপমেব বিভর্ত্তি পশ্যতি ন তত্র ভ্রমলেশোপি বিদ্যতে। তথাচোক্তং আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসবলেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমমিতি। ধ্যানস্য চিন্তনস্য যোঽভ্যাসঃ পৌনঃ পুন্যং তত্র যোঽস আদরস্তেন। অন্যৎ স্পষ্টং।

অনুবাদ। অধ্যাত্মপ্রসাদ অর্থাৎ প্রজ্ঞারূপ আলোকের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান হয়।

সমালোচন। আমাদের যে এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম বা অন্যরূপ অযথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ অবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের প্রজ্ঞারূপ আলোকের অপরিস্ফুটতা মাত্র। ঐ সম্পর্কবিদূরিত হইলে জ্ঞানালোক যথন সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তথন যে বস্তুর ঠিক স্বরূপই জ্ঞাত হইব তদ্বিষয় আর সংশয় কি?

শ্রুতানুমান প্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥ ৪৯।

পদচ্ছেদঃ। শ্রুত-অনুমান-প্রজ্ঞাভ্যাং অন্য-বিষয়া, বিশেষার্থত্বাৎ।

পদার্থঃ। শ্রুতানুমান প্রজ্ঞাভ্যাং শ্রবণমননাভ্যাং অন্য বিষয়া অতিরিক্ত বিষয়া, বিশেষার্থত্বাৎ বিশেষঃ অর্থঃ যস্যাঃ সা বিশেষার্থা, তস্যাভাবঃ, তস্মাৎ বিশেষ বিষয়ত্বাদিতি যাবৎ।

অন্বয়ঃ। স্পষ্টং

ভাবার্থঃ। শ্রুতেন শ্রবণেন অনুমানেন চ যা প্রজ্ঞা জায়তে সামান্য বিষয়া এব তথাহি ঘটপদেন ঘটত্বাবচ্ছিন্নস্যৈব জ্ঞানং ভবতি, নতু তত্তদ্বিশেষ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নস্য, এবমনুমানমপি বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ বহ্নিত্বসামান্যাবচ্ছিন্নস্যৈব জ্ঞানংভবতি নতু তত্তদ্বিশেষবহ্নিত্বাবচ্ছিন্নস্য তস্মাৎ শ্রুতানুমানবিষয়ো

নকশ্চিদ্বিশেষোস্তি, ইয়ং পুনর্নির্বিচার বৈশারদ্যসমুৎপন্না প্রজ্ঞা তাভ্যাং বিলক্ষণা অস্যাং হি প্রজ্ঞায়াং সূক্ষ্ম, ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্টানামপি বিশেষঃ স্ফুটেনৈব প্রতি ভাসতে ইতি।

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত প্রজ্ঞা শ্রবণ বা অনুমান জন্য জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ উহাদের অন্তর্গত নয়; কারণ ইহার দ্বারা বস্তুবিশেষের উপলব্ধি হয়।

সমালোচন। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল,—আগম অর্থাৎ আপ্তবাক্য (শাস্ত্র) বা অনুমানদ্বারা প্রত্যক্ষের অগোচর সমুদয় তত্ত্বের জ্ঞান হইতে পারে, অতএব সেই তত্ত্ব জানিবার জন্য যোগ অভ্যাস, করে কষ্ট স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? এই আশঙ্কার উত্তর করিবার নিমিত্তই এই সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। এই সূত্রে ব্যবহৃত শ্রুত শব্দের অর্থ আগম। আগম বলিতে শাস্ত্র, শাস্ত্র সকল শব্দময় সুতরাং আগমজন্য জ্ঞান এবং শাব্দ বোধ একই কথা। শব্দ শ্রবণ করিয়া জ্ঞান হয় বলিয়া উহাকে শাব্দ বোধ বলে। শব্দ ঘট, পট ইত্যাদি; ঐ সকল শব্দ শ্রবণ করিয়া ঘট, পট ইত্যাদি পদার্থের সামান্য রূপে জ্ঞান হয় মাত্র, বিশেষ রূপে নয়। "এই স্থানে ঘট আছে" এই কথা শুনিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে প্রসিদ্ধ ঘট জাতীয় পদার্থ একটি এখানে আছে, কিন্তু সেটি কাল, রাঙা বা সাদা তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না, এই রূপ সকল স্থলে শব্দ শ্রবণ করিয়া সেই শব্দ প্রতিপাদ্য বস্তুর সামান্য রূপে জ্ঞান হয় মাত্র, তজ্জাতীয় বস্তুবিশেষের জ্ঞান হয় না। অনুমান দ্বারাও ঐরূপ অনুমেয় বস্তুর সামান্যরূপে জ্ঞান হয় মাত্র, তজ্জাতীয় বস্তুবিশেষের জ্ঞান হয় না। বিবেচনা কর কোন পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিলাম। সেই অনুমান দ্বারা পর্ব্বতে বহ্নিজাতীয় একটা পদার্থ আছে এইরূপ জ্ঞানই হইল কিন্তু সে বহ্নি কিরূপ, সে জ্ঞান হইল না অর্থাৎ বহ্নিবিশেষের জ্ঞান হইল না। কিন্তু সমাধি জন্য যে জ্ঞান হয়, তাহাতে বস্তুর বিশেষ রূপ উপলব্ধি হয়; যোগাভ্যাস ভিন্ন সেরূপ জ্ঞান লাভ হয় না অতএব যোগাভ্যাসের সম্পূর্ণ আবশ্যকতা আছে।

প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তুর বিশেষ রূপ উপলব্ধি হয় বটে কিন্তু বস্তু স্থূল ও ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট না হইলে হয় না। সূক্ষ্ম, ব্যবহিত বা দূরস্থ বস্তুর কি সামান্যরূপ, কি বিশেষরূপ কোন রূপই প্রত্যক্ষ হয় না। সেরূপ বস্তুই নাই একথা বলিতে পারা যায় না কারণ তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। ফল স্থূল বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম যদিও প্রত্যক্ষ অনুমান বা আগম দ্বারা কোন রূপে জ্ঞাত

হওয়া যায়, কিন্তু তন্মাত্রাদি-সূক্ষ্ম-বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম সমাধিজন্যজ্ঞান ব্যতীত আর কোন উপায়ে জ্ঞাত হওয়া যায় না। তাদৃশ বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞান করিবার নিমিত্ত যোগাভ্যাসের আবশ্যকতা।

তজ্জসংস্কারোঽন্য সংস্কার প্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ।

পদচ্ছেদঃ। তজ্জঃ, সংস্কারঃ, অন্যসংস্কার—প্রতিবন্ধী।

পদার্থঃ। তয়া পূর্ব্বোক্তয়া প্রজ্ঞয়া জনিতঃ সংস্কারঃ, অন্যাঃ সংস্কারা, অন্যসংস্কারাঃ, তাদৃশপ্রজ্ঞোৎপত্তেঃ পূর্ব্বজাতাঃ সংস্কারা ইত্যর্থঃ, তান্ প্রতিবধ্নাতি স্বকার্য্যকরণাক্ষমান্ করোতীতি অন্য সংস্কারপ্রতিবন্ধী।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। সমাধিপ্রজ্ঞয়া চিত্তে যঃ সংস্কারউৎপদ্যতে স স্বপূর্ব্বজান্ চিত্তস্থিতান্ সর্ব্বানেব সংস্কারান্ প্রাগভিভূয় প্রবলোভবতীতিভাবঃ।

অনুবাদ। সেই সমাধিপ্রজ্ঞা জনিত সংস্কার দ্বারা অপর সংস্কার সকলের কার্য্যকারিতা শক্তি বিলুপ্ত হয়।

সমালোচন। চিত্তের যত গুলি পরিণাম হয়, সেই সেই পরিণামানুসারে এক একটি সংস্কার হয়। সেই সেই সংস্কার-বশে চিত্ত আবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, একথা পূর্ব্বে আমরা একবার বলিয়া আসিয়াছি। সমাধি প্রজ্ঞা অবস্থায় চিত্তের যে সংস্কার হয় সেই সংস্কারের প্রাবল্য হেতু তখন উহার পূর্ব্ব সংস্কার সকল একবারে বিলুপ্ত হয় না বটে কিন্তু তাহাদের কার্য্যকারিতা শক্তি থাকে না। একবারেই যে সম্প্রজ্ঞাত সিদ্ধি এবং পূর্ব্ব সংস্কারের রোধ হয় তাহা নয়, অনেক বার সংপ্রজ্ঞাত যোগের অভ্যাস দ্বারা সম্প্রজ্ঞাতের দৃঢ়তা হয়। সম্প্রজ্ঞাত সুদৃঢ় হইলে তবে পূর্ব্ব সংস্কার সকলের সম্পূর্ণরূপ বিলোপ হয়। এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, ভাল প্রজ্ঞাসংস্কারের প্রাবল্য হেতু অন্যবিধ সংস্কারের লোপ হওয়ায় চিত্তকে সেই সেই সংস্কার অনুসারে কার্য্য করিতে না দিউক কিন্তু প্রজ্ঞাসংস্কারত সংস্কার উহা স্বয়ং প্রবল হইয়া চিত্তকে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত না করে কেন? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলেন যে, তখন কার্য্যে প্রবৃত্তির হেতু অবিদ্যাদির বিনাশ হওয়ায় সমাধি প্রজ্ঞাজনিত সংস্কারেরা চিত্তকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। কারণ যে অবধি তত্ত্বজ্ঞানলাভ না হয় সেই অবধিই চিত্তের চেষ্টা থাকে; তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে চিত্ত আপনাকে কৃতকৃত্যবোধ করিয়া আর কোনরূপ সৎ বা অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না।

তখন চিত্তের কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না বটে কিন্তু সমাধি প্রজ্ঞাজনিত সংস্কারের প্রাবল্য হওয়ায় চিত্ত একবারে বৃত্তি শূন্য হয় না ঐ সংস্কাররূপ বৃত্তি উহাতে থাকে, এই জন্য উহাকে সবীজ সমাধি বলা হয়।

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ ॥৫১।

পদচ্ছেদঃ। তস্য, অপি, নিরোধে, সর্ব্ব-নিরোধাৎ নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ।

পদার্থঃ। তস্যাপি প্রজ্ঞাকৃতসংস্কারস্যাপি নিরোধে অত্যন্তাভিভবে জায়মানে সর্ব্বনিরোধাৎ সর্ব্বাসাং চিত্তবৃত্তীনাং প্রবিলয়াৎ নির্ব্বীজঃ নিরালম্বনঃ অথবা দুঃখবীজৈঃ সংস্কারৈঃ শূন্যঃ সমাধিঃ যোগঃ।

অন্বয়ঃ। আবির্ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। তত্ত্বজ্ঞানানন্তরং তত্রাপি বৈরাগ্যাৎ যোগাভ্যাস বলেন সমাধিপ্রজ্ঞাকৃত সংস্কারস্য প্রবিলয়ে সর্ব্ববৃত্তি নিরোধাৎ নির্ব্বীজঃ নিরালম্বনো দুঃখবীজসংস্কারাশূন্যোবা সমাধিঃ অসংপ্রজ্ঞাতরূপঃ উপজায়তে। তস্মিন্ সতি-পুরুষঃ স্বরূপমাত্রনিষ্ঠঃ শুদ্ধো ভবতি। স এব মোক্ষ ইতি ফলিতম্।

অনুবাদ। সেই সমাধি প্রজ্ঞাজনিতসংস্কারের বিলয় হওয়ায় নিখিল চিত্তবৃত্তির বিলয় হয় এবং তখনই নির্বীজ সমাধির আবির্ভাব হয়।

সমালোচন। প্রথমেই বলা হইয়াছে যোগ দুই প্রকার সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত। ৫০ সূত্র অবধি সংপ্রজ্ঞাতের কথাই বলা হইল; কেবল ৫১ এই অন্তিমসূত্রে অসম্প্রজ্ঞাতের বিষয় বলিতেছে। সংপ্রজ্ঞাত যোগ যখন চরমসীমা প্রাপ্ত হয়, তখন তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মার স্বরূপ বিদিত হয় এবং চিত্ত নির্ম্মল অর্থাৎ রজঃ এবং তমোগুণরূপমলশূন্য হওয়ায় সত্ত্বময় স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অপর সমুদয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই আত্মজ্ঞানরূপ বৃত্তিকে আশ্রয় করে; সুতরাং উহাতে তখন সেই আত্মজ্ঞান জন্য তাদৃশ একটি সংস্কারও থাকে; এইরূপ অবস্থা সংপ্রজ্ঞাতের সীমা। উহাতে ঐ আত্মজ্ঞানরূপ বৃত্তি এবং তজ্জন্য সংস্কার থাকায় উহাও সবীজ সমাধি. কিন্তু যদি কোন যোগী উহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সুদৃঢ়অভ্যাসবলে ঐ বৃত্তি টুকুর রোধ করে তাহলে তজ্জন্য সংস্কারের বিলোপ হয় এবং চিত্তের আর কোন রূপ বৃত্তিই থাকে না, চিত্ত তখন নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত এবং প্রশান্ত সাগরের মত গম্ভীর ভাব ধারণ করে। সেই নির্ম্মল এবং স্থির চিত্তে নির্ম্মল আত্মার সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব আসিয়া পতিত হওয়ায় একপ্রকার

অনির্ব্বচনীয় যোগের উৎপত্তি হয়। ইহা সামান্য যোগ নয়, জড় চৈতন্যের একীভাব, অথচ উভয়েই নির্লিপ্ত, জীবন মরণের একত্র লীলাখেলা। এই মহাযোগের নামই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি। সে সমাধিতে জ্ঞান নাই, জ্ঞেয় নাই, জ্ঞাতা নাই। কার্য্য নাই, চেষ্টা নাই, প্রবৃত্তি নাই, সংস্কার নাই, কার্য্যের বীজও নাই। সেই সঙ্গে আর কতকি নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, আবার দুঃখও নাই, সুখও নাই। আছে কেবল আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপে অবস্থিত সুতরাং মুক্ত, আর সত্ত্বময় নির্ম্মল স্থির চিত্ত। দেহ থাকিতে পারে, না থাকিতে পারে। ইহাই চরমযোগ এবং যোগীদের পরম পুরুষার্থ। এক জন্মে নয়, দুই জন্মে নয়, শত সহস্র জন্মজন্মান্তরের নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা কেহ কেহ এরূপ যোগ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পাতঞ্জল যোগসূত্রের সমাধিপাদ নামক প্রথমপাদ
সম্পূর্ণ।

শশ্মানেশোকদৃশ্য।

১

দিবা অবসান ;—প্রশান্ত প্রকৃতি ;—
রক্তিম বিভায় হাস্যময়ী সতী।
পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়েছে—
দীনেশ—জগত-জ্যোতি।
অই তরঙ্গিণী স্বচ্ছ সচঞ্চল,—
আপনার ভাবে আপনি বিহ্বল,
মৃদু কলনাদে নীলাম্বু উদ্দেশে
অনন্ত অশ্রান্ত গতি।

২

তটিনীর স্নিগ্ধ শ্যামল দু-কূলে,—
সুশোভিত চারু পল্লব মুকুলে,—
দাঁড়ায়ে রয়েছে মহীরুহ রাজি—
শান্তির প্রহরী প্রায়।
বনবিহঙ্গের মনোমুগ্ধকর,—
বাজিছে মধুর মৃদু কণ্ঠস্বর ;
নীরময়ী নদী শিহরি উঠিছে—
মৃদুল মৃদুল বায়।

৩

তটিনীর তীরে শ্মশান-শয্যায়,—
মলিন বিবর্ণ প্রভাশূন্য কায়,—
শায়িত রয়েছে শবদেহ এক —
চির নিদ্রা অভিভূত।
একটী ষোড়শী অদূরে দাঁড়ায়ে,—
ঘোমটা ঘুচায়ে রহিয়াছে চেয়ে,—
মৃত যুবকের মুখপানে হায় !
পাষাণ প্রতিমা মত।

৪

রমণীর নেত্রে ঝরে অশ্রুজল,
নিদারুণ শোকে হৃদয় বিকল,
নিরাশার তাপে শুকায়ে গিয়াছে,—
কোমল পরাণ তার।
স্বভাব-সরলা,—হায় অনাথিনী,
এসেছে শ্মশানে সাজিতে যোগিনী
আহা কি কঠোর অনিবার্য্য বিধি,
নিদারুণ বিধাতার।

৫

বিষাদে নিষ্প্রভ ম্লান কলেবর,—
পশ্চিম সাগরে ডুবিলা ভাস্কর ;
আলোর রক্তিম শেষ আভাটুকু—
ভাসিছে গগণ তলে।
ধীরে ধীরে আসি সন্ধ্যা-সীমন্তিনী,
করুণ-হৃদয়া শান্তি স্বপিণী,
ঢাকিয়া ফেলিল শবের বদন
আপন বসনাঞ্চলে।

৬

"হরিবোল হরি,"—কহি ভগবন্,
সঙ্গী দ্বিজগণ জ্বালি হুতাশন
প্রদানিলা হায়, শোক-সন্তাপিতা—
সতীর কোমল করে।
কম্পমান করে লয়ে হুতাশন,
শবের মুখাগ্নি করি সমাপন,—
করযোড়ে দেবী দাঁড়াইলা সবি—
নয়নে শোকাশ্রু ঝরে।

৭

জ্বলিল শ্মশান,—"হরিবোল হরি"
অনাথা রমণী কেন প্রাণ ধরি,—
সংসার-শ্মশানে ভুগিতে যাতনা,—
বাঁচিয়া রহিল হায় ।
সংসারের সুখ,—জীবন সর্ব্বস্ব,—
শ্মশান-অনলে পুড়ি হইল ভস্ম ;
পরাণও পুড়িয়ে গেল দুখিনীর,—
পুড়িল না শুধু কায় ।

৮

করে সমাপন শবের সৎক্রিয়া,—
বিধবা বালার বেশ বদলিয়া,—
দ্বিজগণ সব ;—শোকেতে না সরে,
বদনে কাহার বাণী ।
তটিনীর নীরে স্নানে শুদ্ধ হয়ে,—
ফিরিলা সকলে আপন আলয়
বিসর্জ্জিয়ে শোক সাগর সলিলে
সোনার প্রতিমা খানি ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র গোষ্ঠীপতি ।

আসাম।

চাকর সাহেব দিগের কল্যাণে বাঙ্গালীর শিক্ষিত অশিক্ষিত, ছোট বড় কাহারও নিকট আসামের নাম অপরিচিত নহে। স্বভাবের শোভা দর্শন করিবার পক্ষে আসাম অবশ্য দর্শনীয় স্থল; আসামে বৃহদকার নদ নদী, বন উপবন, পাহাড়, পর্ব্বত ও উপত্যকার অভাব নাই। যাঁহারা দেশ ভ্রমণ করিতে ভাল বাসেন, অথচ ভ্রমণের একটু কষ্টস্বীকার করিতে ক্লেশ বোধ করেন না, আসাম তাঁহাদেয় পক্ষে অবশ্য দর্শনীয়। আমরা এই প্রবন্ধে আসামের ও আসাম বাসীর যৎকিঞ্চিৎ মোটামুটি পরিচয় দিব।

প্রথম, আসাম নামের উৎপত্তি। পূর্ব্বে ইহার কি নাম ছিল বলা যায় না। আহম নামকজাতি কর্ত্তৃক ইহা অধিকৃত হওয়ার পর হইতে আহম্ শব্দ হইতে আসাম নামের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই অবধি এই দেশ আসাম নামে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। বঙ্গে ভাগীরথী যেরূপ শাখা প্রশাখায় প্রবাহিত হইয়া সমগ্র বঙ্গভূমিকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিয়া রাখিয়াছেন, আসামে ব্রহ্মপুত্রও সেইরূপ আসাম ভূমিকে নানা প্রকারে বেষ্টন করিয়া তাহাকে সুজলা সুফলা করিয়া রাখিয়াছে। পথ ঘাটের অসুবিধায় আসাম ভ্রমণ ইচ্ছা থাকিলেও অনেকের অদৃষ্টে ঘটে না বলিয়া আসামের একটা মোটামুটি বিবরণ আমরা প্রদান করিলাম।

কলিকাতা হইতে আসাম যাইতে হইলে, আসামের প্রথম ষ্টেশন ধুবড়ীতে নামিতে হয়, তথা হইতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ষ্টিমার যোগে গোয়ালপাড়ায় পঁহুছান যায়। আসাম ভ্রমণ-কারীর পক্ষে গোয়ালপাড়া একটি দর্শনীয় স্থান। এখানে অনেক ছোট ছোট পাহাড় আছে; এই সকল পাহাড়ের উপর সাহেবদিগের সুরম্য বাঙ্গালা আছে। গোয়ালপাড়ার পাহাড়ের উচ্চ শিখর হইতে আসামের অনেক ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়, উচ্চস্থান হইতে উত্তরে হিমাচলের ও দক্ষিণে গারো পর্ব্বতের সুন্দর দৃশ্য শীঘ্র ভুলিবার নহে, ভ্রমণকারী দর্শকের মনে অনেক দিন তাহা জাগিয়া থাকে।

গোয়ালপাড়া ছাড়িয়া গৌহাটি আসাম যত্রীর তৃতীয় দর্শনীয় স্থান। গোয়ালপাড়া হইতে ষ্টীমার যোগে গৌহাটী যাইতে একদিন সময় লাগে। গৌহাটি হিন্দুর পক্ষে কেবল সুদর্শনীয় স্থান নহে, ইহা এক প্রসিদ্ধ

তীর্থ স্থল। কামাখ্যা দেবীর মন্দির এই গৌহাটীতে। এতদ্ভিন্ন আসামের মধ্যে ইহা একটি অতি প্রাচীন নগর, মহাভারতে ইহা রাজা ভগদত্তের রাজধানী বলিয়া পরিচিত তখন নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষ।

ইংরাজরাজও আসাম গ্রাস করিয়া প্রথমে এই প্রাচীনস্থানে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল কমিসনর সাহেব নিজ মনোমত স্থান চিরবসন্ত বিরাজিত সিলংয়ে লইয়া গিয়াছেন। গৌহাটি তথাপি এখনও অসামের মধ্যে প্রধান নগর। গৌহাটির পর তেজপুর; ইহাও দেখিবার পক্ষে অনুপযুক্ত নয়। আসামের মধ্যে প্রধান প্রধান নগরের পরিচয়ের সহিত ব্রহ্মপুত্রের একটা পরিচয় দেওয়া উচিত। এখানে ব্রহ্মপুত্রের ভয়ানক দৌরাত্ম্য, ইহার দৌরাত্ম্যে আজ যেখানে জনাকীর্ণ গ্রাম, সহর, লোকে সুখে সচ্ছন্দে বসবাস করিতেছে, দেখিবে কিছুদিন বাদে সেখানে আর সে সকলের চিহ্ন মাত্র নাই, তথা দিয়া এক বিস্তীর্ণ নদী প্রবাহিত হইতেছে। আবার কাল যেখানে নদীগর্ভ আজ সেখানে মাঠ, ঘাট, বাজার বসিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের ভয়ে আসাম বাসীকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত চিত্তে থাকিতে হয়।

আসাম ভ্রমণ কারীর পক্ষে অক্টোবরের মাঝামাঝি হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত পাচ ছয় মাস কাল অতি মনোরম সময়। বর্ষাকালে আসামে কদাচিৎ আসিবে না। ঐ পাঁচ ছয় মাস কাল এখানকার জলবায়ু যেমন সাস্থ্যকর দৃশ্যও তেমনি মনোহর। প্রাতে ঘন কুয়াসার মধ্য হইতে পাহাড় পর্ব্বত ও অরণ্যের ক্ষীণ দৃশ্য হৃদয় ও মনমুগ্ধকারী; মধ্যাহ্নে এখান কার তীক্ষ্ণ স্ূর্য্যরশ্মিও তেমনি সুখদায়ক; শীতল বায়ু তাহার প্রখরতা নষ্ট করিয়া তাহাকে বড় মধুর করিয়া তুলে। শিকার প্রিয় ইংরেজেরা এই কয়েক মাস এখানে পরমানন্দে কাটাইয়া থাকে।

আসামের অধিবাসীগণ স্বভাবত বড় অলস, অপরিষ্কার, ভীরু ও দুর্ব্বল। আসামের বর্ষা যেমন দীর্ঘ তেমনি কদর্য্য ও ভয়ানক; তাহার ফলে অধিবাসী গণ সর্ব্বদা জ্বরে চিররুগ্ন। তাহার উপর সোনায় সোহাগা ইহারা আফিং,গুলির বড় ভক্ত, প্রজাবৎসল ইংরাজের কল্যাণে এ সকল লাভের জন্য তাহাদিগকে বড় ভাবিতেও হয় না। পাড়ায় পাড়ায় গুলির আড্ডা; বিক্রেতারা আফিং দ্বারে দ্বারে লইয়াও বিক্রয় করিয়া থাকে। এক্ষণে ভাবুক পাঠক, আসাম বাসী সাধারণ লোকের আকৃতি একবার মনে ভাবিয়া দেখুন দেখি মনে থাকে যেন, গুলিতে জীর্ণ, জ্বরে শীর্ণ দেহ মধ্যে উদরে এক একটি স্ফীত

প্লীহা বিরাজ করিতেছে। জ্বর ও প্লীহা ব্যতীত, উদরাময় আসামবাসীর নিত্য সহচর: অনেক ইংরাজকেও ইহার আলয় বিব্রত হইতে হয়। ওলাউঠারও অনুগ্রহ মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ হইয়া থাকে; গড়ে প্রতি পাঁচ বৎসরে ওলাউঠায় দেশের এক এক স্থান একবারে উজাড় হইয়া যায়। অহিফেন ভক্তেরাই এই অনুগ্রহের বেশী মাত্রা লাভ করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন আসামে কুষ্ঠব্যাধি, শ্লীপদ এবং গলগণ্ড রোগের সংখ্যা বড় মন্দ নহে। এখানকার জলের দোষে শেষোক্ত দুই রোগে অনেককে ভুগিতে দেখা যায়। আসামের সাধারণ অধিবাসীর এত সুখ।

এত রোগের প্রাদুর্ভাব থাকিলেও আসামবাসীর ঔষধ পত্র অপেক্ষা মন্ত্র তন্ত্রের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর অধিক: রোগ যখন অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, আর মন্ত্র তন্ত্র খাটে না, তখনই ইহারা চিকিৎসকের আশ্রয় লইয়া থাকে কিন্তু এরূপ অবস্থায় আশ্রয় লওয়া না লওয়া তুল্য কথা। মনুষ্যের পীড়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা ত এরূপ গেল; গো, মেষ, মহিষাদি গৃহপালিত জীবদিগের জন্য ব্যবস্থা আরো চমৎকার: ইহাদিগের কাহারও কিছু হইলে একটা সজীব কোলা ব্যাং কোমরে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তবে আসামে একটা এই তারিফ্ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রতি পরিবার মধ্যেই বৎসরে দুই এক জনের সংখ্যা হ্রাস হইলেও এখানকার লোকেরা নিষ্কর্ম্মা বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক, মা ষষ্ঠীর অনুগ্রহ ইহাদের উপর অচলা, পরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি বই হ্রাস পায় না।

আসামবাসীগণকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে; সাধারণ এবং ভদ্র শ্রেণী আসামের ভদ্রলোকগণকে বাঙ্গালী ভদ্রশ্রেণীস্থ লোকদিগের সহিত বিদ্যা বুদ্ধিতে তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু আসামের সাধারণ বা নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের বড় দুর্দ্দশা; পুর্ব্বে ইহার কতকটা পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; তাহার উপর তাহারা ঘোর মুর্খ, কোন প্রকার বিষয় বুদ্ধি তাহাদের মনে আজও ভালরূপ প্রবেশ করে নাই, অথচ বড় একটা কোন ভাবনা চিন্তাও নাই। আসামের ভূমি বড় উর্ব্বরা, আহারের জন্য বড় পরিশ্রম করিতে হয় না। তবে আর ভাবনা চিন্তা কিসের জন্য? লেখা পড়ার দিকে বড় একটা কেহ যাইতে চাহে না। তবে আজ কাল্ ইংরাজের যত্নে আসামেরও অন্ধকার ক্রমে ঘুচিয়া আসিতেছে। আসামে একটা সুখ এই, আসামীগণ যেমন শান্ত শিষ্ট, তেমনি অন্ন চিন্তা না থাকায় এখানে

চুরি ডাকাতিরও বড় ভয় নাই, গৃহস্থকে সর্ব্বদা সন্দিগ্ধভাবে সতর্ক থাকিতে হয় না। রাত্রে গৃহের দ্বার খুলিয়া সচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে কাহারও ভয় হয় না। তবে আসামে ক্রমে ইংরাজি সভ্যতার বিস্তার হইতেছে, কেবল খাইয়া পরিয়া সন্তুষ্ট থাকিবার দিন ঘুচিয়া ক্রমে অর্থের আবশ্যকতার দিন পড়িতেছে, সুতরাং ক্রমে কি দাঁড়াইবে বলা যায় না।

আর এক বিষয়ে আসামীদের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আসামীদের মধ্যে কেহ আপন নিরাশ্রয় আত্মীয় স্বজনকে ভাসাইয়া দেয় না, ইতর ভদ্র সকলেরই এ বিষয়ে সম দৃষ্টি। যাহার অবস্থা অতি খারাপ, সেও আপন গ্রাসের অর্দ্ধেক অম্লান বদনে আপন আশ্রিত পরিজনকে না দিয়া আহার করিবে না। এই কারণে আসামে যাহার একটু অবস্থা ভাল বা যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট আফিসে কাজকর্ম্ম করিয়া দু, দশ, টাকা উপার্জ্জন করে, তাহাকে এইরূপ অনুগত আশ্রিত প্রতিপালন করিতে তাহার নিজের আর কিছু সঞ্চয় করিবার যো থাকে না। ইংরাজি শিক্ষার কল্যাণে বাঙ্গালার ন্যায় পরে আসামেও এ প্রথায় কিরূপ পরিণাম দাঁড়াইবে বলা যায় না।

আর এক বিষয়। আসামে এখনও গুরুজনের প্রতি, সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন আছে—তাঁহাদের সহিত বিনীত ও নম্র ব্যবহার এবং শ্রদ্ধা ভক্তির এখনও লোপ হয় নাই। Young Bengal এর ন্যায় Young Assam এর সূত্রপাত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এখনও দেশময় ছড়াইয়া পড়ে নাই। এখনও তাহারা রাস্তা ঘাটে ব্রাহ্মণ দেখিলে পথ ছাড়িয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। আসামীদের ইংরাজ ভক্তিটারও কিছু বাড়াবাড়ি। রাস্তা ঘাটে ফিরিঙ্গিদের দেখিলেই সেলাম করা, ছাতা বন্ধ করা ও ঘোড়া হইতে নামা রোগ টুকু এখন ও যায় নাই। এই সকল আস্কারা পাইয়া সাহেবেরাও কিছু উপর চালে চলিয়া থাকে।

গৌহাটী। গৌহাটীতে প্রচুর সুপারি গাছ জন্মিয়া থাকে ও এই কারণে অনেকের মতে এই স্থানের নাম (গুয়া = গুপারি, হাট = বাজার) গৌহাটী হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে সুপারির বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। কামাখ্যা দেবীর মন্দির ব্যতীত গৌহাটীতে আরও বিস্তর দেব দেবীর মন্দির স্থাপিত আছে। কামাখ্যা দেবীর মন্দির গৌহাটি নগরের পরপারে নীলাচল পর্ব্বতোপরি-স্থিত। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র তীর্থ-যাত্রী ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এই স্থানে সমাগত হইয়া থাকেন। ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে এই

তীর্থ স্থানে বিস্তর নরবলি হইত, ইংরেজ শাসনে এক্ষণে এই নিষ্ঠুর কার্য্য রহিত হইয়াছে। আসামে যে এককালে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এই পর্ব্বতে তাহারও অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

কামাখ্যা দেবীর মন্দির ব্যতীত মহামুনির আশ্রম কামরূপের একটি প্রধান তীর্থ। ইহা হজু নামক স্থানে (কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে অল্প দূরে) দুই শত হস্ত উচ্চ এক পর্ব্বতের শিখরোপরি স্থিত। আশ্চর্য্যের মধ্যে এই মহামুনি হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়েরই আরাধ্য দেবতা। হিন্দুর ন্যায় চীন তিব্বৎ প্রভৃতি দূর দেশান্তর হইতে যাত্রীগণ এই স্থানে আসিয়া নিজ নিজ পাপ ভার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যায়। এই দুইটি ব্যতীত কামরূপ যাইবার পথে আরও অনেক ছোট খাট তীর্থ স্থান আছে, তবে সে গুলি তত প্রসিদ্ধ নয়

সিলং ;—সিলংএর পরিচয় কিছু পূর্ব্বে নবজীবনে একবার বাহির হইয়াছিল, সুতরাং আর এস্থলে দেওয়া গেল না।

তেজপুর, নৌগং, গোলাঘাট, জোড়হাট, শিবসাগর এবং লক্ষীপুর আসামের এই কয়েকটি প্রধান দর্শনীয় স্থান। তন্মধ্যে তেজপুরে আসাম-চায়ের আবিষ্কারক চার্লস ব্রুস সাহেবের বাস স্থান। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে তিন হাজার একার ভুমি পুরস্কার স্বরূপ নিস্কর দান করিয়াছেন। ব্রুস সাহেবের চারি পুত্র এবং এক জামাতা এক্ষণে চাকরের কার্য্য চালাইতেছেন। ইহাঁরাই আসামের প্রথম চাকর।

এক্ষণে জোড়হাট শিবসাগর এবং লক্ষীপুর এই স্থানের একটু পরিচয় দেওয়া যাউক।

জোড়হাট ;—ষ্টীমার যোগে এ স্থানে গমন করা যায়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহানল এ স্থানে স্পর্শিয়াছিল। ইংরাজ-তাড়িত আসাম-রাজের এক পুত্র এই স্থানে ইংরাজের অনুগ্রহ ভিখারী হইয়া বাস করিতে ছিলেন। তিনিই কতিপয় অনুগত লোকের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এখানকার মহাপুরুষদের সমূলে নির্ম্মূল করিবার যোগাড়ে ছিলেন; কিন্তু কার্য্য সমাধা হইবার পূর্ব্বে সমস্ত মন্ত্রণা শিবসাগরের ডেপুটি কমিসনর কর্ণেল হল-রয়েডের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি রাতারাতি রাজকুমারকে কয়েদ করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া আসামের প্রাচীন স্বাধীন রাজ বংশের নাম লোপ করিয়া দেন।

শিবসাগর,—শিবসাগর আসামের মধ্যে একটি দর্শনীয় এবং স্বাস্থ্যকর স্থান। এই স্থানে আসাম রাজের অক্ষয় কীর্ত্তি চিহ্ন শিবসাগর নামক বৃহৎ জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই জলাশয়ের নাম হইতেই এই স্থান শিবসাগর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই সুবৃহৎ সরোবর দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় দুই মাইলের অধিক হইবে। ইহা যেরূপ সুগভীর, ইহার জলও সেইরূপ পরিষ্কার, ইহার তীরে তিনটি মন্দির, তন্মধ্যে মধ্যকার মন্দির ব্যতীত দুই পার্শ্বের দুই মন্দির নিরেট করিয়া গ্রথিত, তাহাতে দেবতাদি থাকিবার স্থান মাত্র নাই। মধ্যের মন্দির সুবৃহৎ ও উচ্চ। তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ এবং অপরাপর দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরের চূড়া পর্য্যন্ত প্রায় দুইশত ফুট উচ্চ ও অগ্রভাগ সুবর্ণ মণ্ডিত। অনেকে এই সুবর্ণ লাভের আশায় এই চূড়ার ধ্বজায় বন্দুকের গুলি করিয়াছে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সরোবর সম্বন্ধে এখানকার লোকের মুখে অনেক প্রকার প্রবাদ ও জনরব শুনিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, ইহার মধ্যে সুবর্ণের কচ্ছপ আছে। বস্তুত, এই সরোবরের মধ্যে বিস্তর কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়।

লক্ষ্মীপুর,—এই জেলায় কয়লা তৈল এবং চূনের অনেক খনি আছে। ডিব্রুগড়, লক্ষ্মীপুরের সিবিল ষ্টেসন। এখানে ইংরাজেরা বাস করিয়া থাকে। লক্ষ্মীপুরে বক্রকুণ্ড নামক তীর্থ থাকায় প্রতি বৎসর অনেক যাত্রী এই পবিত্র তীর্থে অবগাহন মানসে আসিয়া থাকে।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের শেষ করিব। বাঙ্গালায় যেরূপ মিসনরি সাহেবেরা প্রথম ইংরাজি শিক্ষার সূত্রপাত করেন, আসামেও সেইরূপ আমেরিকান ব্যাপ্টিষ্ট মিসনের সাহেবেরা তথায় প্রথম ইংরাজি শিক্ষার সূত্র পাত করেন। ইহাদিগের চেষ্টায় আসামী ভাষায় অনেক গুলি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। আসামে এক্ষণে ধীরে ধীরে শিক্ষার উন্নতি হইতেছে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

সংসার ও সন্ন্যাস।

"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা ?" আমায় কে ডাক্‌ছে—আমায় কে টান্‌ছে। কে ডাক্‌ছে—কোথায় ডাক্‌ছে—কেন ডাক্‌ছে, তা' জানিনে। প্রাণ চায়, তাই চাই; কি জন্যে কা'র কাছে কোথা যাই, তাও বুঝ্‌তে পারিনে। দিশে-হারা—লক্ষ্যভ্রষ্ট—আপনা বঞ্চিত—আমি অভাগা। শূন্য প্রাণে শূন্য মনে শূন্যভাবে শূন্য দৃষ্টিতে কোথা যাইতেছি? কূল নাই, পার নাই, শেষ নাই, সীমা নাই, কা'র উদ্দেশে কি ভাবে বলিতেছি? দূর—দূর—অতি-দূর অনন্ত। দৃষ্টির বহির্ভূত—কল্পনার অতীত—জ্ঞানের অচিন্ত্য। ভাষায় নাই—বর্ণনায় নাই—উপদেশে নাই। ইহা ভাব-রূপ অব্যক্ত। কি ভাবে আমার প্রাণ বিভোর হইল? কেন আমি বিষয়-মোহে অন্ধ হইলাম? তা' হইলে ত আর আমায় এমন বিজাতীয় যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে হ'ত না? হায়! আমায় কে পথ দেখাইবে? কে উদ্ধার করিবে? মা জগজ্জননি জগদম্বে! মাগো, তুই তোর্ অলৌকিক ভুবন মোহিনী বিশ্বেশ্বরী রূপে আমায় একবার দেখা দে! মা, আমি প্রাণ ভরিয়া—আশ মিটায়া তোকে দেখে, আমার পাপ-দগ্ধ জর্জ্জরিত প্রাণ শীতল করি, আপনাকে চিনিয়া লই, আপনার কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হই। মা, তুই কি সত্যই পাষাণী? না—না, তুই পাষাণী হ'লে তোর ছেলেও ত পাষাণ হ'বে! যে পাষাণ, তার কি চক্ষে জল থাকে? না মা, আমি জানি, তুই দয়াময়ী—দয়ার অধার-স্বরূপা! তাই বলি, তুই কি তোর অভাগা ছেলেকে কোলে নিবিনে মা! হায়? এ অনিবার্য্য আকর্ষণের গতি কোথায়? এর পরিণাম কি? এখন যাই কোথা—করি কি? মাগো! আর কতকাল লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে শূন্যে—শূন্যে—মহাশূন্যে ভ্রমণ করিব? চারিদিকে অন্ধকার—ভীষণ হইতেও ভীষণতর! এ রাজ্যে সূর্য্য নাই—চন্দ্র নাই—নক্ষত্ররাজি নাই—আলোকের লেশ মাত্র নাই। এ জীবন-উদ্যানে ফুল নাই—ফল নাই—বৃক্ষ নাই—পত্র নাই। এখানে জল নাই—বাতাস নাই—ছায়া নাই—দেহ—এ ভগ্ন-হৃদয় ভীষণ সাহারা মরুভূমি হইতেও ভয়ানক! ভীষণ নৈরাশ্যের করাল-ছায়া করাল-মুখ ব্যাদান করিয়া যেন অট্টহাস্যে আমায় সদাই গ্রাস করিতে আসিতেছে। কোথায় যাই—কি করি? এক দিকে সংসারের মোহিনী আকর্ষণ, অন্যদিকে বৈরাগ্যের মধুর আহ্বান! এক দিকে

কামিনী কাঞ্চনের অব্যর্থ প্রলোভন, অন্যদিকে আত্ম-ধর্ম্ম-নিরত মনীষা-সম্পন্ন মহাত্মাগণের অমূল্য উপদেশ! এক দিকে ধর্ম্মের মৃদু গম্ভীর রব, অন্যদিকে বহুলোক সমাকীর্ণ বিষয়ীর বিষয়-ভেরীর গভীর নিনাদ! এক দিকে শান্তির প্রাণস্নিগ্ধকর স্বর্গীয় ছবি, অন্যদিকে মহারিপুগণের তীব্র উত্তেজনা! একদিকে একজনে বিমল আনন্দ-বিভোর প্রাণে ডাকিতেছে, অন্যদিকে বহু বিষয় মদিরাপানোন্মত্ত সংসার-কীট তাহার বুদ্ধিবৃত্তিতে তীব্রভাবে দংশন করিতেছে। এখন আমি কোন পথে যাই? দুই উন্মত্ত মাতঙ্গের মধ্যস্থলে আমি, 'জলে কুমীর—স্থলে বাঘ', কোন পথে যাইলে রক্ষা পাই? হায়! কে বলিবে? মানুষ? না—না, মানুষ দুর্ব্বল—চির দুর্ব্বল; সে আপনার ভারে আপনি অস্থির, আপনার স্বার্থ লইয়া সে সদাই ব্যস্ত। সে জানিলেও কি বলিয়া দিবে? তাই ডাকিতেছিলাম,—মা! সর্ব্বমঙ্গলে দুর্গতিনাশিনী অভয়ে!—"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?"

এ আত্ম-বিস্মৃত উন্মত্ত ভাব শুধু আমার নয়।—যখন প্রাণে প্রথম বৈরাগ্যের সূত্রপাত হয়, তখন মানুষ মাত্রেরই প্রায় এইরূপ হইয়া থাকে। ঘটনা স্রোতের অনিবার্য্য ঘাত-প্রতিঘাতে যখন উপর্য্যুপরি প্রাণে নৈরাশ্যের বিকট ছায়া পতিত হয়, তখন মানুষের মন এই ভাবে বিভোর হইবেই; ইহা প্রকৃতির নিয়ম,—ইহা স্বভাবসিদ্ধ। তা' কি ভাল বিষয়ে—কি মন্দ উদ্দেশ্যে। অভাব মানুষের চির সহচর। এই অভাব যখন মানুষের অন্তঃস্তলে প্রবলরূপে আঘাত করে,—একবার নয়—দুইবার নয়—পুনঃ পুনঃ যখন প্রত্যেক বিষয়ে,—প্রত্যেক ঘটনায়,—কখন ধন মান, কখন প্রেম প্রীতি,—কখন বিষয় বিভব, প্রত্যেক কার্য্যে—কখন পাশব ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অভাবে যখন বারম্বার 'যে ডাল ধরে সেই ডাল ভাঙ্গে;—তখন দুর্ব্বলচেতা মানুষ অধীর হয়—উন্মত্ত হয়—প্রলাপ বকে; এমন কি সময়ে সময়ে আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এই সময়—এই সমস্যায়—এই ঘটনা স্রোতের ঘাত প্রতিঘাতে আবার কেহ কেহ এমনও হইয়া থাকে, যাহার আদর্শ জীবন মানব-জগতে শীর্ষস্থানেও উপনীত হয়। যে বেশী পাষণ্ড; সে যদি ঈশ্বর পরায়ণ হয়, তবে তাহার প্রতিভা—তাহার সুযশ সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

এখন সে কথা যাক। বৈরাগ্যের এই প্রথম অবস্থা বড়ই জটিল—বড়ই সমস্যা পূর্ণ, বড়ই রহস্যময়। এই প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, মানুষের ভাগ্য বড়ই শুভপ্রদ হয়। কিন্তু হায়! কয়জনের অদৃষ্টে এ সুপ্র-

সাদ ঘটিয়া থাকে? যেরূপ অত্যুজ্জ্বল অনন্ত কিরণ সম্পন্ন মার্ত্তণ্ডের অতুল জ্যোতির নিকট অতি ক্ষুদ্রতর কণা পরিমিত দীপ-শিখায় কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ সংসারের অসীম ধন-জন-সমাকীর্ণ, বহু ভোগ-বিলাস দ্রব্যপূর্ণ, কমনীয় কামিনীর বিলোল কটাক্ষ, স্বচ্ছ কাঞ্চনের মোহিনী আকর্ষণের সহিত, প্রথম বৈরাগ্যের অতি দূর—অস্পষ্ট অদৃশ্য—অথচ অপূর্ব্ব শক্তি সম্পন্ন মাহাত্ম্যের কোন কার্য্যই বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। এক আধ জনের ভাগ্যে যাহা মিলিয়া থাকে, তাহা স্বতন্ত্র, তাহাতে সাধারণ নিয়ম খাটিতে পারে না। তাই বলিতে ছিলাম, বৈরাগ্যের প্রথম অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর! ইহাতে জ্ঞানের লোপ হয়, বুদ্ধিবৃত্তির চালনা থাকে না, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দূরে পলায়ন করে, প্রাণ অস্থির হয়। কোন কার্য্যে—কোন বিষয়ে মন স্থির থাকে না—এ অবস্থা—এ গভীর সমস্যার কাল না গৃহী—না সন্ন্যাসী! তাই বলিতেছিলাম, ভাই, তুমি যদি কখন এ হেন কঠিন সমস্যায় পতিত হও, তবে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, তুমি একদিন প্রাণের ব্যাকুলতায় অধৈর্য্য হইয়া নিশ্চয়ই নির্জ্জনে বালকের ন্যায় অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিবে, আর মুখে তোমার উপাস্য দেবতার নাম করিয়া ব্যাকুল ভাবে প্রকৃতি বা শক্তিকে ডাকিবে! উপাসক হও, তবে বলিবে,—"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা"?

প্রকৃত সংসার বা সন্ন্যাস উভয়ই কঠিন ধর্ম্ম ও কঠিন আশ্রম! প্রকৃত সংসারী বা সন্ন্যাসীর দায়িত্ব অতি কঠিন। ইহ সংসারে এ দুয়েরই অভাব বিশেষরূপ বিদ্যমান। ধর্ম্ম-শাস্ত্র সঙ্গত প্রকৃত সুখী বা সন্ন্যাসী হইতে হইলে কত ত্যাগ স্বীকার—কত সহিষ্ণুতা—কত অধ্যবসায়—কত তিতিক্ষা-কত সৎগুণের প্রয়োজন, তাহা নিম্নলিখিত কোন সাধুপ্রমুখাৎ শ্রুত এই গল্পটী আলোচনা করিলে কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গল্পটির সারাংশ এই;—

কোন মনীষা সম্পন্ন ঋষিতুল্য মহাত্মার দুইটি শিষ্য ছিল। শিষ্য দ্বয় বাল্যকাল হইতেই গুরুগৃহে থাকিয়া তদীয় ব্রহ্মচর্য্যরূপ কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অপনা আপন প্রতিভাবলে অতি অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কিন্তু কেবল মাত্র শাস্ত্রালোচনা করিলে ব্রহ্মচর্য্যার প্রকৃত মহত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ বা সেই কঠোর ব্রতের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সাধন হয় না। যে যে মহৎ দ্রব্যগুণের সংস্পর্শে ব্রহ্মচর্য্যারূপ জ্বলন্ত আগুণের সৃষ্টি হয়, তাঁহাদের মধ্যে সেই সকল দ্রব্যের কোন কোন অংশের অভাব বা

অসম্পূর্ণত্ব ছিল। শিষ্যদ্বয় সে অসম্পূর্ণত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের গুরুদেব কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই কারণেই তিনি শিষ্যদ্বয়ের বিদায় কালে একটু ইতস্তত করিয়া কৌশল পূর্ব্বক কহিলেন যে, অমুক রাজ্যের অমুক রাজকন্যার নিকট গমন করিলে, তিনি তাঁহাদের উপযুক্ত আশ্রম অবলম্বনের কথা বলিয়া দিবেন। অর্থাৎ শিষ্যদ্বয় গার্হস্থ্য কি সন্ন্যাস আশ্রমীর যোগ্য, তাহা নির্দ্দেশ করিবেন।

শিষ্যদ্বয়ও উক্ত কথা মত গুরুদেবের নিকট বিদায় লইয়া রাজকুমারীর উদ্দেশে সেই রাজ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে রাত্রিকাল উপস্থিত হইল। তাঁহারা আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু অরণ্যের মধ্যে লোকালয় মিলিবে কিরূপে? সুতরাং তাহারা অনন্যোপায় হইয়া সেই বন মধ্যস্থ একটি সুবিস্তৃত বৃক্ষের তলে পর্ণ শয্যা রচনা করিয়া রাত্রি-যাপনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বৃক্ষ শাখায় শুক ও সারী স্ত্রী-পুরুষে নিম্নলিখিত ভাবে কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সারী কহিল,—"দেখ, ইহারা আমাদের আশ্রমে অতিথি হইয়াছে;—সমস্ত দিন উপবাসী, অতএব আমাদের সাধ্যমত অতিথি সৎকার করা প্রয়োজন।"

শুক উত্তর করিল,—"তা' সত্য বটে, কিন্তু আমরা সামান্য বিহঙ্গ হইয়া মানুষের কি উপকার করিতে পারি?"

সারী,—"না পারিই বা কি? আমরা একটু চেষ্টা করিলেই ত অনায়াসে আগুনের উপযোগী কোন পদার্থ আনিয়া দিতে পারি; তারপর ইহারা আহারের যোগাড় করিয়া লইতে পারিবে।"

তাহাই স্থির হইল। শুক স্থানান্তরে যাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বৃহৎ চঞ্চু দ্বারা একখণ্ড অগ্নিজনক পদার্থ আনিয়া বৃক্ষের নিম্নদেশে ফেলিয়া দিল; অতিথিদ্বয় অরণ্যের শুষ্কপত্র একত্রিত করিয়া তাহা দ্বারা আগুণ প্রস্তুত করিল। কিন্তু অনেক অন্বেষণেও আহার মিলিল না দেখিয়া, তাঁহারা বিষণ্ণ অন্তরে বসিয়া রহিলেন।

সারী শুককে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আগুন হ'ল বটে, কিন্তু এরা এখন খায় কি? আমাদের ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করা চাই;—এক্ষণে যে কোন উপায়ে হোক, অতিথি সৎকার করিতেই হইবে। অতএব আমি এই আগুনে পুড়িয়া মরি, তাহাতে এরা এক প্রকার আহারের সংস্থান

করিতে পারিবে।” শুক উত্তর করিল,—“তুমি যদি যাও, তবে আমারই বা বেঁচে থেকে কি লাভ! আর বিশেষত এরা দেখছি দু' জন, তোমার একার মাংসেই বা দুজনের কি হ'বে। অতএব আমিও দেহত্যাগ ক'রে অতিথির সেবা করি।” তাহাই স্থির হইল;—উভয়েই এক সময়ে প্রজ্ব-লিত আগুনে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অতিথি সৎকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা-ইল। সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে, কত ত্যাগ-স্বীকার—কত সহিষ্ণুতা—কত ঔদার্য্য—কত মহত্ত্ব দেখাইতে হয়, তাহার অসাধারণ কীর্ত্তি ও অলৌকিক আদর্শ রাখিয়া শুকসারী সংসারীর ও সংসার ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষার স্থানীয় হইল।

নির্দ্দিষ্ট আশ্রম অবলম্বনে অভিলাষী হইয়া শিষ্যদ্বয় রাজকন্যার উদ্দেশে সেই রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজপথের একস্থানে বিস্তর জনতা ও পরস্পরের মধ্যে বচসা হইতেছে দেখিয়া, তাঁহারা কিছু কৌতূহলাক্রান্ত-হইয়া তাহার কারণ নির্ণয়ে উৎসুক হইয়া লোক পরম্পরায় জানিতে পারি-লেন যে, সেই নগরের রাজকুমারীর বিবাহোপলক্ষে ঈদৃশ লোকারণ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। নৃপতি কন্যার অঙ্গীকার এই যে, যে কোন ব্যক্তি অত্যুষ্ণ* এক কলস জলে স্নান করিয়া, বেশ আরামের সহিত অবস্থান করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন।

শিষ্যদ্বয় এই অবধি শুনিয়া দ্রুতপদে বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, সর্ব্ব শ্রেণীরই অসংখ্য লোক তথায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহারাও একস্থানে দাঁড়াইয়া এই কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। অনেকেই, রাজকন্যা লাভ করিব ও রাজ-জামাতা হইব ভাবিয়া, উষ্ণ জল পাত্রের নিকট গমন করে, আর স্পর্শ করিতে না করিতেই সন্ত্রাসে পশ্চাৎ পদ হয়। এইরূপে সর্ব্বগুণসম্পন্না পরম রূপবতী স্ত্রী রত্ন লাভে লোলুপ হইয়া রাজাধিরাজ রাজকুমার হইতে ইতর শ্রেণীর চির দরিদ্রাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

লগ্ন উত্তীর্ণ প্রায়;—কন্যার দুঃসাধ্য প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল না দেখিয়া রাজ-পিতা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে আর অধিকক্ষণ এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। এই সময়ে অকস্মাৎ এক গৈরিক বসনধারী, বিভূতি পরিলেপিত, দণ্ড কমণ্ডলু শোভিত—সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন; এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার সমস্তগাত্রবস্ত্র উন্মোচন পূর্ব্বক রাজ-

কন্যার প্রতিজ্ঞানুযায়ী সেই অত্যুষ্ণ জল-কলস লইয়া অবলীলাক্রমে সর্ব্বাঙ্গ বিধৌত করিয়া রীতিমত স্নান করিলেন। সভাস্থলে উচ্চৈঃস্বরে ধন্যবাদ পড়িয়া গেল, চতুর্দ্দিক হইতে মাঙ্গলিক প্রথানুযায়ী শঙ্খ ও হুলুধ্বনির গভীর নিনাদ গগণ-মার্গ ভেদ করিল। অমনি অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ হৃষ্টচিত্তে সুসজ্জিতাবস্থায় নানা প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্য নব জামাতার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার বেশ ভূষা পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু সেই মহাপুরুষ এবম্বিধ পার্থিব সুখের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন। অমনি অসংখ্য রাজপুরুষ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া অতি বিনয় বচনে বিবাহে সম্মত হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি যখন কোন ক্রমেই স্বীকৃত হইলেন না, তখন সকলে বল পূর্ব্বক তাঁহার বিবাহ দিতে মনস্থ করিল।

বেগতিক দেখিয়া সেই আত্ম-চিন্তা-নিরত মহাপুরুষ ঊর্দ্ধশ্বাসে—যেন প্রাণের দায়ে, বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। রাজপুরুষগণ কেহ অশ্বারোহণে কেহ গজারোহণে তাঁহার অনুসরণ করিল। বিবাহ সভায়-সমাগত উপস্থিত দর্শকবর্গও তাহাতে যোগ দিল।

অনেক পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে একটি নিভৃত পর্ণ কুটীরের সম্মুখে সেই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী ধৃত হইলেন। বলা বাহুল্য, আমাদের পূর্ব্বোক্ত শিষ্যদ্বয়ও এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিবাহ সভায় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া অবধি তাঁহাদের অন্তরে কিছু বিস্ময় ও অদ্ভুত ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল; এক্ষণে তাঁহাকে স্পষ্ট চিনিতে পারিয়া আরও কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না।

রাজ পুরুষেরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিবাহে সম্মত হইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত না হইয়া বিনয় বচনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "কেন বাপু তোমরা নিরর্থক আমাকে কষ্ট দাও? আমি রাজকুমারীর পাণি গ্রহণাভিলাষে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি নাই। দেখিলাম, সকলেই রণে ভঙ্গ দিতেছে, তাই কৌতুহল বশত—উষ্ণ জলে স্নান করিলে কিরূপ আরাম পাওয়া যায়, পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, এই মাত্র। আমি সন্ন্যাসী, আমার বিবাহে বা রাজৈশ্বর্য্যে প্রয়োজন কি? কামিনী কাঞ্চন সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রবল শত্রু। অতএব তোমাদের অনুনয় করিতেছি, আমাকে আর বিরক্ত

করিওনা।” রাজ অনুচরগণ বিফল মনোরথ হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিলেন।

শিষ্যদ্বয় কিছু কৌতূহলভাবে অথচ হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“প্রভু! আপনি ও রাজকুমারী ত বিবাহ-ব্যাপারে মত্ত, এক্ষণে আমরা কাহার নিকট আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হই?—কে আমাদের উপযুক্ত আশ্রম অবলম্বনের কথা বলিয়া দিবে?”

পূর্ব্বোল্লিখিত গুরুদেব তখন ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—“কেন বাপু, তোমাদের আশ্রম অবলম্বনের কথা ত বলা হইয়াছে! যদি সংসারী হইয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে চাও, তবে অরণ্যমধ্যস্থ সেই শুক সারীর বিষয় চিন্তা কর;—আর যদি সন্ন্যাসী হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালন করিতে বাসনা থাকে, তবে উপস্থিত যাহা প্রত্যক্ষ করিলে, এই মত কার্য্য করিও।”

শিষ্যদ্বয় তখন নির্ব্বাক্, বিস্মিত ও কিং-কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে সবিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—“প্রভু যথেষ্ট হইয়াছে, আর পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। বুঝিলাম, আমাদের ব্রহ্মচর্য্যের এখনও অবসান হয় নাই। চলুন গুরুদেব, আপনার আশ্রমে ফিরিয়া যাই। সংসার ও সন্ন্যাস, এ দুই আশ্রমের মধ্যে আমরা কোনটিরও উপযুক্ত নহি। অদ্যাবধিও আমরা সংসার ও সন্ন্যাস এ দুয়ের কোন ধর্ম্ম পালনের অধিকারী হই নাই।”

গল্পটির মধ্যেই বড়ই মর্ম্মভেদী জীবন্ত সত্য ও অলৌকিক শিক্ষার বীজ নিহিত আছে। শুক সারীর মধ্যে যাহা দেখা যায়, তাহাই প্রকৃত সংসার-আশ্রমের কার্য্য—তাহাই সংসারীর ধর্ম্ম! কত সহিষ্ণুতা, কত ত্যাগ স্বীকার, কত ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে, তবে সংসার ধর্ম্ম পালন করা যায়—তবে সংসারী হইবার সামর্থ হয়! অতিথি সেবায়—শরণাগতকে রক্ষার জন্য জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। আর রাজ কন্যার বিবাহ ঘটনাটির মধ্যে যাহা প্রত্যক্ষী-ভূত হয়, তাহাই প্রকৃত সন্ন্যাস ধর্ম্মের অবলম্বন—তাহাই সন্ন্যাসীর লক্ষ্য। যখন পরমার্থ-পদ সার করিবে, তখন যদি পরম রূপবতী ও সর্ব্ব-গুণান্বিতা মহিষী লাভ করিয়া রাজরাজেশ্বর পদও পাওয়া যায়, তাহাও তুচ্ছ করিবে,—অধিক কি, সামান্য তৃণের ন্যায় ভাবিয়া তাঁহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিবে না। এই ত শিক্ষা—এই ত উপদেশ—এই ত সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম! কিন্তু হায়! সংসারে আজ কি ভীষণ হলাহল স্রোত উঠিয়াছে।

ঈদৃশ কঠোর দায়িত্ব ভার বহন করিয়া কয় জন সংসারী বা কয়জন সন্ন্যাসী কার্য্যক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া থাকেন? ঈদৃশ অমূল্য গুণসম্পন্ন সংসারী বা সন্ন্যাসী জগতে কয় জন মিলে? ঈদৃশ অসামান্য গুণের পূর্ণ অধিকারী সংসারে কয় জন পাওয়া যায়? এত সহিষ্ণুতা—এত ত্যাগস্বীকার করিয়া, এত প্রলোভন-জাল ছিন্ন করিয়া, কে সংসার বা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবে? তাই জগজ্জননী—জগৎপূজ্যা শঙ্করীকে জানাইতে ছিলাম, "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?"

মা! আমি দুর্ব্বল—মহাদুর্ব্বল! আমার সাধ্য কি মা যে, আমি এই গভীর উপদেশ ও জীবন্ত সত্যের অধিকারী হইয়া, সংসার বা সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালন করিতে সমর্থ হইব? আমি সংসারে কীটাণুকীট—ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর;—আমি সংসার-আশ্রমের বিষম-বিষে জর্জ্জরিত,—স্বার্থ সাধনে অন্ধ! আবার অন্যদিকে আমি কঠোর সন্ন্যাসের ভণ্ড ভেকধারী মাত্র! তবে মা! আমি কোন্ পথে যাই?—কোথায় দাঁড়াই, কি অবলম্বন করি? দুই দিকেই আমার প্রাণ টান্‌ছে—আমায় কে ডাক্‌ছে, অথচ কোন দিকেই যেতে পাচ্ছি না। বলে দে মা,—জগদম্বে! আমি কোন্ পথে যাই—কি অবলম্বন করি? হৃদয়ে বল দে মা! কর্ত্তব্য পথ চিনিয়ে দে মা! প্রাণে শান্তি-জল সিঞ্চন কর্ মা! মা! তোর ঐ রাতুল চরণ দু'খানি আমার বুকে চাপিয়ে দে মা, আমি উদ্ধার পাই! হায় কোথায় যাই—করি কি? কে জ্ঞান-চক্ষু দেয়,—কে এ মায়া-যবনিকা ভেদ করে,—কে সত্য পথে লইয়া যায়? আমি না গৃহী, না সন্ন্যাসী। এ দুয়ের কোনটিরও উপযুক্ত নই, অথচ আমার প্রাণ কে টান্‌ছে—আমায় কে ডাক্‌ছে, তাই এ মহা সমস্যায় পড়িয়া গভীর আঁধারে ডুবিয়া—ভীষণ ভবার্ণবে মগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি,— "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

পৌরাণিক-প্রশ্ন।

মহাশয়, কালী-সিংহের মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসন পর্ব্ব হইতে দুইটী আখ্যায়িকা সংক্ষেপে তুলিতেছি। পাঠক তাহাদের ঔচিত্যানুচিত্য বুঝুন, আমারও মন্তব্য আমি বলিব।

শান্তিপর্ব্বে আছে;—"চিরকারী গৌতমের পুত্র। গৌতম-পত্নী অহল্যা ইন্দ্রের সহিত ব্যভিচার দোষে লিপ্তা হওয়ায় তাঁহার স্বামী পুত্র চিরকারীকে জননীকে হত্যা করিতে আদেশ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। চিরকারী অনেক দিন বিলম্ব করিয়া পিতা মাতার গুণাগুণ আন্দোলন করিতে লাগিলেন। শেষে বিবেচনা করিলেন মাতা গুরুতর, অতএব এতাদৃশী মাতাকে কি প্রকারে বধ করি? অথচ, পিতৃ আজ্ঞাপালন না করা মহাপাপ; এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে গৌতম বাটী আগমন করিলেন। তখন পিতা পুত্রকে মাতৃ বধে বিলম্ব করিয়াছে দেখিয়া, সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, "পুত্র! অদ্য আপনার নামানুরূপ কার্য্য করিয়াছ।" আবার অনুশাসন পর্ব্বে দেখুন;—"অগ্নির পুত্র সুদর্শন মৃত্যুকে পরাজয় করিবার মানসে সদা অতিথি সেবা পরায়ণ ছিলেন। এক দিন তিনি বনে কাঠ কাটিতে যাইবার সময় তাঁহার স্ত্রী ওঘবতীকে বলিয়া যান, যে, আমার গৃহে, দেখিও, কোন অতিথি কোন অভিলাষ করিয়া আসিলে তাহা যেন পূরণ হয়।' ইত্যবসরে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের বেশে ওঘবতীর নিকটে অতিথি হইয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করি।" ওঘবতী তদীয় স্বামীর নির্দেশ পালনার্থ ব্রাহ্মণের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেছে, এমন সময় সুদশন বাটী আইসেন।' তিনি ইহা অবগত হইয়া কিছুই ক্ষুণ্ণ হইলেন না। ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের বেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন. "তোমার এই স্ত্রী সাধ্বী পতিব্রতা। ইহার অর্দ্ধশরীর নদীরূপে পরিণত এবং অপর অর্দ্ধ তোমার অনুগামী হইবে এবং তুমি মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ।" তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র রথ পাঠাইয়া সুদর্শন ও ওঘবতীকে স্বর্গে লইয়া গেলেন।

পাঠক! কেমন দুটী মজার বিসম্বাদী গল্প শুনিলে। এখন, চিরকারী পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া দোষী হইলেন, না ওঘবতীস্বামীর আদেশ পালন

করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিলেন ? স্থির করুন। পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ মাতৃবধ করিয়াছিলেন, সত্য। তাই বলিয়া, চিরকারী সেই ঘোর মহাপাতকে লিপ্ত হন নাই, তজ্জন্য তিনি কি অপরাধী হইতে পারেন ? কথনই নয়। চিরকারীর গল্প হইতে বরং আমরা এই উপদেশ পাই যে, যে ব্যক্তি বহুকাল ক্রোধ সংবরণ ও বহুবিলম্বে কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে সন্তাপসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। ভীষ্মের মুখে যুধিষ্ঠির এই সারগর্ভ কথাটী শুনিয়াছিলেন। কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তিই বা উপদেশটির সারবত্তা উপলব্ধি না করেন। আর কোন বাপই না, এমন বিচক্ষণ পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন ? কিন্তু ওঘবতীর আখ্যায়িকা শুনিলে, পাঠক, তুমি কি কাণে আঙ্গুল দিবে না ? এমন কি পতির আজ্ঞাপালন, যে আপনাকে নিরয়গামী করিতে হইবে। ওঘবতীর পাতিব্রত্যকে ধন্য ! ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম্মকে ধন্য ! পতি সুদর্শনকে ধন্য ! তাহার মৃত্যু পরাজয়কে ধন্য ! এবং তাহাদের দুজনকার স্বর্গ যাওয়াকেও ধন্য ! অধিক আর কি বলিব ?

[উপরে প্রকাশিত প্রশ্নে বা ধন্যবাদে ওঘবতীর উপাখ্যান আক্রান্ত হইয়াছে। এই প্রশ্নের বা সমস্যার কেহ মীমাংসা লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা তাহা আদরে নবজীবনে প্রকাশিত করিব। নবজীবন সম্পাদক।]

ভারতে ব্রাহ্মণ বাস।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ভারতের আদিম নিবাসী নহেন। তাঁহারা তাতারের নিকটবর্ত্তী স্থান বিশেষ হইতে আগমন করিয়া ভারতীয় পার্ব্বত্য জাতিদিগকে পরাজয় করিয়া ভারতে বাস করিয়াছেন। শূদ্রজাতিই ভারতের প্রকৃত আদিম বাসী। যে সকল পার্ব্বতীয় জাতি ব্রাহ্মণাদির অধীনত্ব স্বীকার করিয়াছে, তাহারাই শূদ্রনামে অভিহিত হইয়াছে। এই বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা কতকগুলি প্রমাণ প্রদর্শন করেন। শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের বিসদৃশ ঘৃণা ও অত্যাচার, কতকগুলি ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য, কতকগুলি জাতির আকৃতির সহিত ভারতীয় গণের সাদৃশ্য এবং বাইবেল কথিত প্রলয়ের বৃত্তান্ত—ঐ সকলের প্রমাণের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ সকল প্রমাণকে যথেষ্ট মনে করিয়া তাঁহারা নিতান্ত ইতিহাসবিরুদ্ধ ও অসম্ভব এই বিবরণ সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন; ইতিহাস মধ্যে আজি কালি উহা বিলক্ষণ স্থান প্রাপ্ত হইতেছে।

সত্য বটে, আমাদের দেশে প্রকৃত ইতিহাস নাই, কিন্তু এই ঐতিহাসিক ব্যাপার যে কালে সংঘটন হইয়াছিল অনুমান করা হইয়াছে, কোন দেশের সেকালের ইতিহাস নাই।

অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস পৃথিবীর কোন দেশেরই নাই; যৎকিঞ্চিৎ উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় মাত্র; নব্য পণ্ডিতগণ সকল দেশেরই প্রাচীন কালের ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন। কিন্তু সে উপকরণ ভারতে যত অধিক পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন দেশে সেরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেন না ভারতে প্রাচীন কালের গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এত প্রাচীন কালের গ্রন্থ কোন দেশেই নাই। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন, বেদের তুল্য প্রাচীন গ্রন্থ কোনও দেশেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না সুতরাং প্রাচীন কালের কোন ইতিহাস বিশ্বাস করিতে হইলে ভারতের ইতিহাসই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস যোগ্য। কিন্তু আমরা ভারতীয় কোন গ্রন্থেই এরূপ আভাস পাই না, যদ্দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মণাদি অন্যদেশ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছেন। যদি উহা সত্য হইত, তবে কোন না কোন স্থানে এরূপ আভাস থাকিত। অনেকে বলেন বেদাদি

গ্রন্থে উক্তরূপ কথা অনেক আছে। উদাহরণ স্বরূপ তাহার দুই একটীর বিষয় বলা যাইতেছে। শতহিম জীবিত থাক, বলিয়া যখন আশীর্ব্বাদ করার রীতিছিল, দেখা যাইতেছে, তখন, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে কোন হিম প্রধান দেশে তাঁহাদের বাস ছিল। যখন সোমরস দ্বারা তাঁহারা যজ্ঞ করিতেন, তখন যে দেশে সোমরস ছিল, সেইদেশে অবশ্য তাঁহাদের বাস ছিল। এই প্রকৃতির নানা প্রমাণ তাঁহারা আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যদি "শতহিমং জীবতু" বাদীরা হিমপ্রধান বাসী হয়েন। তবে যে বঙ্গবাসীরা "এক মাঘে জাড় পালায় না" বলিয়া প্রত্যেক আবশ্যকীয় কথার সহিত তুলনা দেয়, তাহাদের বাসও অবশ্য কোন হিমপ্রধান দেশে হইবে। আমরা প্রত্যেক কথারই খণ্ডন করিতে পারি কিন্তু প্রবন্ধের অত্যন্ত বিস্তার ভয়ে তাহা করিতে ক্ষান্ত হইতে হইল। যখন বেদাদি সকল গ্রন্থেই একই ভাবে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এক স্থান হইতে অর্থাৎ ব্রহ্মার অঙ্গবিশেষ হইতে উৎপন্ন, তখন অবশ্য বলিতে হইবে পাশ্চাত্য গণের উক্ত বাদ, আমাদের ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেবল অনৈতিহাসিক নহে অপ্রামাণিক। কেননা যে ভারতে সর্ব্বোচ্চ গিরি সমূহ, বিস্তৃত নদী, ভীষণ মরুভূমি, সুশ্যামল সমতলক্ষেত্র, ভীষণ জলপ্রপাত, বিবিধ প্রকার জীব ও উদ্ভিদ, সর্ব্বপ্রকার বস্তু এবং সুখজনক সমুদয় সামগ্রী ও শোভাময় নানা পদার্থ অবস্থিত, সেই পৃথিবীর সর্ব্বপদার্থের আদর্শ স্বরূপ সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে সুবুদ্ধি মানব উৎপন্ন হয় নাই! যেখানে সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ পদার্থের উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে, সেখানে সুবুদ্ধি মানবের উপাদান নাই! ঐ সকল সৃষ্ট উপাদন হইতে কি কেবল পশুতুল্য বনমানবেরই উৎপত্তি হইল? এই কি ভারতের উর্ব্বরতার গুণ? আমার বোধ হয় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই একথা বিশ্বাস করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ভারতের জল বায়ু, উর্ব্বরতা ও সর্ব্বসম্পৎ প্রাপ্ত হইয়াই অতি প্রাচীন কালে ভারতবাসী এত সভ্যতা ও উন্নতি বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাঁহারা একবারও ভাবিলেন না যে এমন উর্ব্বর ক্ষেত্র কি জন্য সুফল শূন্য হইল? দেশের প্রাকৃত শক্তি বলে ভিন্ন দেশীয়েরা উন্নতির পরাকাষ্ঠা পাইল, আর সেই দেশের সেই অদ্ভুত শক্তি হইতে কেবলমাত্র কতকগুলি বর্ব্বরজাতির স্থিতি সাধন হইল। এমন বর্ব্বর যে তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া সভ্যতম

ব্রাহ্মণাদির প্রতিযোগী হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র উন্নতি করিতে পারিল না। ভীল, কুকি, গারো প্রভৃতি জাতি কি এখনও পশুতুল্য নহে? জানি না, কোন যুক্তির বলে এই সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আরও আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহাদিগকে পাশ্চাত্যগণ ব্রাহ্মণাদির জ্ঞাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত ব্রাহ্মণাদির কোন বিষয়েই মিল নাই। কি বেশবিন্যাশ, কি আহারপ্রণালী, কি আচার ব্যবহার, কি গার্হস্থ্য প্রাণালী, কি ধর্ম্মপ্রক্রিয়া, কি রীতিনীতি—কোন বিষয়েরই পরস্পরের ঐক্য নাই। ঐক্যত দূরের কথা, সকল বিষয়েই পরস্পর পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিপরীত বলিয়াই ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া চিরকাল ঘৃণা করিয়া থাকেন। এই অধঃপাতিত অবস্থাতেও তাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণের কাছে ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকেন। এক বংশের সন্তানগণের মধ্যে কি এত প্রভেদ সম্ভব বিবেচনা করা যায়? আমাদের বোধ হয়, কখনই না। এক হইলে কোন না কোন বিষয়ে অবশ্য মিল থাকিত। কোন বিষয়েই যে মিল নাই, তাহা আমাদের দেখাইয়া দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার স্থান হয় না। বারান্তরে তাহার চেষ্টা করিব। এ প্রবন্ধে তাহার আবশ্যকতাও নাই; কেন না, যে প্রমাণবলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সত্য নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তাহা হইলে, আমাদের কোন প্রমাণই দিতে হইবে না, তাহা হইলে আমাদের ঐ চিরপ্রচলিত বাদই সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব এক্ষণে দেখা আবশ্যক, পাশ্চাত্যগণ এই সত্য স্থাপন করিবার জন্য যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার বল কত।

তাঁহাদের এক যুক্তি এই যে, ভারতীয় দ্বিজগণ শূদ্রগণের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করেন, জেতৃ জাতি বিজিত জাতির উপর যেরূপ অত্যাচার করে, সেই রূপ অত্যাচার করেন। তাই তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, শূদ্র এদেশের আদিম জাতি, দ্বিজ অন্যদেশ হইতে আগমন করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছেন। শাস্ত্র-লিখিত দেবাসুরের যুদ্ধ ব্যাপারকে দ্বিজ ও আদিম বন্য জাতির যুদ্ধ এবং দস্যু শব্দ হইতে দাস শব্দের উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি শূদ্রদিগকে নীচ বৃত্তিজীবী দেখিয়া আদিম বিজিতজাতি বিবেচনা করিতে হয়, তাহা হইলেও ভারতীয় মুসলমানদিগকেও আদিম ও বিজিত জাতি বলিতে হয়। কেন না

হিন্দুরা মুসলমানদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন অর্থাৎ তাহাদের স্পর্শমাত্রে আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করেন, এবং দেশে যত নীচ শ্রমসাধ্য কার্য্য, তৎসমস্তই মুসলমানের বৃত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট, সম্ভ্রান্ত সমস্ত কার্য্যই হিন্দুর একচেটিয়া বলিলেই হয়। অতি অল্পদিন মাত্র মুসলমানের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছে, তৎস্থানে সমদর্শী ইংরাজ জাতি রাজপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানের এই দুর্দ্দশা। যদি হিন্দু আপন রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে পারিত, তাহা হইলে আর শত বর্ষ পরে কি মুসলমানের অবস্থা নিতান্ত শীর্ণ হইত না? সে সময়ে মুসলমানের সেই অবস্থা দেখিয়া মক্ষমূলের ন্যায় পণ্ডিতগণ এই যুক্তি অবলম্বনে অবশ্যই বলিতেন, মুসলমানেরাই ভারতের আদিম নিবাসী। হিন্দুরা বিদেশ হইতে আসিয়া মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। অতএব এযুক্তি নিতান্ত অসার। ইহাদ্বারা বিপরীতই সপ্রমাণ হয়। মুসলমানের উদাহরণ গ্রহণ করিলে শূদ্রদিগকেই বিদেশ হইতে আগত বলিয়া বোধ হইতে পারে। বোধ হয়, কিছুকাল তাহারা যবন দিগের ন্যায় এদেশে আধিপত্য করিয়া পরিশেষে বিজিত ও দুরবস্থা-প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের তাহাও বোধ হয় না। কেননা শূদ্রগণ আবহমান কাল দ্বিজাতির প্রতি যেরূপ আন্তরিক ভক্তিকরে এবং দ্বিজগণ শূদ্রকে বিশ্বাস করিয়া যেরূপ নিয়ত পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, জেতৃ ও বিজিত মধ্যে কখন এরূপ ভাব হইতে পারে না। নিতান্ত সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করিলেও কখন জেতৃ ও বিজিতের মধ্যে এরূপ ভাব জন্মিতে পারে না। কিন্তু দ্বিজাতিগণ কখনও তাহাদিগকে আপনাদের তুল্য ভাবেন নাই, নিয়তই তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়াছেন, অতি নিকৃষ্ট কার্য্য তাহাদিগের জীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, এই ভয়ানক বিসদৃশ ব্যবহারেও জেতৃ ও বিজিতের মধ্যে এরূপ সদ্ভাব হইল,—ইহা কি প্রকৃতি-সম্মত না ইতিহাস-সম্মত? কোন্ যুক্তি ইহার পোষকতা করিতেছে—কোন ইতিহাস ইহা সমর্থন করিতে পারে? কেহ কেহ বলেন, শূদ্রেরা বাস্তবিকই মনের সহিত দ্বিজাতির সেবা করিত না। অক্ষমতা নিবন্ধনই করিত ও কালে অভ্যাস বশত তাহাদের তাহা সহ্য হইয়াছিল; তথাপি মধ্যে মধ্যে তাহারা দ্বিজাতির বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছে, তাহাদের সহিত সমান হইবার চেষ্টা করিয়াছে। আমাদের বোধ হয় একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেননা পাশব শাসনে কখনও মানবকে চিরকাল এরূপ

নীচভাবে শাসন করিয়া রাখিতে পারে না। কোন দেশের ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি বলেন শূদ্রগণ মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণদের সহিত সমান হইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সে চেষ্টা তাহাদের নয়। এক্ষণে যেমন পুরুষগণ স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছেন, সেইরূপ সময়ে সময়ে দ্বিজাতিগণও শূদ্রকে আপনাদের সহিত সমান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শাক্যসিংহ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি যিনি যিনি বর্ণভেদ রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই দ্বিজকুল সম্ভূত। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সমজসংস্কারক রামমেহেন রায় প্রভৃতিও দ্বিজ সন্তান। কোন কোন শূদ্র সঙ্গে থাকিয়া সহায়তা করিতেছেন মাত্র। কিন্তু কেহই আপনাদিগকে অত্যাচারিত মনে করিয়া নিজে সমাজ বিরোধী হয়েন নাই। জেতৃ ও বিজিত জাতির মধ্যে এরূপ অপ্রাকৃতিক ও অনৈতিহাসিক ব্যাপার নিতান্ত অসম্ভব সুতরাং এযুক্তি এককালে সারবত্তা হীন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিগণের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে লাটিন,গ্রীক হিব্রু প্রভৃতি ভাষার সহিত সংস্কৃতের অনেক শব্দের মিল আছে সুতরাং ঐ সকল ভাষীগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ অবশ্য এক ভাষী ছিলেন। আমাদের বোধ হয় তাঁহাদের এ যুক্তিও নিতান্ত অসার। কেন না আমরা দেখিতেছি বাঙ্গালা অনেক শব্দের সহিত পারস্য ভাষার অনেক শব্দের উক্ত প্রকার মিল দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, দরগা দুর্গা,—প্যাগম্বর দিগম্বর,—কোরাণ, পুরাণ,—রহিম রাম,—মহম্মদ মহাদেব,—ভেস্ত বিষ্ণু,—মহরম মহোৎসব—এই সকল শব্দ আমরা আধুনিক শব্দ-বিদ্যা প্রাণালী অনুসারে বিচ্ছেদ করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারি, কিন্তু প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি ভয়ে নিরস্ত হইলাম। এই সকল শব্দের ঐক্য দেখিয়া কি হিন্দু ও মুসলমানের পূর্ব্বরুষগণকে একভাষী বলিতে হইবে? বাস্তবিক ভাষা তত্ত্বানুসারে, বাঙ্গালী, ইংরেজ, জর্ম্মান ও মার্কিনদিগের পূর্ব্বপুরুষ এক ছিলেন, না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। সুতরাং এ যুক্তিতেও আদো সারবত্তা নাই।

উপরোক্ত পণ্ডিতগণ "আর্য্য" শব্দের উপর প্রবল বল প্রয়োগ করেন। তাঁহারা বলেন, পৃথিবী যখন ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ন ছিল, যখন সকল মানব অনায়াসলভ্য পশুবৎ বন্য ফল মূল, মাংস ও দুগ্ধ মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তখন এক জাতীয় মনুষ্য কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিল; ঋ ধাতুদ্বারা তাহাদের কৃষিকর্ম্ম বুঝাইত। সেই জন্য সেই জাতি

আর্য্য অর্থাৎ চাসা নামে অভিহিত হইল। সেই গৌরবকর আর্য্য—চাসা—শব্দ তাহাদের জাতীয় আখ্যা হইল এবং তাহাদের সন্ততিগণ যে যে দেশে গেল, সেই জাতীয় আখ্যা তাহাদের সঙ্গে চলিয়া গেল। সেই জন্য ঐ আর্য্যশব্দ—Aryan, Iran প্রভৃতি রূপে নানা দেশে চলিত হইল। যে যে জাতির মধ্যে ঐ আর্য্য বা উহার অপভ্রংশ শব্দ প্রচলিত আছে, তাহারা সকলেই সেই আদিম আর্য্য জাতির সন্তান। কিন্তু এটী নিতান্ত অসম্ভব কথা। আমাদের বোধ হয়, ইহার মূলে কোন প্রকার যুক্তিই নাই; কেন না এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ আর্য্যশব্দ যখন সকলে একস্থানে মিলিত ছিল, তখনই প্রচলিত ছিল। কেননা চাসার মান সেই আদিম কাল ভিন্ন অধিক উন্নতির সময়ে সম্ভবে না। যখন নানা প্রকার শিল্প, বাণিজ্য ও বিদ্যার উন্নতি হইয়াছে, সে সময়ে আপনাকে কেহ চাষা বলিয়া সম্মানিত করিতে আশা করে না। মানব উন্নতির সময়ে আপনার সম্মানোপযোগী পদসৃষ্টি করেন। উন্নতির সময়ে হইলে জ্ঞানী, বিদ্বান, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কোন রূপ আখ্যা ধারণ করিতেন। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আর্য্যশব্দ আদিম সময়েই প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা যদি হইল, তবে ঐ শব্দের উচ্চারণগত এত প্রভেদ হইল কেন? যে শব্দ পিতৃ পিতামহাদি কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, সে শব্দ দেশে দেশে কেন এত ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হইবে, সিন্ধুকে হিন্দু বলা সম্ভব; কেননা যাঁহারা হিন্দু বলিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ আদৌ ঐ শব্দ উচ্চারণ করেন নাই। কিন্তু আর্য্য শব্দ ত চিরাভ্যস্ত। ভাষা ভেদ হইলেও অভ্যস্ত শব্দের উচ্চারণ ভেদ হয় না। Lieutenant শব্দ না থাকিলেও ত লেফ্‌টেনাণ্টরূপে উচ্চরিত হয়; তবে কেন আর্য্য Aryan রূপে লিখিত হইয়া আদিমকালে যেরূপ উচ্চারিত হইত, সেইমত উচ্চারিত হয় না।

সংস্কৃত ভাষায় আর্য্য শব্দের যেরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহতে উহাকে কখনই জাতি-বাচক শব্দ বলিয়া বোধ হয় না। কোন্ ভাষায় স্বজাতি বাচক শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়া গুণ বাচক হয়? যদি কোন বাঙ্গালী আর একজন বাঙ্গালীকে 'বাঙ্গালী' বিশেষণে অভিহিত করে, তবে কি তাহাতে তাহার কোন সম্ভ্রম প্রদর্শিত হয়? অবশ্যই হয় না। তবে, আর্য্য রাম, আর্য্যা জানকী, আর্য্য ইন্দ্র ইত্যাদি পদবী কি রূপে ব্যবহৃত হয়? সংস্কৃত ভাষার যেখানেই ঐ পদ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, সেই খানেই

উহাতে সম্ভ্রম জ্ঞাপনা বুঝায়। স্বজাতি বাচক শব্দের এরূপ অর্থ কেন হইল?

যদি বলা হয়, যে পূর্ব্বে আর্য্য শব্দ জাতিবাচক ছিল বটে, কিন্তু পরে আর উহা ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইত না—তখন উহা পূজ্য অর্থেই ব্যবহৃত হইত; তাহাতে জিজ্ঞাসা করি, কি জন্য এরূপ ঘটিল? কোন্ জাতিবাচক শব্দ উহার স্থান অধিকার করায় ঐ প্রাচীন শব্দের ব্যবহার বন্ধ হইল? এমন কোন শব্দই ত পাওয়া যায় না। হিন্দু শব্দ অতি আধুনিক; কোন প্রাচীন বা মধ্য কালের গ্রন্থে হিন্দুশব্দ দৃষ্ট হয় না। তবে কোন শব্দ আর্য্য শব্দকে পদচ্যুত করিল, আর ঐ পদচ্যুত শব্দ সম্ভ্রমেই বা কেন প্রযুক্ত হইল? সেই উন্নত কালেও কি চাসার মান মর্য্যাদা ছিল? একথা কখনই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

অনেকে আর্য্যবর্ত্ত নাম দেখিয়া আর্য্যনাম জাতি-বাচক মনে করেন। কিন্তু তাহা হইলে ব্রহ্মাবর্ত্ত মধুপুর প্রভৃতি নাম দেখিয়া ব্রহ্ম প্রভৃতি জাতির বর্ত্তমানতা স্বীকার করিতে। যদি নিতান্তই অর্থেরপ্রয়োজন হয়, তবে যেখানে পূজ্যগণের বাস তাহাই আর্য্যবর্ত্ত, এই রূপ অর্থ করিলে দোষ কি?

এক্ষণে হয়ত অনেকে বলিবেন, আর্য্য যদি আমাদের জাতীয় আখ্যা নহে, তবে, আমাদের জাতীয় আখ্যা কি ছিল? আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যখন আর্য্য শব্দে জাতীয় রূপে ব্যবহৃত হওয়া রহিত হইয়া ছিল, তখন আমাদের জাতীয় আখ্যা কি ছিল? অবশ্য তাঁহারা ইহার উত্তর দিতে পারিবেন না। কিন্তু আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। আমাদের জাতীয় কোন আখ্যা ছিল না। আমাদের জাতির, আমাদের ধর্ম্মের, আমাদের ভাষার, আমাদের দেশের স্বতন্ত্র আখ্যা ছিল না। আমরা প্রকৃত মানব আমাদের ধর্ম্মই ধর্ম্ম, আমাদের ভাষাই দেব-ভাষা, আমাদের স্ব দেশই প্রকৃতির বাস ভূমি। অন্য সকল মানব ম্লেচ্ছ, সকল ভাষাই ম্লেচ্ছ ভাষা, আমাদের শাস্ত্র সম্মত আচারের বিরোধী গণই ম্লেচ্ছাচারী। আমাদের মূল ভাষার নাম সংস্কৃত নহে; বৈদিক ভাষার সংস্করণে সংস্কৃত হইয়াছে, আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ নহে। যে পর্য্যন্ত শকুন্তলা পুত্র ভরত শাসন করিয়াছিলেন সেই ভারতবর্ষ। আর্য্য আমাদের সদাচার সম্পন্ন গণের নাম; কদাচারীগণ অনার্য্য নামে অভিহিত হইত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ও কদাচার পরায়ণ হইলে, অনার্য্য নামে অভিহিত হইত।

ততস্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে চিত্রসেনে ন্যবেদয়ন্
গন্ধর্ব্ব রাজস্তাম্ সর্ব্বানব্রবীৎ কৌরবান্প্রতি
অনার্য্যান্ শাসত্যেতাং চিত্র সেনোহ্যমর্ষণঃ

বনপর্ব্ব ২০০অধ্যায়।

তখন তাহারা সকলে সমবেত হইয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের নিকট গমন পূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিল, চিত্রসেন অধীর হইয়া তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা সেই অনার্য্যদিগের শাসন কর।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন প্রমুখ ক্ষত্রিয়গণ এখানে অনার্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় আর্য্য কোন জাতি নহে; ইংরাজ প্রভৃতি আমাদের জ্ঞাতি নহে; ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বিদেশ হইতে আগত ভারত বিজেতা নহে; এবং শূদ্র দ্বিজগণের শত্রু, অসুর অথবা দস্যু নহে। যাঁহারা ঐ বিশ্বাসে পতিত হইয়া গৃহবিচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহারা সাবধান হয়েন, এই আমাদের অভিপ্রায়।

শোক-স্মৃতি।

—oo—

(বর্ষ-শেষে)।

কালের দোলায় চড়ি, একটি বরষ মোর
চলে গেল—বয়ে গেল—ভাঙ্গিল না ঘুম-ঘোর!
কত হাসি, কত কান্না, কত যে বিষের বায়ু
বুকে করি, নিয়ে গেল, দলিয়ে কুসুম-আয়ু!
কত প্রাণে দিয়ে গেল, নিরাশার হলাহল
কত চোকে ফুটাইল, মরমের তপ্ত জল!
একটি বরষে আজ হয়ে গেল কত-কি-যে
শত শত হাসি গুলি অশ্রুধারে গেছে ভিজে!
সাঁঝের মুকুল গুলি, ঝরিছে সাঁজের কোলে
কত যে কুসুম-বালা যৌবনে—আঁখির জলে!
দেখিনু চাঁদের কত জনম মরণ তান,
শুনিনু নদীর বুকে, উদাস—উচ্ছ্বাস গান্!
দেখিনু তারার সাথে ফুলের কোমল বাঁধা
কেউ খসে—কেউ ঝরে—ভাবের গোলক-ধাঁধাঁ!
শীতের মরণে কেন বসন্তের ভরা হাসি?
এক সাথে হাসি—কান্না!—এই সে ভোজের বাজি!
এই মত ছয় বোনে, বরষের কোলে বসি
খেলি' খেলি' চলি গেল, ভবের গতিতে মিশি!
বসন্তের পদ-তলে লুটাইয়ে, এক পাখী
গেয়েছিল ছুটি গান সাজাইয়ে ছোট শাখী!
মরমের শাখী মোর, মরমের বিহগিনী
কোথা গেলি—কোথা গেলি আঁধারের আদরিণী!
বিষাদের বিজনেতে একটী ভাবের বালা
উষার কনক-কোলে গাঁথিত মুকুতা-মালা!

দগধ-মরম-শ্বাসে মলয়ের বপু্ খানি
নিতি নিতি বাড়াইত —কি ভাবে কেন গো জানি!
এক দিন ফুটেছিল সোণার সুন্দর শশী
বিষাদের বনমাঝে পড়েছিল সেই রশ্মি!
হেসে ছিল ফুল-বন, গেয়ে ছিল পাখী গুলি
নেচে ছিল লতিকারা ললিত লহরী তুলি!
সেই হতে হৃদে তার ছুটে ছিল ফুল-বাস
ননীর মু-খানি পরে খেলে ছিল চাঁদ-হাস!
আজি সেই হৃদি খানি দলিত কলিকা প্রায়,
চাঁদ মুখে পড়িয়াছে মেঘের মরণ ছায়।
এক আশা বুকে বেঁধে আজিও সে বেঁচে আছে—
সেই ফুল, সেই চাঁদ, যদি বা ফুটে গো পাছে!
কে জানে রে পরিণাম? কেমন কায়াটি তার?
ফুল-ময়-দেহ কিবা আঁধারের অবতার!
সংসারের পোকাগুলি একটি বরষ পোষে,
শিরায় শিরায় ও যে, কতটী শোনিত শোষে!
বেহুস্ মানুষ তবু—সময়ের অণুগুলি
মরমের কোলে হাসে ধূলির খেলায় ভুলি!
একটী বরষে মোর কত যে ঝরিয়া গেল
খসিল না মরমের একটী বিষের শেল!
ঋণেতে মরত গড়া—জীবনের সার গণা,
যোগ দিতে হয়ে গেছি বিয়োগের শত কণা!
হাসিয়া ঝরিয়া গেছে ছিঁড়িয়াছে প্রাণ-তার
ধিকি ধিকি জ্বলে আশা—মরিয়াছে অশ্রু-ভার!
সাদা সাদা ফুলগুলি মলিন মরম কোণে,
একদিন ফুটেছিল জ্যোছনার আলাপনে!
কোথা সে চাঁদের হাসি, কোথা সে কুসুম-বাস
নিরাশার ঢেউগুলি খেলিতেছে চারি পাশ!
আকাশে তপন আছে, কঠোর শীতল তান,
শশীটী দেহটী বাঁকি, গাহিছে কপট গান!

খেলিছে ব্যোমের কোলে চিলের বিশদ পাখা
রাখিতে স্বরগ-শোভা, আমা হতে চির ঢাকা!
বিহগেরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কি-যেন-কেমন গায়,
মরুর মরীচি মাখা কোমল মলয় বায়!
প্রকৃতির সুষমাটী, আঁধারে মিশায় অই,
আমার এ বুক্ ভাঙ্গা কথা গুলি কারে কই?
মরিয়াছি—মরিতেছি—মরিব গো চিরকাল,
মুহূর্ত্তে ঝরিয়া গেল জীবনের গাঁথা মাল!

শ্রীকমলচন্দ্র দে।

আকিয়াধল গ্রাম,

পোঃ লৌহজঙ্গ, ঢাকা।

বঙ্গদেশের গ্রহাচার্য্যগণের জাতিনির্ণয়।

গ্রহাচার্য্যগণ কি প্রকার ব্রাহ্মণ ও ইঁহাদের অধিকারাদি কি ইত্যাদির বিষয় আমরা স্বয়ং কিছুই বলিব না, তবে পূর্ব্বতন মহামহোপাধ্যায় মনীষীগণ প্রাচীন শাস্ত্র মন্থন করিয়া কি প্রকাশ করিয়াছেন এবং কি প্রকার ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছেন, প্রমাণার্থ উহারই প্রতিলিপি লিখিত হইল।

নিম্নোল্লেখ্য প্রথম ব্যবস্থা পত্র খানি কোন অসংস্কৃতবিৎ ব্যক্তি কৃষ্ণনগর রাজধানী হইতে নকল করিয়া আনয়ন করিয়াছেন। আমি উহার অবিকল অনুলিপি লিখিলাম: আমার মতে একটি স্থানে দুর্ব্বোধ ও অশুদ্ধ আছে, বোধ হইতেছে।

শ্রীহরি শরণং

নবদ্বীপস্থ মহামহিম শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বর্গেষু।

নিবেদনমিদং অমাদের প্রশ্ন এই, দৈবজ্ঞগণ ব্রাহ্মণ কি না এবং ক্ষত্রিয়ের নমস্য কি না, ইহার চলিত শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থা দিতে আজ্ঞা হয়।

তত্র প্রথম প্রশ্নোত্তরং।

গৌড় দেশে আচার্য্যাপর নামা দৈবজ্ঞ, ব্রাহ্মণ এব সতু ন প্রকৃষ্টো ভবতি।

অত্র প্রমাণং, ব্রাহ্মণ বিশেষস্য নাম বিশেষ প্রশ্নে ব্রহ্ম-যামলে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে। শরদ্বীপেচ বেদাগ্নিঃ শাকদ্বীপেচ সিদ্ধতি ভূমধ্যেচ ব্রহ্মচারী দৈবজ্ঞো দ্বারকাপুরে। দ্রাবিড়ে মৈথিলে চৈব গ্রহবিপ্রেতি সংজ্ঞকো। অঙ্গদেশে ধর্ম্মবক্তা পাঞ্চালে শাস্ত্রি সঙ্গকঃ। সারস্বতে শুভমুখো গান্ধারে চিত্রপণ্ডিত ত্রৈহুতে তিথি-বিপ্রো নাটকে ঋক্ষসূচক। উদ্যানে জ্যোতিষ বিপ্রো ব্রহ্মলে বিধিকারকো বভ্রাটে যোগবেত্তাচ নিটালে দেবপূজকো। রাঢ়দেশে উপাধ্যায়ো গয়ায়াং তন্ত্রধারকঃ কলিঙ্গে জ্ঞানবিপ্রঃ স্যাৎ আচার্য্যো গৌড়দেশকে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে। বিপ্রশ্চ জ্যোতির্গণনাৎ বেদনাচ্চ নিরন্তরং বেদ ধর্ম্মপরিত্যক্তো বভূবগণকোভুবি॥

গ্রহ-যামলে। গ্রহবিপ্রমুখাদ্রাজা শৃণুয়ান্নবপঞ্জিকাং। হস্তে কৃত্বা ফলং পুষ্পং ন শূদ্রগণকাস্মতঃ।

ভবদেব ভট্ট ধৃতং। গ্রহে দেয়ানি দানানি গ্রহে দেয়াচ দক্ষিণা, গ্রহ বিপ্রায় দাতব্যা চান্যথা বিফলী ভবেৎ।

পুণ্যব্রহ্মবৈবর্ত্তে। বিপ্রোঽভিচার কর্ত্তাচ হিংসকো জ্ঞানদুর্ম্মদঃ যাত্যেব মন্ধতামিশ্রং বর্ষাণামযুতং ব্রজ। তদাভবতি দৈবজ্ঞো হ্যপ্রদানী চ দুর্ম্মতি স্ততঃ শূদ্রো ভবেৎ বিপ্রো ভোগেন কর্ম্মণস্তথা॥

দীপিকায়াং। তস্য সর্ব্বৌষধি স্নানং গ্রহবিপ্র সুরার্চ্চনং ইতি এবম্বিধানি বহূনি বচনানি সন্তি। লিপি বাহুল্যাদুপেক্ষিতানি॥

দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরং।

দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াণাং নমস্য এব ভবতীতি॥

তত্রপ্রমাণং। ক্ষত্রিয়নৃপতি যাত্রাকরণে। পূজ্যান্ দ্বিজাংশ্চ সংপূজ্য সাম্বৎসর পুরোহিতৌ। গজ বাজি পদাতীনাং প্রেক্ষ্য কৌতুক মাচরেৎ। জয়মঙ্গল শব্দেন ততঃ স্বভবনং বিশেৎ। ইতি শতাবধান ভট্ট ধৃত বচনে দৈবজ্ঞস্য রাজ পূজত্বাভিধানং॥

প্রত্যুত গণক ব্রাহ্মণস্যাপি ক্ষত্রিয়াভিবাদনে প্রায়শ্চিত্ত মাহ। ব্রাহ্মণ ইত্যনুবৃত্তৌ মিতাক্ষরায়াং হারীতঃ। ক্ষত্রিয়স্যাভিবাদনে অহোরাত্র মুপবসেত্তথা বৈশ্যস্যাপি শূদ্রস্যাভিবাদনে ত্রিরাত্র মুপবসে দিতি॥

রাজ-ব্যবহারে মনুবচনং। শ্মশানেষ্বপিতেজস্বী পাবকেনৈব দুষ্যতি হূয়মানশ্চ যজ্ঞেষু ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে। এবং যদ্যপ্যনিষ্টেষু বর্ত্তন্তে সর্ব্ব কর্ম্মসু সর্ব্বথা ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ পরমং দৈবতং হি তৎ। ইত্যাদিবচনে কুৎসিত ব্রাহ্মণস্যাপি ক্ষত্রিয় পূজ্যাভিধানমিতি।

যথা মহিষমর্দ্দিনী তন্ত্রবচন মন্যচ্চ বিরুদ্ধ বচনং—তৎউক্ত বচনানাং বিরোধাৎ লৌকিক ব্যবহারোহি শাস্ত্রতোবলবানেষ্যতে। ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বচনাৎবলবতঃ পারম্পরীণ লোক-ব্যবহারস্য বিরোধাৎ তত্তন্ত্রোক্ত শ্রুতিস্মৃতি পুরাণোক্তং নকুর্য্যাৎ ভারতে কলাবিতি বচনস্যাপি বিরোধাচ্চ কলৌবর্ণ বিভাগ রহিত কালানন্তরং বেদ প্রবৃত্তি-রহিত কালে তামসিকানং তেষাং গ্রাহ্যমত্র প্রমাণং। যাবদ্বর্ণবিভাগোঽস্তি যাবদ্বেদঃ প্রবর্ত্ততে তাবদেবাগ্নিহোত্রঞ্চ সংন্যাসঞ্চ প্রবর্ত্তয়ে দিত্যাদি শতাবধান ভট্টাচার্য্য ধৃত রাম প্রকাশ গ্রন্থে কূর্ম্মপুরাণে স্মৃতি বচনং॥ দেবী বাক্যং। যানি শাস্ত্রানি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানিচ শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধানি নিষ্ঠাতেষাং হিমানীতি। অতএব দৈবজ্ঞস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াদের্নমস্য এবং শাস্ত্রার্থ ইতি বিজ্ঞানাং পরামর্শঃ॥

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মণাং
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীরাম নাথ শর্ম্মণাং
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীসূর্য্যকান্ত শর্ম্মণাং
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীহরিদাস শর্ম্মণাং
সাং নবদ্বীপ
রামভদ্রোজয়তি
শ্রীগোপীনাথ দেবশর্ম্মণাং
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দেবশর্ম্মণাং
সাং বহিরগাছী

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মণাং
শ্রীদুর্গা শরণং
শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাং
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীশ্রীকান্ত শর্ম্মণাং
রামভদ্রোজয়তি
শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণাং
শিবোজয়তি
শ্রীদেবীচরণশর্ম্মণাং
শ্রীরামচরণ শর্ম্মণাং
সাং নবদ্বীপ।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং

সালিসি রফানামা পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রী৺ গ্রহযজ্ঞ হইয়াছে, তাহাতে শ্রীযুক্ত কেবলরাম, ন্যায়বাগীশ প্রভৃতি চারিজন ব্রতী শ্রীযুক্ত জিতুরাম গ্রহবিপ্রকে গ্রহপূজাদির দক্ষিণাদি দিতে প্রতিবন্ধক হইয়াছেন, আর বলেন, গ্রহাচার্য্য যে দক্ষিণাযোগ্য ব্রাহ্মণ তাহার প্রমাণ কি? এবিষয় নিষ্পত্তি কারণ উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে আপনি আমাদিগকে মধ্যস্থ মানিয়াছেন, আমরা আপনার অনুমতি অঙ্গীকার করিয়া উভয়ের নিকট অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ শ্রুত হইলাম এবং আচার্য্য মজুওর চারিদফা ব্যবস্থা পত্র দিলেন; ঐ সকল ব্যবস্থা পত্রে নবদ্বীপের রাজা শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দেব ও ত্রিবেণী নিবাসী শ্রীযুক্ত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও পশপুরের শ্রীযুক্ত কৃপারাম তর্কবগীশ প্রভৃতির সম্মতি ও স্বাক্ষর আছে। ঐ সকল ব্যবস্থা পত্রের নকল নিম্নে লিখিত হইল।

(১) ওঁ তৎসৎ

দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণাএব ভবন্তি। রাজমার্ত্তণ্ড প্রভৃতিষু আদি গ্রন্থেষু দৃষ্টত্বাৎ পারম্পর্য্য ক্রমেণ গায়ত্র্যা উপাসকত্বাৎ এবঞ্চ শ্রীমন্মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণাবতারস্য

পিতু র্মুখপদ্মাৎ শ্রুতত্বাৎ জ্ঞাতমেব দৈবজ্ঞো ব্রাহ্মণ এবেতি। সর্ব্বদেশ প্রসিদ্ধত্বাচ্চ দেশাচারস্তাবদাদৌ নিযোজ্যা দেশে দেশে যা স্থিতিঃ সৈব কার্য্যা। লোকদ্বিষ্টং পণ্ডিতা নাচরন্তি শাস্ত্রজ্ঞোঽতো লোকমার্গেণ যায়াৎ। পরং বেদাঙ্গ-জ্যোতিঃ শাস্ত্রগণনাৎ গ্রহদেবদানগ্রহণাচ্চ প্রশস্ত ব্রাহ্মণ ইতি সতাং মতং।

রাজ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ
নবদ্বীপ নিবাসিনঃ।

(২) ওঁ তৎসৎ।

গ্রহযজ্ঞাদৌ অস্মিন্ দেশে তৎপূজাদি দ্রব্যেযু যৎ যৎ গ্রহচার্য্যাপর পর্য্যায়ৈ গ্রহবিপ্রৈর্লভ্যতে শাস্ত্রতো ব্যবহার বলাচ্চ তৈরেব তৎ তল্লভং নান্যৈরিতি বিদুষাং পরামর্শঃ॥

শ্রীজগন্নাথ শর্ম্মণাং	শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মণাং	শ্রীহরিনরায়ণ শর্ম্মণাং
সাং ত্রিবেণী	শ্রীশিবনাথ শর্ম্মণাং	শ্রীরামকানাই শর্ম্মণাং
শ্রীআত্মারাম শর্ম্মণাং	শ্রীঘনশ্যাম শর্ম্মণাং	শ্রীদেবনাথ শর্ম্মণাং
সাং বাঁসবেড়ে	সাং নবদ্বীপ	শ্রীরাজারাম শর্ম্মণাং

শ্রীরামনাথ শর্ম্মণাং সাং নবদ্বীপ

উল্লিখিত তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত ব্যবস্থা পত্রে দুই সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরই স্বাক্ষর আছে।

(৩) ওঁ তৎসৎ

গ্রহাণামর্চ্চনা দ্ধেতোস্তদ্দান গ্রহণায়চ।
ব্রহ্মণোবদনাৎ পূর্ব্বং দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণোঽভবৎ॥

পুরাণ তন্ত্রাদি নানাশাস্ত্র পর্য্যালোচনয়া ময়ায়ং শাস্ত্রার্থঃ পরিগৃহীত ইতি বিদুষাং মতং॥

শ্রীকৃপারাম শর্ম্মণাং
সাং পশপুর

ফরাসডাঙ্গার কৌন্সিলী ভট্টাচার্য্য ব্যবস্থা লিখিয়াছেন যথা

(৪) ওঁ তৎসৎ

বিপ্রশ্চ জ্যোতির্গণনাবেদনাচ্চ নিরন্তরং।
বেদাধ্যায়-পরিত্যাক্তোবভূব গণকোভুবি॥

ইতিব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দর্শনাৎ দৈবজ্ঞো ব্রাহ্মণোদানার্হশ্চ ইতি বিদুষাং মতং ॥

এই সকল ব্যবস্থা পত্র ও নানা পুরাণাদি শাস্ত্র দেখিয়া আমরা বিবেচনা করিলাম, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং গ্রহপূজা প্রভৃতি কার্য্যের দক্ষিণাদি পাইবার পাত্র। অতএব গ্রহপূজার দক্ষিণাদি গ্রহাচার্য্যকেই প্রদেয় অন্যকে নহে ; অন্য ব্রাহ্মণের গ্রহণে পাতক হইবে—ইতি সতাং সম্মতং ॥

শ্রীরামলোচন শর্ম্মণাং	শ্রীবলরাম ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীবিশ্বনাথ শর্ম্মণাং	শ্রীরামকান্ত ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মণাং	শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যস্য

এই সকল ব্যবস্থা পত্র ও শাস্ত্রীয় বচনাদি দ্বারা দৈবজ্ঞ বা গ্রহচার্য্যগণ যে ব্রাহ্মণ এবং দানাদির অধিকারী তাহা নির্ণীত হইয়াছে।

তবে ইঁহারা যে সকল প্রমাণানুসারে সূর্য্যার্ঘ্য দান গৌর্য্যাদি ষোড়শ-মাতৃকা এবং গণেশ ঘট ও কোন কোন স্থানে তৎপরিবর্ত্তে শান্তিকুম্ভ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বাহুল্য ভয়ে ঐ সকল প্রামাণিক গ্রন্থের বচন উল্লিখিত হইল না। আবশ্যক হইলে গ্রহ-যামল প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবেন ॥

গ্রহবিপ্রগণের মধ্যে অনেকগুলি গোত্র আছে ; তন্মধ্যে কাশ্যপ ভারদ্বাজ শাণ্ডিল্য মৌদ্‌গল্য গোতম গার্গ্য পরাশর অগ্নিবেশ্ম ঘৃত-কৌশিক প্রভৃতি কয়েকটী গোত্রই অধিক লক্ষিত হইয়া থাকে।

অনেকে প্রথমোক্ত তিনটি গোত্র ব্যতীত অন্য গোত্র গুলির কথা শুনিয়া বলেন যে এসকল গোত্র ব্রাহ্মণের কখনও হইতে পারে না। তাঁহাদের দৃষ্টির জন্য মনু হইতে গোত্রাখ্যায়ক বচনটি উদ্ধৃত হইল যথা।

শাণ্ডিল্য কাশ্যপ শ্চৈব বাৎসঃ সাবর্ণিক স্তথা। ভারদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালীন স্তথা পরঃ॥ কল্বিষশ্চাগ্নিবেশ্মশ্চ কৃষ্ণাত্রেয় বশিষ্ঠকৌ। বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ॥ ঘৃতকৌশিক মৌদ্গল্যৌ আলম্যানঃ পরাশরঃ। সৌপায়ণ স্তথা ত্রিশ্চ বাসুকি রোহিত স্তথা॥ বৈয়াগ্র পদ্যকশ্চৈব জামদগ্ন স্তথাপরঃ চতুর্ব্বিংশতি বৈগোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ॥ মনুঃ।

বচনান্তরে গার্গ্য গোত্রেরও উল্লেখ আছে।

বঙ্গীয় গ্রহবিপ্রগণের অধিকাংশই সামবেদী কচিৎ যর্ব্বেজুদীও লক্ষিত হইয়া থাকে। ভবদেব পদ্ধতিমতে ইঁহাদের বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর কলিকাতা বর্দ্ধমান মালদহ প্রভৃতি স্থানে রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের পৌরোহিত্য ব্যাপার সম্পাদন করেন; এতদ্ভিন্ন স্থানে ইঁহারা স্বসমাজস্থ বৈদিক ক্রিয়া নিপুণ ব্যক্তি দ্বারা উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

বঙ্গীয় গ্রহবিপ্রগণের কিয়দংশ বিষ্ণুর উপাসক, কতক অংশ শাক্ত, শৈবের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প॥ শৈব শাক্তেরা প্রায়ই ভট্টাচার্য্য বংশের শিষ্য; অপরাংশ গোস্বামীগণের নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকে॥

বঙ্গে গ্রহবিপ্রগণের মধ্যে তিনটী শ্রেণী লক্ষিত হয়; তন্মধ্যে অশ্বশ সমাজ নামক সম্প্রদায়ই পবিত্রতম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ তিনটি নিয়ম বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে।

যে গৃহে, বিধবার শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্যের স্বল্পমাত্রও শিথিল হয়, সেই গৃহস্বামী অথবা যে কেহ পণ গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা দান করেন কিংবা যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি সমাজ চ্যুত হইয়া থাকেন॥

এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গৃহেই ৺ শালগ্রামশিলা সম্পূজিত হইয়া থাকেন।

গ্রহাচার্যগণের জীবিকার মধ্যে ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর ভোগ ও ব্রাহ্মণোচিত দান গ্রহণ এবং জ্যোতিঃ শাস্ত্রের অনুশীলন প্রভৃতি কয়েকটিই প্রধান। ইদানীং যাঁহারা ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তাঁহারা বিচারক অধ্যাপক শাসন কর্ত্তা ব্যবহারাজীব প্রভৃতি হইয়া নানা বিধ কার্য্য করিতেছেন। পূর্ব্বে গ্রহাচার্য্য বংশসম্ভূত যেসকল গণিতবিৎ পঞ্জিকা গণনা করিয়া রাজধানী প্রভৃতিতে প্রদান করিয়া তাহার নিকর স্বরূপ যেসকল ব্রহ্মোত্তর ভূমি লাভ করিয়াছিলেন, অধুনা তত্বংশীয়েরা ইহা ভোগ করিয়া আসিতেছেন॥

অনেকে স্বগৃহ প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহের [illegible] প্রদত্ত দেবোত্তর ভোগীও আছেন।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা গ্রহাচার্য্যগণের শাস্ত্রোক্ত কার্য্যাবলীর ২। ১ টী বচন উদ্ধৃত করিতেছি।

যথা বরাহঃ। নাসম্বৎসরকে দেশে বস্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
চতুর্ভূতোহি যত্রৈব পাপং তত্র নবিদ্যতে॥ ১।
পুরোধা গণকো মন্ত্রী বৈদ্যশ্চাপি চতুর্থকঃ।
এতে রাজ্ঞা সদাপোষ্যা কৃচ্ছ্রেনাপি স্ত্রিয়ো যথা॥ ২।

শুক্লে দক্ষিণতো রাজ্ঞো বামতস্তদ্বিপর্য্যয়ে।
দিন পঞ্জী সদা পাঠ্যা দৈবজ্ঞান তু ধীমতা॥ ৩।

বিজয়াভিলাষী ব্যক্তি সাম্বৎসর অর্থাৎ দৈবজ্ঞহীন স্থানে বাস করিবেন না অর্থাৎবিজিগীষু নরপতি বাসভবনের সন্নিধানে দৈবজ্ঞের বাসস্থান নিরূপিত করিবেন। যেহেতু দৈবজ্ঞই চক্ষুঃস্বরূপ অর্থাৎ ভাবিফল ফলের বিজ্ঞাপয়িতা; এই দৈবজ্ঞ যেখানে বাস করেন সেখানে কোন পাপ থাকে না অর্থাৎ দুষ্কৃতির পরিণাম ফলরূপ পরাজয় বা হানি সংঘটিত হয় না॥

যেমন পরিবারবর্গ অবশ্য পোষণীয় তদ্রূপ রাজা পুরোহিত দৈবজ্ঞ মন্ত্রী এবং বৈদ্যকে কষ্টেও পালন করিবেন। [সূর্য্যবংশীয় উদয়পুরের রাণা মহারাজ প্রতাপসিংহ অরণ্যে বাসকালেও এই নিয়মের অধীন ছিলেন॥ ভট্টগ্রন্থ ও টড্ সাহেবের রাজস্থান দেখুন।]

বিচক্ষণ দৈবজ্ঞ শুক্লপক্ষে রাজার দক্ষিণদিকে বসিয়া এবং কৃষ্ণপক্ষে বামভাগে উপবেশন করিয়া প্রত্যহ রাজাকে দিন পঞ্জিকা শ্রবণ করাইবেন।

অদ্যাপি প্রাচীন বংশীয় রাজধানী সমূহে এই নিয়ম অক্ষত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাঁহাদের পুরোহিতের ন্যায় একজন তিথি পুরোহিতও থাকেন।

কালের কি বিচিত্রগতি! মহাভারতকার বলিয়াছেন।
গতশ্রীর্গণকান্ দ্বেষ্টি গতায়ুশ্চ চিকিৎসকান।
গতশ্রীশ্চ গতায়ুশ্চ ব্রাহ্মণান্ দ্বেষ্টি ভারত॥

(মহাভারত)

হে যুধিষ্ঠির যিনি দৈবজ্ঞকে দ্বেষ করিবেন তিনি শ্রীভ্রষ্ট হইবেন এবং চিকিৎসককে দ্বেষ করিলে আয়ুহীন হইবেন এবং যিনি ব্রাহ্মণকে দ্বেষ করিবেন তাঁহার উক্ত উভয়ই বিনষ্ট হইবে। কিন্তু আজ কাল অনেক মহাত্মা জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া দৈবজ্ঞেরা ইহার কোনরূপ উন্নতি করিতে পারিতেছেন না বলিয়া নানা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি বর্ত্তমান সময়ে কোন্ শাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতি আছে? তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে দুই চারিখানা কাব্য সাহিত্যের অনুশীলন পরিলক্ষিত হইতেছে বটে, কিন্তু উহাও অলঙ্কার বর্জ্জিত।

যখন এদেশে দর্শন স্মৃতি, পুরাণ, বৈদ্যক, তন্ত্র, প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রের উন্নতি ছিল, তখন দৈবজ্ঞেরাও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যদি থাকিতেন, তাহা হইলে মুনি প্রণীত দুই চারিটি বীজ হইতে এই শাস্ত্র শাখা প্রশাখা যুক্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষ রূপে পরিণত হইতে পারিত না। প্রবহমান কাল পর্য্যন্ত গ্রহাচার্য্যবংশে কত সময়ে কত মহাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্বকীয় ঐশী শক্তিদ্বারা জন সাধারণকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়া অনতিক্রম্য কাল শাসনের বশবর্ত্তী হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে!

যাঁহাদের বিরচিত কোন গ্রন্থ নাই সেই সকল অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের লোক পরম্পরাগত সুস্পষ্ট বিবরণ জানিলে ও লিখিলে হয়ত সাধারণ্যে বিশ্বাস যোগ্য নাও হইতে পারে।

তবে যাঁহাদের গ্রন্থ দ্বারা ভারতের এবং ভারতীয় জ্যোতিষের এত গৌরব, যাঁহাদের হৃদয় হইতে উদ্ভাবিত মত গুলি অদ্যাপি জলন্ত অক্ষরে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যাঁহারা ভারতমাতার সুযোগ্য সন্তান বলিয়া পরিচিত হইয়া গিয়াছেন, হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনাস্থা নিবন্ধন কোন ঐতিহাসিকই তাঁহাদের জীবনী লিখিতে প্রয়াস পান না।

উজ্জয়িনীর অধিপতি অসাধারণ গুণগ্রাহী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন বরাহাচার্য্য এবং লীলাবতী, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, সিদ্ধান্ত শিরোমণি প্রভৃতি পৃথিবী বিখ্যাত কতিপয় গ্রন্থের প্রণেতা বিজ্জলবীড় নিবাসী মহেশ্বর দৈবজ্ঞের বংশোজ্জলকারী তনয় ভাস্করাচার্য্য, দিল্লির সম্রাট জহংগীর সার্ব্বভৌমের সভাপণ্ডিত ও অন্যতম মন্ত্রী যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা নিবন্ধন জগদ্‌গুরু আখ্যা লাভ করেন, সেই কাশী নিবাসী কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ,—প্রসিদ্ধ তাজ গ্রন্থের প্রণেতা নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ—মুহূর্ত্তচিন্তামণির লেখক রাম দৈবজ্ঞ—গ্রহ-লাঘব-তিথি-চিন্তামণি প্রভৃতির রচয়িতা গণেশ দৈবজ্ঞ—সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার রঙ্গনাথ দৈবজ্ঞ—মল্লিনাথ ব্যতীত ইহাঁর ন্যায় টীকাকার অতি অল্পই দৃষ্ট হয়, ইহাঁর বহুদর্শিতা অসাধারণ ও বেদ দর্শন স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতিতে ইহাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। —কত নাম করিব! এইরূপ সহস্র সহস্র গ্রন্থকারের প্রযত্নে এই সমুন্নত জ্যোতিষ শাস্ত্রের পূর্ত্তি-সাধন হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের গ্রন্থের সমালোচনা ও জীবনী লিখিতে গেলে, এক এক খানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

এখন আমরা অন্য প্রদেশের গ্রন্থকারদের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া

বঙ্গীয় জ্যোতিষীগণের সম্বন্ধে ২।৪ টি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অনুমান অনধিক ৪৩০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের গার্গ্য গোত্র সম্ভূত গ্রহবিপ্র বংশে রাম দুলাল বিদ্যাসাগর নামে এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র রুদ্র বিদ্যানিধি। জ্যোতিষ-সার-সংগ্রহ ইহাঁরই বিরচিত। ইনি পঞ্চকোট রাজধানীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত সাঁওতাল যুদ্ধের সময় ইহাঁর বাণী দৈববাণীর ন্যায় হইয়া ছিল; ইনি শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজার অশেষ উপকার করিয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যানিধির পুত্র রামকৃষ্ণ বিদ্যামণি। ইনি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পঞ্চরত্নের সভায় অন্যতম সভ্য। তদানীন্তন বঙ্গদেশের রাজধানী মুরসিদাবাদের নবাবের সহিত উক্ত রাজার রাজস্ব গ্রহণ কার্য্য সংক্রান্ত ঘটনায় ইনি আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইয়া ছিলেন। হণ্টর কৃত ইতিহাসে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস লক্ষিত হয়।

উক্ত বিদ্যমণির পুত্র প্রাণ নাথ বিদ্যা-কঙ্কন। তাঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ রাম জয় শিরোমণি। ইনি রাজা ঈশ্বর চন্দ্র রায়ের সম-সাময়িক লোক। কোন একটী ঘটনায় বাঙ্গালার লেপ্‌টনাট গবর্ণর ইহাঁর গণনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পারিতোষিক দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইনি ম্লেচ্ছের দান বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই।

উক্ত শিরোমণির পুত্র ছিদাম বিদ্যাভূষণ। তৎপুত্র বর্ত্তমান তারিণী চরণ বিদ্যাবাগীশ। মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের সময় হইতে এপর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরের প্রত্যেক রাজার সময়ে এতদ্বংশীয় এক এক জন জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সভাপণ্ডিত হইয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমান ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকেও ইহাঁরাই এক এক খানি করিয়া পঞ্জিকা গণনা করিয়া প্রদান করিয়া থাকেন, তজ্জন্য গোয়াড়ি কলেক্টরি হইতে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

বর্দ্ধমানাধিপতির জ্যোতির্ব্বিদ্বংশও অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ; ইহাঁরা স্মরণাতীত কাল হইতে পণ্ডিত। বর্দ্ধমানাধিপতি ৺ মহাতাপ চন্দ্রের সময়ে ৺ যশোদানন্দন বিদ্যাসাগর এই রাজধানীর জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সভা পণ্ডিত ছিলেন। অধুনা গুপ্ত প্রেশ পঞ্জিকার গণক জীবানন্দ জ্যোতিঃ-শেখর এই রাজধানীর জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় দ্বারপণ্ডিত। ইহাঁরা কাশ্যপ গোত্র সম্ভূত গ্রহবিপ্র। গোবিন্দ পুর নিবাসী ইহাঁদের অন্যান্য জ্ঞাতিরাও

জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত। ফলিত জ্যোতিষের দুরূহ বিষয় গুলি ইহাঁদেরই সাহায্যে বিশদীকৃত হইয়াছে। মধ্যবঙ্গের গ্রহাচার্য্য-বংশীয় ৺ সত্য দেব সরস্বতী যশোহর রাজধানীর দৈবজ্ঞ ও সভা পণ্ডিত ছিলেন। ইনি উক্ত রাজবংশের প্রথম অভ্যুন্নতির সময়ের লোক; ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

লেখক শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন।
থালকুলা
পোঃ মাতলাথালী জেঃ ফরিদপুর।

মূর্খ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিশু বাবুর পিশির পুত্র কলেজে পড়েন। গ্রীষ্মাবকাশ কালে মামার বাড়ী আসেন। এবারও আসিয়াছেন; তাঁহার নাম কৈলাসচন্দ্র। কৈলাস দেখিতে সুন্দর, যুবক; এম এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। "তাঁহার বুদ্ধি স্থির, তিনি চলনে বচনে ধীর এবং নৈতিক আচরণে সাধু।" এইরূপ সকলেরই বিশ্বাস; স্কুলের উচ্চ শিক্ষা তাঁহাকে বাল্য বিবাহের বিরোধী করিয়াছে বলিয়া তিনি আজিও বিবাহ করেন নাই।

বংশীধর চক্রবর্ত্তীর সহিত কৈলাস বাবুর বড় প্রণয়। বংশীধর যদিও কোন ভাষা ও বিজ্ঞান ভালরূপ জানেন না, তথাপি তাঁহারই সঙ্গে তিনি নীতি, কর্ম্ম, প্রেম, রাজনীতি, সমাজ নীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের আলাপ করিয়া থাকেন। বংশী ধরের পসার নাই সুতরাং কৈলাস বাবু আসিলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকে না।

এবার বংশীধর একটা উপার্জ্জনের উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, কৈলাস বাবুর আগমনের দুই চারি দিন পরে, সুসময় বুঝিয়া এক দিন তাঁহাকে বলিলেন "বাবু, দুঃখ হয়! কি বলিব, রামা চাঁড়ালের মেয়েটি যেমন দেখিতে সুন্দরী, তেমনি লেখা পড়ায় ও শিল্প কার্য্যে পটু, কিন্তু পড়েছে চাসার হাতে।"

"তার নাম কি?"

"সখী"

"লেখা পড়া কি করে শিখলে?"

"অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষার প্রসাদে।"

"যারা নিজেরা চাসা, তাদের মেয়েদের পণ্ডিতা করা ভাল কি?"

"আমিও তাই বলিতে ছিলাম"।

"চক্রবর্ত্তী মহাশয় ফরাসিরা পৃথিবীর মধ্যে বেশী সভ্য ও পণ্ডিত জানত?"

"আজ্ঞা হা"।

কোড্ নেপলিয়নে কি লেখা আছে জান?"

"না।"

"লেখা আছে নারী কিঞ্চিৎ সাহিত্য ও অঙ্ক শিক্ষা করিবে। উচ্চ শিক্ষার আবশ্যক নাই। কেন না তারা পুরুষের ন্যায় চাকরি করিবে না।"

'ঠিক্ কথা মশাই। দেখুন না যে মেয়েটীর কথা বল্‌ছি, একটু লেখা পড়া শিখেই বিগ্‌ড়ে গিয়াছে। স্বামীকে ভাল বাসে না।"

"বটে?"

'যে পুরুষ সভ্য নয়, লেখা পড়া জানে না, তাকে ভাল বাসিবে কেন? এই দেখুন, কার কাছে শুনেছে আপনি এম এ দিবেন, তাই আপনাকে দেখ্‌বার জন্য সে পাগল।"

"আমায় কি দেখে নাই?"

'দেখেছে, তাইত মুস্কিল হয়েছে।"

"কি হয়েছে?"

"আর হবে কি, আপনাকে সে চায়।"

"সর্ব্বনাশ! বল কি?"

এই অবসরে বংশীধর পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া কৈলাস

বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন "এই নিন্, পুরস্কার দিন্, অশোক বন হতে জানকীর চিহ্ন এনেছি!"

কৈলাস বাবু হাসিয়া বলিলেন "পুরস্কার মুখ পোড়াইয়া দিব"। পরে ধীর গম্ভীর বদনে বলিলেন "অতি সুন্দর লেখা।"

বংশীধর বলিলেন "দেখিতে আরো সুন্দর; কিন্তু তার রূপ গুণ সবই ভস্ম হবে; যদি আপনি দয়া না করেন, সে আত্মহত্যা করিবে।

ভারতের সকল লোক দুর্ভিক্ষে মরিয়া গেলে ভারতের শাসনকর্ত্তা যত বিস্মিত, যত শোকসন্তপ্ত না হইতেন, কৈলাস বাবু তদপেক্ষা শতগুণ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন"কি আত্মহত্যা! আত্মহত্যা! আমারই জন্য আত্মহত্যা।"

"আপনার জন্য"

"তোমায় বলেছে?"

"বলেছে।"

"কবে?"

"এখনও বলে, রোজই বলে।"

"বলিবার সুবিধা কিরূপে হয়?"

"তার বেয়ামের চিকিৎসা করি।"

"কি ব্যারাম?"

"মাথার বেয়রাম, আপনারই জন্য।"

সংসার. জ্ঞানশূন্য সরল কৈলাসের উচ্চ শিক্ষা বংশীধরের কূটনীতির কাছে মস্তক অবনত করিল। কৈলাসের মনে আঘাত লাগিল ভাবিলেন যে আমার জন্য মরিতে চাহে, আমি যদি তাহাকে ঘৃণা করি, তবে আমি রাক্ষস।"

বংশীধর বলিলেন "ভাবনা কি?"

কৈলাস পুনরায় পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। এবারে বড় স্পষ্ট করিয়া পড়িলেন.—

"হে মহাদেব! কে আমায় কৈলাসে লইয়া যাইবে! আমার প্রাণ যায়, তবে হে ধরাধর হে কৈলাস তুমিই আসিয়া আমার হৃদয় শীতল কর। এখন সংসার বিবেকী হইয়া শিবারধনা করিব।"

বংশীধর বলিলেন "তবু কি ধরাধরের দয়া হইবে না?"

কৈলাস বাবু বংশীধরকে সঙ্গে করিয়া নীরবে গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া

একখানি পত্র লিখিয়া তাহার হাতে দিলেন এবং হাতের আংটী খুলিয়া দিয়া কহিলেন, "আমার চিহ্ন স্বরূপ এইটি তাহাকে দিবে।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পরদিন মধ্যাহ্নকালে বংশীধর কৈলাস বাবুর সহিত গোপনে অনেক কথা কহিলেন, তৎপর একখানি পত্র বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। কৈলাস চিঠি পড়িলেন;—

"দুঃখিনী চরিতার্থ হইল। ফুল বিল্বদলের আয়োজনত হইল, কবে আমার পূজার দিন আসিবে? কবে,—কবে শিবরাত্র হইবে, কবে বিল্বমূলে বসিব? কবে নন্দী আমার শিব আনিবে?"

বংশীধর বলিলেন "নন্দীটাকে বুঝেছেনত?"

"তুমি, আর কে?"

"চিঠির জবাব দিবেন কি?"

"দিব।"

"আর একটা কথা, তাদের বাড়ী দুখানি ঘর বই নাই। সবাই একঘরে থাকে, আর একঘরে গরু থাকে, তাই যদি পারেন কয়টি টাকা দিন,—একখানি ঘর না হলে কিছুই হচ্ছে না।"

কৈলাস বাবু ইতস্তত না করিয়া বাক্স খুলিয়া ত্রিশটি টাকা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—"চিঠি লিখিয়া দিই আরো কিছু টাকা কাল দিব।"

লেখা হইলে বংশী পত্র ও টাকা ট্যাঁকে গুজিয়া বাহির হইল, কৈলাস তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ঠিক্ এই সময়ে বিশু বাবুর স্ত্রী গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার হাতে উল্ ও লোহার কাঁটা। দেখিলেন গৃহে কৈলাস নাই,—অথচ তাহার বাক্স খোলা রহিয়াছে, কৌতূহল হইল—বাক্সে কি আছে, দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই ঐ চিঠি দুইখানি পাইলেন, পাঠ করিয়া তাঁহার বদন রঞ্জিত হইল; পরে ভ্রুকুটী করিয়া চিঠি দুই খানি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিছু কাল পরে কৈলাস গৃহে আসিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন

—পাশে সেলির কবিতা ছিল তুলিয়া লইলেন। বহি খুলিতেই "এমিলিয়া বিবিএনী" বাহির হইয়া পড়িল; ভাল লাগিল—অনেকবার পড়িলেন, প্রতিবারেই শেষে চরণটি একটু জোরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—

"The sighs I breathe, the tears I shed, for thee"

গ্রামের স্কুল মাষ্টার, আসিতেছিলেন, তিনি কৈলাস বাবুর মুখে "শ্বাস-ছাড়ি, অশ্রু ফেলি, তোমারই লাগিয়ে"—পুনঃ পুনঃ শুনিয়া একটু দাঁড়াই-লেন—কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়াইবেন, কৈলাস বাবুর মুখ বন্ধ হয় না সুতরাং প্রবেশ করিলেন। কৈলাস বাবু সম্ভ্রমে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "মহাশয়! সেলি বড় সুন্দর জিনিষ"।

মাষ্টার কিছু রসিক লোক; হাসিয়া বলিলেন—"সেলির প্যারাডাইস দেখেছেন কি?"

"সেকি মহাশয়?"

"কলিকাতায়, থাকেন, তা জানেন না?"

"না।"

"ঠাকুর বাড়ী যান্‌নি?"

"কেন মহাশয়?"

"বেশ্ সেলি পড়েন, ঠাকুর বাড়ী যান নাই? ঠাকুর মহাশয়রা চাঁদের আলোয় ভাত রেঁধে খান, চাঁদের ফুল মাথায় পরেন—চাঁদের পোলাও, চাঁদের কারি কোপ্তা খান—চাঁদের অণু পরমাণুতে বাড়ীঘর বানান।"

কৈলাস বাবু সরল হইলেও বুঝিলেন, একদল লোক আছেন, তাঁহারা হোমর বাল্মীকি, ও চষার, বিদ্যাপতি বই জগতের সকলই তুচ্ছ মনে করেন—ইনিও সেই দলের একজন হইবেন—সুতরাং একটু হাসিয়া বলিলেন—একটু ঘৃণার ভাবে—বলিলেন—"প্রাচীনেরা সেলির সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারেন না—এসৌন্দর্য্য অতি সূক্ষ্ম।"

মাষ্টার হাসিয়া বলিলেন—"ঠিক্ ইটালীর লোকেও আপনারই মত একটী কথা বলিয়া থাকেন"—"Tanto buon che val mente" অর্থাৎ "এত ভাল যে সকল কাজের অযোগ্য।"

কৈলাস বাবু উচ্চ শিক্ষার গৌরবে, উপাধির গৌরবে স্ফীত—সামান্য একটা গ্রাম্য স্কুল মাষ্টারের বেয়াদবীতে তিনি কিছু রাগিলেন—এবং সেই কোপন স্বরেই বলিলেন—মিলটন, বায়রণ যে পড়ে নাই, সেও তার প্রশংসা

করে—মিলটন বায়রণ না বলিয়া সেলির প্রশংসা করিয়াছি, তাই আপনি বুঝি দুঃখিত ?”

মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন “সেলি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সেলি নিজেও বুঝিতেন না। আর মিলটন—The structure of Milton's great poem is daring to the verge of blasphemy. আর আপনার বায়রণ a palpable poison.

কৈলাস বাবু আর তর্ক নাকরিয়া বলিলেন “আপনি কত বেতন পান ?”

“দশ টাকা”

“আপনি দশ টাকার মতই কথা কহিবেন।”

মাষ্টার হাসিলেন, বলিলেন—“আচ্ছা তবে দশ টাকার মতই বলি—শুনুন্”—এই বলিয়া কৈলাস বাবুর কানে কানে কি বলিলেন—কৈলাস বাবুর মুখে কালিমা পড়িয়া গেল ; শরীর অবশ ও দৃষ্টি স্থির হইল। এই অবসরে মাষ্টার ধীরে ধীরে উঠিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বিনোদ নীলার শোকে, বিশু বাবুর আরোপিত কলঙ্কে, আর লোকের কাছে মুখ দেখান না। গৃহেই পড়িয়া থাকেন। শীর্ণ দেহ আরো শীর্ণ হইয়াছে—রামার স্ত্রী কন্যা বিরক্ত করে বলিয়া তাহাদের খাতিরে দুটী অন্ন উদরে দেন। এই ভাবে ক্রমে বহু দিন গেল, কত দিন কত বৎসর গেল, বিনোদ জানে না। তিনি একবার, রাত একবার দিন—নয়নের নির্ঝর—এই দেখেন। আর হৃদয়ের আগুন, লজ্জার তুহিন—এই জানেন। হঠাৎ তাহার মনে হইল—সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! ভুতনাথ কোথায়, তাহার সংবাদ নাই চিঠি নাই, তবে তাহার কি হইল ?

সেই সময়ে রামার কন্যা তাঁহার নিকটে ছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—“সুখী—মা, আমার নীল কয় বৎসর নাই ?

সুখী বলিল “ছয় বৎসর।”

“এরই মধ্যে ছয় বছর গিয়াছে, হা বিধাত ! কেন আমায় ঘুমথেকে

জাগাইলে—আমার ভূতো কোথায়? ভূত নাথ, বাবা—তুমি মাত্র সম্বল—দুঃখিনীর ধন কোথা তুমি" এই বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে উন্মাদের ন্যায় বিনোদ যাইতে উদ্যত হইলেন।

সখী তাঁহাকে যাইতে দিয়া—বলিল "স্থির হন্—কোথা যাবেন।"

বিনোদ চুপে চুপে ভয়ে ভয়ে যেন বিস্মিতের মত বলিলেন—"জান না জান না—বিশ্বনাথ আমার ভূতোকে মেরে ফেলেছে—কোথায় মেরেছে, তাই দেখ্ব—যাব।"

সখী বলিল—"আপনি কি পাগল হ'লেন—অমন কথা কি মুখে আন্তে আছে—ভূত বাবু ভাল আছেন, প্রায়ই চিঠি দেখেন—আমি তার জবাব লিখে দিই—এই দুই মাস তাঁর চিঠি পাওয়া যায় নাই—তাই বাবা নিজে তাঁকে দেখ্তে গিয়াছেন। হয়ত সঙ্গে করে আন্তেও পারেন।"

বিনোদ এই কথা শুনিয়া কিছু কাল নীরবে থাকিয়া—একটু হাসিলেন। —ছয় বৎসর পরে হাসিলেন—হাসিলেন—চেতন হইলেন—তথাপি সম্পূর্ণ চেতন নহে। ঐ এক ভাব—জ্ঞানে—অজ্ঞানে—চৈতন্যে—অচৈতন্যে জড়িত। হাসিয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "সখি,—তবে আমার ভূতো আছে, মাথার দিব্বি, সত্য বলিস?"

সখী সরলা বালিকা—চণ্ডাল বালিকা—তথাপি বুঝিল—ঐ হাসি—শোক-কলঙ্ক-দগ্ধা উন্মাদিনীর ঐ হাসিটুকু—পৃথিবীর সকল শোক, সকল, বিষাদ—সকল জননীর স্নেহ সমষ্টি মাখা। সখীর চক্ষে জল আসিল সন্তান স্নেহ সখী জানে না; যেন জানিল—অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া মুখে হাসিয়া বলিল—"মা আমি দিব্বি করে বল্ছি—আপনার ছেলে ভাল আছেন—বাবা তাঁকে আন্তে গিয়াছে।

সখী যেন বিনোদের মাথায় বরফ ঢালিয়া দিল। আজ ছয় বৎসর পরে বিনোদের চক্ষু যথা স্থানে নামিল—তাঁহার উন্মাদের তুল্য কর্কশ বদন কোমল ও প্রশান্ত হইল—তিনি কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা—এই দেখ, আমার বুক পিট্ শুকিয়ে এক্ হয়েছে—দেখ, আমার হাতে শুধু হাড়—আমি কি ভুতো আসা পর্য্যন্ত বাঁচিব?—মা তোদের গরুর দুগ্ধ আমায় দুবেলা খাওয়াস্?—আমি আমার ভুতোকে দেখ্ব—আমি যেন মরি না, —আমি ভুতোকে দেখ্ব?"

* * * * * * *

এই ঘটনার পর হইতে বিনোদ স্বাভাবিক অবস্থা পাইলেন—এবং পুত্র দর্শন আশায় পুনরায় শরীরের প্রতি যত্ন করিতে লাগিলেন। সখী তাহাদের গরুর সকল দুগ্ধ আনিয়া বিনোদকে দেয়—বিনোদ এক এক সময় স্নেহ ভরে বালিকাকে বলেন—"আমি কি তোর দুধের মেয়ে—কত দুধ আমায় খাওয়াবি ?"

যদবধি রামা ভূত নাথের তত্ত্বানুসন্ধান গিয়াছে—রামার স্ত্রী কন্যা বিনোদের বাড়ী বিনোদের কাছে থাকিয়া তাহার সেবা সুশ্রূষা করে, কেবল রামার জামাই বাড়ী থাকে ; রামার কাজ কাম দেখে।

এক দিন সখী ও বিনোদ ঘাটে জল আনিতে গিয়াছেন—একটা কুকুর শৃগাল দেখিয়া পলাইতেছে, সখী তাহা দেখিয়া হাসিতেছে—তখন তাহার চক্ষু দুইজন লোকের উপর পড়িল—তাহারাও হাসিতে লাগিল। সখী মনে করিল, তাহারাও কুকুর শৃগালের কলহ দেখিয়া হাসিতেছে। ঐ দুই জন লোকের একজন বলিল "সুন্দর মুখের হাসিও সুন্দর।"

দ্বিতীয় উত্তর করিল " ও হাসিত আপনারই।"

"আমার "হলেই তোমার।"

"অন্তত পারিতোষিক ও মিষ্টান্নটাত বটে।"

এই সময়ে পশ্চাৎ দেশ হইতে কে দ্বিতীয় ব্যক্তির পৃষ্ঠে এক বিপুল লগুড়াঘাত করিল—তাহা দেখিয়া প্রথম ব্যক্তি ভয়ে পলায়ন করিল।

জল লইয়া যাইবার সময় সখী বলিল—"মা"—বিনোদকে সখী মা বলিয়া থাকে—"ঐ দেখুন বংশীকবিরাজ পড়ে—বুঝি শ্যালে কামড়াইয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন—"তাড়াতাড়ি চল ; যাইয়া তোমার স্বামীকে—পাঠাইয়া দি।"

সখীর স্বামী আসিয়া দেখিতে পাইল, বংশী কবিরাজ তথায় নাই, দুজন দারওয়ান লাঠি ঘাড়ে, কি খুঁজিতেছে ; তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, দ্বারওয়ান দ্বয় তাহাকে দেখিবা মাত্র বন্ধন করিয়া লইয়া চলিল।

ভূতের গল্প।

একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ বিস্তর চেষ্টা পাইল কিন্তু কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না। একদিন নবজীবনের লেখক শ্রেণীর ভিতর আমার নাম ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুমতেই (বৈয়াকরণ মাপ করিবেন) আজি পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই। হাড় বাহির করিতে পারি নাই।

* * * * *

কোন এক সহরে (নাম বলিব না, কেন না, সত্য ঘটনা—) একটি বাটী ছিল। ভূতের উপদ্রব আছে বলিয়া সে বাটীতে ভাড়াটিয়া জুটিত না। দৈব যোগে একদিন এক সাহেব সে সহরে আসিয়া উপস্থিত। সাহেব বড় Economical, হিসাবী, সুতরাং কম ভাড়ায় বাটী খুঁজিতে লাগিলেন। সংবাদ শুনিয়া, কথিত ভূতের বাটীই তাঁহার পছন্দ হইল। সাহেব সস্ত্রীক ছিলেন। আপনার ডেরা ডাণ্ডা আনিয়া বাটীর ভাড়া লইলেন। সঙ্গে মেম সাহেব ও একটী ছয় মাসের বাবা।

বৈকালে বেড়াইতে যাইবার সময় সাহেবের নাসা রন্ধ্রে, কি এক প্রকার গন্ধ বাবুর্চি খানা হইতে প্রবেশ করিল। ঢুকিয়া, দেখিয়া, শুনিয়া, জানিলেন, যে বাবুর্চি সুখাদ্য খিচুড়ি রাঁধিতেছে ও ইলিস মাছ ভাজিতেছে। সাহেব হুকুম দিলেন, "এই খাদ্য আমি ও মেম সাহেব খাইব ও খাইবেন।" বাবুর্চি তটস্থ। সাহেব বেড়াইতে গেলেন। সেই খাদ্য প্রস্তুত ও প্রচুর। ঠাঁই করিতে বলিলেন। বাড়া হইয়াছে, এমন সময় খড়ম পায়ে, বৃহদাকার এক পুরুষ, নিশ্চিন্ত ভাবে চলিয়া আসিয়া সেই খাদ্য ভোজন করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য বাবুর্চির নিবারণ শুনিল না। তখন বাবুর্চি নিরুপায় হইয়া ও আগন্তুকের বৃহদাকার দেখিয়া, সাহেবের কাছে আসিয়া নালিস রুজু হইল। সাহেব কথা অবিশ্বাস করিয়া প্রথমত তাহাকে প্রহার করিলেন। তাহাতে তাহার প্লীহা ফাটিল না দেখিয়া স্বয়ং যাইয়া ব্যাওরা দেখিলেন। ঘর হইতে রিবলবার আনিয়া পাঁচবার আগন্তুকের প্রতি গুলি করিলেন। গুলি লাগিল না। আগন্তুক এই খিচুড়ী খাইতেছে, এই ইলিষ মাছ ভাজা খাইতেছে, আবার খিচুড়ী খাইতেছে, আবার ইলিষ মাছ ভাজা খাইতেছে—আবার দুই খাইতেছে—নিশ্চিন্ত ভাবে খাইতেছে—কোন বাধা কেহ দিল না

এই ভাবে খাইতেছে—আবার খাইতেছে—চিবাইয়া চিবাইয়া খাইতেছে—যেন অনন্ত ভাবে, অনন্ত খিচুড়ী ও অনন্ত ইলিষ মাছ ভাজা অনন্ত ভাবে চিবাইয়া চিবাইয়া গিলিতেছে। তখন সাহেবের প্রাণে একটু আতঙ্ক হইল। আহার অবসানে আগন্তুক উঠিয়া 'দিন দুনিয়া সব্ আমারই'—এই ভাবে পা ফেলিয়া মেম সাহেবের কামরার দিকে শনৈ শনৈ গমন করিতে লাগিলেন। মেম সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিয়া সমস্ত আলো একবারে নিভাইয়া দিলেন। সাহেব এবারে নিতান্ত অস্থির।

বাবুর্চি খানা হইতে আলো আনিয়া দেখিলেন, যে মেম সাহেবের খাটিয়া কড়ি সংলগ্ন। তখন সাহেব একেবারে 'উন্মাদ'। মাধ্যাকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া মেম সাহেবের খাটিয়া কড়ি সংলগ্ন। এমন সময় বাবুর্চী আসিয়া বলিল 'সাহেব আমি কোরাণ পড়িতে জানি—পড়িব কি?' সাহেব সম্মত হইলে পর বাবুর্চী সেই ঘরে জলদ গম্ভীর স্বরে কোরাণ পাঠ আরম্ভ করিল। সাহেবও বাইবেল পড়িতে লাগিলেন। তিন ঘণ্টার পর ঘড়ীর ছোট কাঁটার চালে সেই খাটিয়া নামিতে আরম্ভ হইল এবং শেষে মেজেতে—নামিল। পর দিন প্রাতঃকালে সাহেব সেই বাটী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

* * * * *

দিন যায়, রাত যায়, মাস যায়, বছর যায়—ভাড়াটিয়া জুটে না। কত দিন পরে এক সাহেব সেই বাটীতে আবার ভাড়াটীয়া হইল। জমিদার বলিলেন কিছু দিন আগে বাটীতে বাস কর, পরে এগ্রীমেণ্ট হইবে। তাই মঞ্জুর। রাত্রি আটটা—সাহেব ব্যাচিলার অর্থাৎ অস্ত্রীক—বসিয়া আছেন। অদূরে খট্ খট্ করিয়া খড়ম পায়ে কে আসিতেছে। দেখিলেন—বৃহদাকার এক পুরুষ! দেখিয়া কেদারা ছাড়িয়া আপন খাটিয়ায় চীৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন। আগন্তুক আসিল এবং কেদারায় বসিল। আগন্তুকের চক্ষু সাহেবের উপর—সাহেবের চক্ষু আগন্তুকের উপর। এই ভাবে ১৫ মিনিট গেল। তখন আগন্তুক টেবিলের জিনিষ আদি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন টেবিলে এক খানা ক্ষুর আছে। খশ্ করিয়া ক্ষুর ধরিয়া—গেলাস হইতে জল লইয়া ভাড়াটিয়া সাহেবের দাড়িতে মাখাইতে লাগিল। সাহেব—নিশ্চেষ্ট নিস্তব্ধ ভাবে চিন্তায় আকুল—কিন্তু নড়িলেনও না, চড়িলেনও না। এ গাল, ও গাল, গোঁফ, দাড়ি, ঘাড়, শেষে বগল,—সব কামান হইল—কিন্তু নখ কাটা হইল না।

* * * * *

সাহেব খাটিয়ায় শুইয়া—আর আগন্তুক চেয়ারে বসিয়া। কিছু ক্ষণ পরে খপ্ করিয়া উঠিয়া সাহেব আগন্তুকের গালে জল মাখাইতে আরম্ভ করিলেন। আগন্তুক নিশ্চেষ্ট—নিস্পন্দ। কামান শেষ হইল। সাহেব আবার খাটিয়ায় শুইলেন, আগন্তুক আবার চেয়ারে বসিলেন, অনেক ক্ষণ বাদে—

আগন্তুক বলিল "বাঁচিলাম! কি আরাম। ভূত হইয়া পর্য্যন্ত কামাইনি। আজ তোমার হাতে কামাইয়া বড় আরাম হইল।

দেখ, এই বাড়ী আমার ছিল। আমাকে খুন করিয়া বর্ত্তমান জমিদার এই বাড়ী লইয়াছে। সেই জন্য আমি ভূত হইয়া উপদ্রব করি এবং কাহাকেও এই বাটীতে থাকিতে দিই না। কিন্তু আজ তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি—তুমি সমস্ত ভূতের চুল কামাইয়া দিয়াছ। বাটী তোমায় দিলাম। কাঁটাল তলায় যে টাকা পোঁতা আছে—তাহাও তোমার হইল, তুলিয়া লইও।"

সা। কোন দোষ ত হবে না। জমিদার কি বলিবে?

ভূত। বিপদে পড়িলে, আমাকে স্মরণ করিও।

একদিন প্রাতঃকালে জমীদারের লোক ছয় মাস পরে ভাড়ার তাগাদা করিতে আসিল। সাহেব হুকুম দিলেন যে মারিয়া ভাগাইয়া দেও। তাই হইল। পরে, জমীদার স্বয়ং আসিলেও তাই হইল। তখন ফৌজদারী কার্য্যবিধির ধারানুসারে জমীদার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বাটী দখলের জন্য নালিস-বন্দ হইলেন। নালিষ—এজেহার—শমন—আসামী হাজির—মোকদ্দমা। ফরিয়াদীর এজেহার অন্তে হাকিম আসামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, জানিলেন যে ভূতে আসামীকে বাড়ীটি দান করিয়াছে। হাকিম প্রমাণ আছে কি না আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আসামী বলিল "হাঁ আছে।" তখন হাকিম প্রমাণ তলব করিলেন। আসামী ক্ষণ কাল চক্ষু মুদিয়া কি ভাবিল। তখন মট্ মট্ করিয়া শব্দ হইল। হাকিমজী চাহিয়া দেখিলেন, যে তাঁহার টানা পাখার উপর দারুণ পা ঝুলাইয়া কে এক জন বসিয়াছে। আসামী কহিল "ঐ আমার সাক্ষী।" হাকিমের সওয়ালে টানা পাখা আসীন আগন্তুক কহিল যে, "হাঁ সে আসামীর পক্ষে সাক্ষী বটে।" আরও কহিল যে সে একজন ভূত। জোবানবন্দী লইবার উদ্যোগ হইল। ভূত সাক্ষী কহিল "আমি হলফ পড়িতে পারিব না।" তখন হাকিম মহা

বিপদে পড়িলেন। শেষে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে ব্রাডলার মত ভূত সাক্ষীকে সলেম্ আফরমেশন দেওয়া হইবে। ভূতের জোবান বন্দীতে প্রকাশ পাইল যে, সে বাটী আসামীকে দান করিয়াছে। সে তাহার বাটীতে ছিল এবং জমীদার তাহাকে হত্যা করিয়া বাটী অধিকার করিয়াছে। হাকিম তখন রুমাল সাহায্যে তিন বার ঘর্ম্ম মুছিলেন। পরে ফরিয়াদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ভূত-সাক্ষীকে জেরা করিবে কি না। ফরিয়াদীর উকীল জেরা করিতে অস্বীকার হইল। তখন হাকিম মহোদয় উভয় পক্ষের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া (তিনি ইষ্ট-তুচ্ছ-চুরি) আসামীর দখল বাসের আজ্ঞা দিলেন। ফরিয়াদী খরচা দিতে বাধ্য হইল।

শুনা যায় সে সহর কলিকাতা হইতে ৬৬ মাইল দূরে অবস্থিত, কিন্তু কোন দিকে তাহার কিছু নির্ণয় নাই।

হাড় বাহির হইল। [খানিকটা বটে। নবজীবন সম্পাদক।]

শ্রীগুরুগোপেশ্বর।

শান্তিপুর গ্রাম-ধাম, শ্রীগুরু তাহার নাম,
কোন এক, ব্রাহ্মণ-কুমার।
জুয়া চুরি করি দ্বিজ, সংসার পালিত নিজ,
বিপ্রবংশে, বড় কুলাঙ্গার॥
ভাগিনেয় গোপেশ্বর, ছিল তার সহচর,
উভয়েতে, এক অন্নে থাকে।
শ্রীগুরু যেখানে রয়, গেপেশ্বর ছাড়া নয়,
ফাঁকি দেয়, যাকে পায় তাকে॥
একদিন গোপেশ্বরে, শ্রীগুরু মধুর স্বরে,
বলে, "চল, বিদেশেতে যাই।
চিরকাল একদেশে, রহিয়াছি কায়-ক্লেশে,
উন্নতির, উপায় ত নাই॥
অদৃষ্টে যা থাকে মাপা, অন্য দেশে চল বাপা,
একবার গিয়া, দেখে আসি।"
গোপেশ্বর শুনি কয়, "সেত মামা মন্দ নয়,
বিদেশ গমন, ভাল বাসি॥"
যুক্তি করি দুইজনে, শুভ দিনে শুভ ক্ষণে,
দেশ থেকে, প্রস্থান করিল।
বহুপথ পর্য্যটনে, ক্লান্ত হয়ে দুইজনে,
কোন দেশে, আসিয়া পৌঁছিল॥

মুদীর দোকান দেখে, গোপেশ্বরে দূরে রেখে,
শ্রীগুরু যাইল, যুক্তি দিয়ে।
আমার আহার হ'লে, মোরে শীঘ্র দাও ব'লে,
মুদীরে কহিবে, সম্ভাষিয়ে॥
শ্রীগুরু এতেক বলি, দোকানেতে গেল চলি,
বলে, "খাদ্য আছে কি প্রস্তুত?
লুচি মণ্ডা ভাল চাই, ভাল দধি দিবে ভাই!
দাম নাহি দিব, পেলে খুঁত!॥"
সম্ভাষিয়া মুদী কয়, "এস দ্বিজ মহাশয়,
ইচ্ছামত, খাদ্য হেথা পাবে।
তুল্য চীজ অল্প দামে, পাইবে না এই গ্রামে,
খেলে, দশ মুখে, গুণ গাবে!॥"
এত বলি মুদীজন, খাদ্য আনি ততক্ষণ
ভাল স্থানে দিল, পাত করে।
মনোমত খাদ্য পেয়ে, বার বার চেয়ে চেয়ে,
খায় দ্বিজ, আহ্লাদ অন্তরে॥
উঠিবার দেরি নাই, গোপেশ্বর বুঝি তাই,
আসিয়া দিলেক দরশন।
ময়রাকে ডাকিয়া কয়, "মোর না বিলম্ব সয়,
শীঘ্র কর, খাদ্য আয়োজন॥
ব্রাহ্মণের ইচ্ছামত, মুদী খাদ্য দিল যত,
গোপেশ্বর খাইতে বসিল।
এদিকে শ্রীগুরু খেয়ে, তোফা ছাঁচি খিলি পেয়ে,
ধীরে ধীরে, চিবাতে লাগিল॥
ধূমপান আয়োজন, করে মুদী ততক্ষণ,
হুঁকা রাখে, জল ফিরাইয়া।
বেশী করে টিকা দিয়ে, ভাল করে ধরাইয়ে,
দেয় হুঁকা, কোল্কে চড়াইয়া॥
খেতে খেতে দ্বিজ কয়, "কি তোমার প্রাপ্য হয়,
হিসাব করহ ভাই দেখে॥"
মুদী বলে মহাশয়, "বার আনা প্রাপ্য হয়,"
শুনি দ্বিজ যায়, হুঁকা রেখে॥
মুদী বলে, "কোথা যাও, খেলে তার দাম দাও,"
শুনিয়া শ্রীগুরু, তারে কয়।
"ওরে বেটা বেইমান, নাহি তোর কাণ্ডজ্ঞান,
কতবার দাম দিতে হয়!॥"

দুই জনে চলে বোল, বেধে গেল গণ্ডগোল,
লোক আসি, রাস্তায় জমিল।
গোপেশ্বর তাই দেখে, আহার স্থগিত রেখে,
ডাক ছেড়ে কাঁন্দিতে লাগিল॥
এদিকে ব্রাহ্মণে ধরে, মুদী টানা টানি করে,
ভয়ানক, বাধিল রগড়।
সম্বরিতে নারি রাগ, হাত নিয়ে পেয়ে বাগ,
গালে দ্বিজ মারিল চাপড়॥
রাগেতে উঠিয়া ফুলে, মুদীর ধরিয়া চুলে,
শ্রীগুরু ভূমেতে পাড়ে তারে।
সমাগত লোকগণে, ছাড়াইয়া দুই জনে,
আদ্যোপান্ত চাহে জানিবারে।
গোপেশ্বর উচ্চৈঃস্বরে, তখনে রোদন করে,
যত লোক, তার দিকে চায়।
বলে, "তুমি কি কারণে, কাঁন্দিছ আপন মনে?"
গোপেশ্বর, কহিল সবায়॥
"ওগো মহাশয়গণ, ভদ্রলোক ঐ জন,
স্বচক্ষে দেখিনু, দিল দাম।
মুদী ভয়ানক লোক, বাহিরে দেখায়ে রোক
মিছামিছি, করিছে হাঙ্গাম॥
আমি দেখিয়াছি যবে, ওঁহার মোচন হবে,
আমার ত, সাক্ষী কেহ নাই!
মোর কাছে পাবে যাহা, আমিও দিয়াছি তাহা,
রক্ষা পাব কিসে, কাঁদি তাই!!"
শুনি কয় মুদী জন, "ওগো মহাশয়গণ,
উনি দাম, দিলেন কখন?
গোপেশ্বর বলে তবে, স্বকর্ণে শুনুন সবে,
সত্য মিথ্যা, আমার বচন।"
দেখে শুনে লোকগণ, বুঝিলেক ততক্ষণ,
মুদী দোষে ঘটেছে সকলি।
মুদীরে প্রহার দিয়া, দ্বিজদ্বয় ছাড়াইয়া,
স্বকার্য্যে যাইল, সবে চলি॥

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। } মাঘ ১২৯৪। { ৭ম সংখ্যা।

ভালবাসাবাসি।

(বাসন্তী গীতি)

প্রকৃতি গো—প্রকৃতি গো একি রীতি তোর !
যথা যাই এক ছাঁদ,
এক ঢালা, এক বাঁধ,
একই বাসন্তি তানে, বিশ্ব খানি ভোর ;
অণু হ'তে হিমাচল,
শিশির, সাগর জল,
একই নিয়মে সব করিছে প্রয়াণ,
একটু ফুলের কোলে
"ব্রজ-রাজ" হেলে,দোলে !
কে বুঝে এ লীলা খেলা—নিগূঢ় সন্ধান।
কা'র কাছে বল্‌, বল্‌,
শিখিলি এ প্রেম-ছল,
কা'র গুণে, নভে ভবে, করে দিলি মিল্‌ !
কেন বা তপন করে,
কমলের হাসি ঝরে,
কোমলে কঠিনে কেন লেগে গেল খিল্‌ !

চকোর চাঁদের লাগি
সারা নিশি থাকে জাগি !
কে দিল প্রেমের রাগ পাখীর পরাণে !
ক্ষুদ্রপ্রাণে রবি কর
ধরিয়ে, শিশির থর
হরষে মরিয়া যায় প্রেম-আলাপনে !
বুঝি না এ কোন খেলা ?
কেমন প্রেমের মেলা,
ছোট বড় এক ছাঁদে বুক বেঁধে যায়,
চাতক "দে জল" যাচে,
মেঘেতে বিজলি নাচে,
বসন্ত আসিবে বলি, পিক্ অই গায় !
মাধবী সোহাগে হায় ?
সহকারে মিশে যায়
পতঙ্গ আপনা ভুলি, অনলেতে ধায়,—
প্রেমের এ লীলা খেলা, বুঝা বড় দায় !
নির্ঝর ঝরিয়ে শেষে,
তটিনীর কোলে মেশে,
আবার তটিনী ধায় সাগরের পানে,
সকলি আপনা ভুলি,
প্রাণে প্রাণে কোলাকুলি,
বেহুস—বিভোর সবে, পরস্পর টানে !
ফুল তোর একি ছাঁদ,
নভে ভবে দিলি বাঁধ,
কঠিন গাছেরে তুই, দিস্ চারু আলা,
হেরে তোর কম কায়
পাষাণ (ও) গলিয়া যায়,
ভাবে শেষে—"মানে মানে কেন হনু কালা ?"
পরিতাপ হৃদে উঠে,
অমনি সলিল ছুটে,

অভিমানী পাষাণের বুক্‌খানি চিরি;
ওরে ফুল কিবা তোর
প্রেমের কোমল ডোর!
বাঁধিয়াছ এ সংসার, সেই ডোরে ঘিরি।
যেখানে ফুটিস্ তুই
কিবা মরু—কিবা ভুঁই,
স্বরগের শশী তারা, দেয় সেথা চুম্,
মানুষ, আকুল প্রাণে,
তোরে রে হৃদয় টানে,
বুকে করি, দুখ ভুলি সুখে যায় ঘুম্।
প্রকৃতি গো, জননী গো,
জগতের জুড়নী গো—
এই ভরা ভোরে, লইনু তুহাঁরি কোল্,
ফেলো না শিশুরে ভুমে,
তুলে লও চুমে চুমে,
দাও দাসে, জননী গো, মৃদু মৃদু দোল!
প্রকৃতি গো তোর ধারা,
দেখে শুনে দিশে হারা!
আদি নাই—অন্ত নাই,—ধীরা স্রোতস্বতী,
মহান্ তুহাঁর তান্,
মহান্ তুহাঁর গান,
প্রেমের পাথার লীলা সুন্দরে মহতী।
সাধে কি "বিবর্ত্ত-বাদ"!—
বিজ্ঞানের অবসাদ!
অবাক্ জ্ঞানের কণা, প্রকৃতি ছটায়!
ধন্য ধন্য জননী গো,
কৈলাশের কামিনী গো!
প্রেম প্রবাহিণী তোর চরণে লুটায়!
স্বর্গ মন্দাকিনী-ধার
মন্দার-কুসুম হার,

রজত চন্দ্রমা রশ্মি, পূত পরিমল,
প্রেম বিনে সকলিত গরল—গরল।
প্রেমের কুসুম তুলে,
যেই জন সেই ফুলে,
পুজে নাই একদিন সোনার পুতুল,
ভালবাসা—ভালবাসা,
ভবের ভরসা, আশা—
বুঝে নাই যেই জন, সেই রে বাতুল;
শরীর মাটির দেহ,
মিছার অসার গেহ,
রেখে দাও ছুটাছুটি পোড়া অভিমান,
প্রকৃতির দেখ খেলা,
মানুষে মানুষে মেলা,
একের লাগিয়ে কাঁদে, অপর পরাণ।
দুটী প্রাণ একাকার,
নদ নদী একধার,
দুটী ফুল এক বোঁটে, দুলিবে দুদুল.
একই দোঁহার তান্,
একই দোঁহার গান
একই বাতাসভরে দুজনা আকুল;
এক ভালবাসা বাসি,
এক কান্না, এক হাসি,
একই দোলার দোল্ একই ঝঙ্কার,
মিশে যায় লতা গাছ,
পাতায় পাতায় নাচ,
মূলে জড়া জড়ি—নাহি ছাড়া ছাড়ি. আর;
স্বরগের সুধা রাশি,
মরতে পড়েছে আসি,
তাই সে কুসুম হাসে, মাতায়ে কানন;—
যাব না উহার কাছে,

শ্বাস লাগি গলে পাছে!
স্বরগের বালা ওটি, নিখুঁত্ আনন;
না— উহারে হৃদয়ে ধরে,
শিখে নিব ভাল করে,
কেন নিতি ফুটে বনে, ছড়াইয়া হাসি,
শিখাবে ও ভালবাসা,
প্রাণে দিবে প্রেম আশা,
গাইব বাসন্তীগীতি, ভাল বাসা বাসি॥

পাতঞ্জল যোগসূত্রম্।

৫।

তৎপরং পুরুষখ্যাতে গুণ-বৈতৃষ্ণ্যম্॥ ১৬।

পদচ্ছেদঃ।—তৎ-পরং, পুরুষখ্যাতেঃ, গুণ-বৈতৃষ্ণ্যম্।

পদার্থঃ।—তৎপরং তস্মাৎ (পূর্ব্বোক্তাৎ বৈরাগ্যাৎ) পরং উৎকৃষ্টং অথবা তৎ বৈরাগ্যং, পরং উৎকৃষ্টং, পুরুষখ্যাতেঃ পুরুষঃ, আত্মা, তস্য খ্যাতিঃ জ্ঞানং তস্মাৎ আত্মসাক্ষাৎকারাদ্ধেতোঃ, গুণ বৈতৃষ্ণ্যম্ গুণেভ্যঃ, গুণেষু গুণানাং বা বৈতৃষ্ণ্যম্ তৃষ্ণাবিরহঃ। গুণাঃ সত্বাদয়ঃ।

অন্বয়ঃ।—পুরুষখ্যাতে গুণ বৈতৃষ্ণ্যম্ তৎ-পরম্, তৎ, পরমিতি বা।

ভাবার্থঃ।—বৈরাগ্যং দ্বিবিধং, একং বিষয়-বৈরাগ্যম্। অন্যচ্চ গুণ বৈরাগ্যম্। তত্র প্রথমং তাবৎ পূর্ব্বস্মিন্ সূত্রে নিরূপিতং অত্রান্ত্যং গুণ বৈরাগ্যং নিরূপ্যতে। পুরুষখ্যাতেঃ আত্মসাক্ষাৎকারাৎ, বিষয় দোষদর্শিনঃ জনস্য পুরুষদর্শনাভ্যাসাদিত্যর্থঃ গুণেভ্যঃ কার্য্য-সহিতেভ্যঃ সত্বাদিগুণেভ্যঃ যৎ বৈতৃষ্ণ্যং নিস্পৃহত্বং, বিরক্ততেতি যাবৎ তদপি বৈরাগ্যম্, তচ্চ তৎপরম্

পূর্ব্বস্মাদুৎকৃষ্টম্, অন্যে তু তদিতি বৈরাগ্যম্ পরামৃশ্যতে তেষাং মতে পুরুষখ্যাতে-গুর্ণ বৈতৃষ্ণ্যং তৎ (বৈরাগ্যম্) তচ্চ পরমিত্যন্বয়ঃ। পুরুষপদমত্র-বুদ্ধের-প্যুপলক্ষকমিতি বিজ্ঞান-ভিক্ষুস্তথা হি তন্মতে পুরুষখ্যাতে-রিত্যস্য আত্মদ্বয়াঽন্যতর-সাক্ষাৎকারাভ্যাসাদিত্যর্থঃ আত্মদ্বয়ং বুদ্ধি পুরুষদ্বয়ং। শুদ্ধং চিত্তং বৃত্তি-রহিতং যদাত্মনি লীয়তে তদ্গুণ বৈতৃষ্ণ্যমুৎকৃষ্টং বৈরাগ্য-মিত্যর্থঃ।

অনুবাদঃ।—আত্মসাক্ষাৎকার-নিবন্ধন সত্বাদি গুণ ও তাহাদের কার্য্য হইতে চিত্তের যে বিরক্তি,—তাহাও বৈরাগ্য, উহা পূর্ব্ববৈরাগ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সমালোচন। এই সূত্রে পর শব্দের ব্যবহার হওয়ায় আমরা এক প্রকার জানিতে পারিতেছি যে, বৈরাগ্য দুই প্রকার (১) পর, (২) দ্বিতীয় অপর। প্রধান এবং অপ্রধান। যদি বল লোকে প্রধানের বিষয় অগ্রে বলিয়া তাহার পর অপ্রধানের কথা বলিয়া থাকে, এ স্থলে সেই লৌকিক রীতির পরিহার করিয়া অগ্রে অপ্রধান এবং পরে প্রধানের কথা বলিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, দুই প্রকার বৈরাগ্যের মধ্যে আবার পূর্ব্বাপরীভাব আছে। একটি অগ্রে না হইলে আর একটি উৎপন্ন হয় না। প্রথমে অপর বৈরাগ্যের উৎপত্তি হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে পর বৈরাগ্যের অধিকারই হয় না। মণিপ্রভা নামক বৃত্তিকার স্পষ্টই বলিয়াছেন " পূর্ব্ব-বৈরাগ্যং পর বৈরাগ্য-হেতুঃ।" পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্য পর বৈরাগ্যের প্রতি কারণ। এই নিমিত্তই প্রথমে অপর বৈরাগ্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলেন, পরে হয় বলিয়া উহার নাম পর বৈরাগ্য।

পুরুষখ্যাতি নিবন্ধন (গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্র প্রমাণে আত্মার স্বরূপ বিজ্ঞানের পর) যে 'গুণ-বৈতৃষ্ণ্য' ইহার অক্ষরানুবাদ, গুণে নিস্পৃহা বা গুণের উপর বীতরাগ হওয়া, গুণ এবং বৈতৃষ্ণ্য এই দুইটি কথায় ৭মী তৎপুরুষ বা ৫মী তৎপুরুষ সমাস করিয়া ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। গুণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রধানত তিনটি, সত্ব, রজঃ এবং তমঃ। এই প্রধান গুণ-ত্রয়ের পরস্পর ব্যামিশ্রণে আবার নানাবিধ জ্ঞানাদি পৌরুষ গুণ উৎপন্ন হয়। যখন চিত্ত সেই সকল গুণ হইতে বিরক্ত হয়, তাহাদিগের উপর আর স্পৃহা থাকে না, অথবা তাহাদের অধীন ভাব পরিত্যাগ করিয়া অবিকৃত ভাবে অবস্থান করে, চিত্তের সেই অবস্থার নাম 'গুণ বৈতৃষ্ণ্য'। আত্মার স্বরূপ ঠিক্ ঠিক্ জানিতে পারিলে চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনের মধ্যে কোন গুণের দ্বারাই পরিচালিত হয় না, তখন উহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এবং

নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাব ধারণ করে। এই সূত্রের ভাষ্যকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয় দোষদর্শী বিরক্তঃ পুরুষ দর্শনাভ্যাসা ত্তচ্ছুদ্ধি-প্রবিবেকাপ্যায়িত বুদ্ধি গুণেভ্যাব্যক্তাব্যক্ত ধর্ম্মকেভ্যোবিরক্ত ইতি তৎদ্বয়ং বৈরাগ্যম্। তত্র যহুত্তরং জ্ঞান প্রসাদ-মাত্রং যস্যোদয়ে প্রত্যুদিতখ্যাতিরেবং মন্যতে প্রাপ্তং প্রাপণীয়ং, ক্ষীণাঃ ক্ষেত্তব্যাঃ ক্লেশাঃ, চ্ছিন্নঃ শ্লিষ্ট-পর্ব্বোভব-সংক্রমো, যস্যা—বিচ্ছেদাৎ জনিত্বা ম্রিয়তে, মৃত্বা চ জায়ত ইতি জ্ঞানস্যৈব পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্যম্।"

দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক এই উভয় বিধ বিষয়ের দোষ মনুষ্য দেখিয়া তাহাতে বিরক্ত হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার পর আত্ম স্বরূপ দর্শন ও বারম্বার আত্মতত্ত্ব অনুশীলন করত আত্মা বিশুদ্ধ (নির্ম্মল) ও অপরিণামী এইরূপ বিবেক দ্বারা বুদ্ধি আপ্যায়িত (পরিতৃপ্ত) হইলে সত্ত্বাদিগুণ ও তাহাদের ব্যক্ত ও অব্যক্ত (স্থূল সূক্ষ্ম) কার্য্য-কলাপের উপর গতস্পৃহ হয়, অর্থাৎ কোনরূপ প্রাকৃতিক কার্য্যে আর তাহার আসক্তি থাকে না। তাদৃশ আসক্তি-শূন্যতার নামই গুণ-বৈতৃষ্ণ। অতএব দুই প্রকার বৈরাগ্য (প্রথম এবং পর,) তাহার মধ্যে পর (দ্বিতীয় বা উত্তর কাল জাত) বৈরাগ্য জ্ঞানের প্রসাদ মাত্র, জ্ঞানের সম্পূর্ণ ঔজ্জ্বল্য স্বরূপ। ভাষ্যকার নিজেই জ্ঞান-প্রসাদ শব্দের জ্ঞানের পরাকাষ্ঠারূপ অর্থ করিয়াছেন; অর্থাৎ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত জ্ঞান—তাহার পর আর কোন বস্তু জানিতে বাকী রহিল বলিয়া একটা স্পৃহা থাকে না, জ্ঞান ঐ স্থানেই চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। যাহার উদয় হইলে প্রত্যুদিত-খ্যাতি অর্থাৎ আত্ম তত্ত্বদর্শী যোগী মনে মনে বিবেচনা করেন, যাহা পাই-বার তাহা পাইয়াছি, আর আমার প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, যে সকল ক্লেশ দূর করিবার ইচ্ছা ছিল, তাহারা দূর হইল; এবং যন্নিবন্ধন জন্ম মরণ ধারা অবিরত প্রবাহিত হইতে ছিল, সেই শ্লিষ্ট পর্ব্ব (শৃঙ্খলাবদ্ধ) ভব সংক্রম (সংসারে যাতায়াত) নিবৃত্ত হইল। এই বৈরাগ্য আর কিছুই নহে, জ্ঞানেরই পরা-কাষ্ঠা অর্থাৎ চরম সীমারূঢ় জ্ঞানেরই স্বরূপ।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, এও ত বড় মজার কথা, মহর্ষি পতঞ্জলি সূত্রে লিখিলেন "গুণ বৈতৃষ্ণ্য" গুণেতে তৃষ্ণার অভাব বা নিস্পৃহতা, ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যা করিলেন, উহা আর কিছুই নয়, চরম সীমারূঢ় জ্ঞানেরই স্বরূপ। ইহাদের পরস্পরের সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? বার্ত্তিককার

বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার উত্তর এইরূপ করিয়াছেন "ইতি চেৎ ন শব্দভেদেহপ্যর্থাভেদাৎ নহ্যভাবোহস্মন্মতেহতিরিক্তোহস্তি,অধিকরণস্যাবস্থা বিশেষশ্চৈবা-ভাবত্বাৎ, তথাচ চিত্তস্যৈব তাদৃশী জ্ঞানবত্বৈব তৃষ্ণাবিরহ ইতি অপিচ ভবতু বৈতৃষ্ণ্যমেব বৈরাগ্যং তথাপি জ্ঞান প্রসাদেনৈব বৈতৃষ্ণ্যলাভো বিশেষোহনুমীয়ত ইতি লিঙ্গলিঙ্গিনো রভেদোপচারাৎ সূত্র ভাষ্যয়োর্ন বিরোধঃ"। ইতি।

একথা বলিও না, কারণ তুমি দুটা দুই রকম শব্দ দেখিয়া ভয় পাইতেছ মাত্র, একটু তলাইয়া বুঝিলেই বেশ জানিতে পারিবে যে উহাদের একই তাৎপর্য্য। দেখ আমাদের মতে অভাব নাম একটা অতিরিক্ত পদার্থ নাই, আমরা বস্তুর অবস্থা বিশেষকেই অভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করি, অতএব চিত্তের উক্তরূপ জ্ঞানাবস্থাকেই আমরা তৃষ্ণা বিরহ বলিব। যদি অভাব একটা স্বতন্ত্র পদার্থ হয়,তাহা হইলেও তুমি ইহা অবশ্য স্বীকার করিবে যে জ্ঞানের প্রসাদ চিত্তের তাদৃশ বৈতৃষ্ণ্য বিশেষের অনুমাপক। তাহা যদি হয়, তবে প্রাচীন একটা নিয়ম আছে "অনুমাপক ও অনুমেয় এই উভয় অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, অতএব সেই নিয়মানুসারে গুণ বৈতৃষ্ণ্যের অনুমাপক জ্ঞান প্রসাদের গুণ বৈতৃষ্ণ্য অর্থ, এইরূপ আত্মা প্রসাদ যাহা চিত্তের গুণ বৈতৃষ্ণ্যের সহিত সম্বন্ধ, সেইরূপ জ্ঞান প্রসাদ হইলে চিত্তের গুণ বৈতৃষ্ণ্য অবশ্যই উৎপন্ন হয়, কখনই ব্যভিচার ঘটে না।

পূর্ব্বসূত্রে যে প্রকার বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে সেইরূপ বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলেও মনুষ্য যোগী হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যোগ শব্দের অর্থ চিত্তবৃত্তির নিরোধ। নিখিল চিত্ত বৃত্তির প্রসরাবরোধ বা কার্য্য নিবৃত্তি। এই চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। সমুদ্র যেমন সর্ব্বদা তরঙ্গ ভঙ্গে টলটলায়মান, মনুষ্যের চিত্ত, বৃত্তি ভরে ঠিক্ সেইরূপ। সমুদ্রের ঢেউ-এরমত ইহাতে প্রতিক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য বৃত্তি নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে, খেলিতেছে, আবার আর একদল বৃত্তিকে অবকাশ দিয়া (তাহাদের পথ মুক্ত করিয়া) আপনি আপনিই লীন হইতেছে। এই অসংখ্য বৃত্তির মধ্যে পূর্ব্বে যে বৈরাগ্যের উক্তি হইয়াছে তাহা দ্বারা কতিপয় মাত্রের নিরোধ সম্ভাবনা, কারণ সে বৈরাগ্য বিষয়-বিতৃষ্ণা,বিষয়ে নিস্পৃহতা বা বীতরাগ হওয়া। বিষয় শব্দের অর্থ স্ত্রী, অন্ন, পানীয় অথবা এক কথায় বলিতে হইলে, সমুদয় ভোগ্য জাত এবং ঐশ্বর্য্য—প্রভুতা, সামর্থ্য ও সম্পৎ; তাহা হইলেই হইল, অভিলষণীয় বস্তুর নাম বিষয়; যাহা লোকে চায় তাহার নাম বিষয়। আমাদের

চাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য সুখ হইলেও চাওয়াটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখের উপকরণ সামগ্রীরই ঘটিয়া থাকে। কারণ সুখ মনের একটী বৃত্তিমাত্র, অন্যের সম্বন্ধ ব্যতীত স্বয়ং উৎপন্ন হইতে পারে না, সাধারণত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধেই উহা উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত সুখোৎপাদক বস্তুদিগকেই আমরা চাই। সাধারণত সুখের উৎপাদক বস্তুদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভাল খাওয়া ভাল পরা প্রভৃতি, ভোগ্যবস্তুসকল; দ্বিতীয় ঐ সকল ভোগ্যবস্তুর সম্পাদক প্রভুত্ব, সামর্থ্য এবং সম্পৎ। সুতরাং একমাত্র সুখ মুখ্য অভিপ্রেত হইলেও সাধারণত চাওয়াটা দুই রকমের ঘটে; "ভার্য্যাং দেহি, ধনং দেহি, পুত্রং ভগবতি দেহি মে।" ভোগ্য বস্তু ও তাহার সম্পাদক প্রভুত্বাদি বিষয়ে; ঐ দ্বিবিধ চাওয়ার বস্তুই—বিষয়। বিষয়গুলি আবার ঐহিক পারত্রিক ভেদে দ্বিবিধ; ঐ সকল বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মাইলে আমাদের কাম লোভ প্রভৃতি কতকগুলি বৃত্তির নিরোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু যাবদীয় বৃত্তির নিরোধ হয় না।

যদি বল,পুরুষের বৃত্তিমাত্রই স্বার্থসাধনেচ্ছামূলক। যদি সেই মূলের উচ্ছেদ হয়, তবে শাখা পল্লব ফল ফুল ইত্যাদি সকলেই সেই সঙ্গে শুষ্ক হয়, তাহাদের নাশের নিমিত্ত আর স্বতন্ত্র উপায় করিতে হয় না। যদি অপর বৈরাগ্য দ্বারা সমগ্র বৃত্তির ছেদ সম্ভব হয় তবে পর বৈরাগ্য নিষ্প্রয়োজন।

মোটামুটি দেখিলে ঐরূপ বিবেচনা হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, অসূয়া, দ্বেষ, মদ মাৎসর্য্য ইত্যাদি বৃত্তির লোপ হইলেও, মানুষ মাটির মানুষের মত নিশ্চেষ্ট জড়ভাব প্রাপ্ত হইলেও চিত্ত একেবারে বৃত্তি শূন্য হয় না; কারণ বিষয় বিতৃষ্ণার সহিত জ্ঞান শক্তির লোপ হয় না। আমার ইচ্ছা নাই, নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমার চক্ষুর দর্শন শক্তির লোপ হয় নাই, আমার সম্মুখে যাহা আসিতেছে তাহাতেই চক্ষু পড়িতেছে,আমি তাহাদিগকে যে ভাবেই গ্রহণ করি, চক্ষু দ্বারা অবশ্যই তাহাদিগকে সেই ভাবে গ্রহণ করিতেছি। এইরূপ বিষ ও অমৃতের স্বাদ আমার নিকট তুল্য হইলেও তাহাদের একটা স্বাদ অবশ্যই অনুভব হইবে। এইরূপ কাণে শ্রবণ করি, আর ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করি। এক্ষণে দেখ এতগুলি কাজ যখন নির্ব্বাহ হয় তখন চিত্ত বৃত্তিশূন্য হয় ইহা আর কিরূপে বলা যায়? এখানে এইটুকু সার কথা বুঝিতে পারিলেই সকল বিষয় খোলাসা হইবে। আমরা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি বৃত্তি শব্দ চিত্তের অবস্থান্তর বা পরিণাম বুঝা যায় ঐ চিত্তের পরিণাম গুলি যেমন বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ঘটে, তেমনি চিত্তের উপাদান ভূত সত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের তারতম্য অনুসারেও উৎপন্ন হয়। অতএব আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কতকগুলি বাহ্য বস্তু সম্বন্ধ জন্য, আর কতকগুলি গুণ জন্য! পূর্ব্বোক্ত প্রথম বৈরাগ্য দ্বারা বাহ্য বস্তু সম্বন্ধ জাত কতকগুলি বৃত্তির লোপ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু গুণোৎপন্ন বৃত্তির লোপ হয় না। যতদিন ত্রিগুণাত্মক মোহ বা অবিদ্যা বিদ্যমান থাকিবে, যতদিন "আমার" "আমি" ইত্যাদি বোধ থাকিবে ততদিন ত্রিগুণোৎপন্ন বৃত্তির অধিকার থাকিবে; গুণের উচ্ছেদ না হইলে আর উহাদের লোপ হইবে না। অপিচ—

যতক্ষণ চিত্তের একটি মাত্র বৃত্তি অবস্থান করিবে ততক্ষণ অবধি চিত্তকে সম্পূর্ণ স্থির বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পার না। অতএব যদি সেই অবস্থায় আর কোন বৃত্তির স্বীকার নাই কর, কিন্তু তুমি ইহা অবশ্য স্বীকার করিবে যে লোকের ইচ্ছা লোপের সহিত আত্মজ্ঞানের লোপ হয় না, নিশ্চেষ্ট বা সচেষ্ট, ব্যাপক বা সঙ্কীর্ণ যে ভাবেই থাকি "আমি" এইরূপ একটা বোধ অবশ্যই থাকিবে, তাহা হইলেই চিত্ত সবৃত্তিক হইল। যতক্ষণ অবধি আমি বলিয়া বোধ থাকিবে ততক্ষণ অবধি চিত্ত সবৃত্তিক। আমি এই বোধ মোহ বা অবিদ্যামূলক। সেই মোহ বা অবিদ্যা আবার সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক। কাযেই চিত্তকে একেবারে বৃত্তি শূন্য করিতে হইলে অবিদ্যা বা মোহের হাত হইতে আপনাকে মোচন করা আবশ্যক, আমার আমিত্বকে বিস্মরণ করিতে যত্নবান্ হওয়া বিধেয়। আমার আমিত্বের উপর বিতৃষ্ণ হইতে চেষ্টা করাই প্রধান কার্য্য। উহা কিরূপে সাধিত হয়, তাহা মণিপ্রভা নামক বৃত্তিতে লিখিত হইয়াছে।

বিষয় দোষ দর্শন নিবন্ধন চিত্তের বশীকার সংজ্ঞা নামক প্রথম বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তাহার পর গুরুমুখ এবং শাস্ত্রের বচন হইতে পুরুষের (জীবাত্মার) স্বরূপ জানিতে পারে; জানিতে পারে আত্মা বিশুদ্ধ এবং অপরিণামী; তখন বাহ্য বিষয় পরিহার করিয়া সেই আত্মদর্শনে আগ্রহ জন্মায়, আত্মদর্শন করিবার সময় ধর্ম্মমেঘ নামে চিন্তার উদয় হয়, তখন চিত্ত হইতে রজঃ এবং তমোগুণরূপ মল অপগত হয়, খাটী সত্বগুণ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। চিত্ত অতিশয় প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়। সেই সম্পূর্ণ নির্ম্মল চিত্তে স্বভাবত বিশুদ্ধ

চৈতন্য-রূপী পুরুষ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় চিত্ত ও পুরুষ এক হইয়া যায়, আমার আমিত্ব দূর হয়, গুণত্রয়েয় বন্ধন উচ্ছেদ হয়, চিত্ত বৃত্তি শূন্য হয়।

চিত্তে আত্মার প্রতিবিম্ব হওয়াতে উহা জ্ঞান বটে, কিন্তু চরমসীমা প্রাপ্ত জ্ঞান, ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, কিছুরই পরিচ্ছেদ নাই। উহা আমার আমিত্ব দূর করিয়া জড়ে ও চৈতন্যে প্রভেদ করিয়াছে। ত্রিগুণ মূলক আমিত্বের মোহিনী শক্তির ছেদ হয় বলিয়া উহাকে গুণ বৈতৃষ্ণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব বৈরাগ্যদ্বয়কে যথাক্রমে বিষয় বৈরাগ্য এবং গুণ বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। যতদিন অবধি আর কিছু না থাক্ আমার আমিত্ব এইটুকু মাত্র থাকিবে, তত দিন এ চিত্ত সম্পূর্ণ স্থির নয়, চিত্তকে সম্পূর্ণ স্থির করিতে হইলে বিষয় বৈরাগ্যের মত গুণ বৈরাগ্যেরও আবশ্যক।

বিলাতী জুয়াচুরি।

ভুক্তভোগীর লেখা হইতে গৃহীত।

লণ্ডনের বণ্ডষ্ট্রীটে আমাদের দোকান। অন্যান্য দোকান অপেক্ষা আমাদের দোকানে অনেক বহুমূল্য ও পছন্দসই হীরা জহরত থাকিত বলিয়া আমাদের দোকানের খুব পসার ও নামডাক ছিল, অনেক বড় বড় ধনী লর্ড আমাদের দোকান হইতে জড়াও গহনাপত্র ক্রয় করিত। এ স্থলে বলা উচিত আমি নিজে দোকানদার নহি, তবে আমি অনেক দিন এ দোকানে কাজ করায় আমার এ কাজে বহুদর্শিতা জন্মিয়াছে বলিয়া ও বহুদিন বিশ্বস্তভাবে কাজ করিতেছি বলিয়া এখানে একপ্রকার আমি কর্ত্তার মত হইয়া আছি। জহরতের দোকানে প্রায় চুরি জুয়াচুরি হয় বলিয়া আমাদের প্রদর্শনী গৃহে (show room) কিছু বেশী পাহারার আঁটা আঁটি, খরিদ্দারের প্রতি সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আমরা বেচা কেনা করিয়া থাকি, আর আমাদের বড়

কর্ত্তার বিশেষ নিয়ম এই যে বিশেষ পরিচিত না হইলে আমরা কাহাকেও ধারে কোন জিনিস বেচি না, বা কেহ কোন ব্যাঙ্কের উপর টাকার বরাত দিলে যতক্ষণ না সে টাকা আদায় হয়, ততক্ষণ বিক্রীত দ্রব্য আমরা ক্রেতাকে ছাড়িয়া দিই না। এক কথায় অন্যান্য দোকানদারদিগের অপেক্ষা আমরা বেশী সতর্ক ও হিসাবী।

সচরাচর এই সকল চোর জুয়াচোরেরা বড় বড় জুড়ী গাড়ি করিয়া এরূপ জমকাল ভাবে দোকানে আসিয়া থাকে যে হঠাৎ ইহাদিগের প্রতি কাহারও সন্দেহ হয় না ও সন্দেহ করিতে সাহস হয় না। এছাড়া বিলাতে সস্ত্রীক লোককে সকলে অধিক বিশ্বাস করে বলিয়া অনেকেই প্রায় একজন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া লয়। এই যুবতীর বেশভূষা অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদিগের ন্যায়, কাহার সাধ্য মনে করে যে ইহারা দোকানে চুরি করিতে আসিয়াছে। কিন্তু এই সকল সুন্দরী বেশভূষালঙ্কৃতা যুবতীই এই সকল কার্য্যের প্রধান অংশীদার, ইহাদের সাহায্যেই জুয়াচোরেরা নিজ নিজ অভিপ্রায় সহজে বিনা বাধায় সম্পন্ন করে। জুয়াচোরেরা দোকানে যাইয়া এই স্ত্রীলোকদিগের সহিত এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহে যেন তিনি সম্প্রতি এই যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা শীঘ্র তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। কখন কখন কেবল স্ত্রীলোকেরাই এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

এইরূপ ছদ্মবেশে ইহারা দোকানে প্রবেশ করিয়া এজিনিস ওজিনিস দেখিয়া কিছু পছন্দ না হওয়ায়, কিছু ক্রয় না করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু তাহার পরেই প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই দোকান হইতে কোন একটা দামী অলঙ্কার এই মাত্র খোয়া গিয়াছে। ইহাদের এমনি হাত সেট্! কেহ কেহ ইহা অপেক্ষাও নিপুণ ব্যবসায়ী; তাহারা দোকানে যাইয়া চুরি না করিয়া নিজ গৃহে বসিয়া চুরি করে। ইহারা দোকানে আসিয়া জিনিস পছন্দ করিয়া দোকানদারকে একটা হোটেলের বা অপর কোন বাটির ঠিকানা বলিয়া দেয়, যে তাহার সেই ক্রীত জিনিশ দোকানের কোন লোক মারফত পাঠাইয়া দিলে তাহার হস্তে মূল্য দিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। দোকানদার সেই হুকুমমতে নির্দিষ্ট সময়ে দোকানের কোন কর্ম্মচারী দ্বারা সেই জিনিস পাঠাইয়া দেয়, কিয়ৎক্ষণ পরে সে ব্যক্তি রিক্ত হস্তে ও শুষ্ক মুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই সকল জুয়াচোর ধরিবার নিমিত্ত সচরাচর দোকানদারেরা খরিদদারদিগের প্রতি দুই প্রকারে লক্ষ্য রাখিয়া থাকে।

প্রথম, তাহাদের হাতের প্রতি, দ্বিতীয়, তাহাদের কথোপকথনের ভাষার প্রতি। এই সকল চোর জুয়াচোরদিগকে প্রায় ধরা পড়িয়া জেলে যাইতে হয়; সেখানে হাতে করিয়া শ্রমজীবীর কঠিন কাজ করিতে হয় বলিয়া ইহা-দিগের হস্ততল প্রায় কঠিন কর্কশ হইয়া পড়ে; কোন ভদ্রলোকের এরূপ হয় না; ইহাদিগকে ধরিবার এই এক উপায়। তৃতীয়, ইহারা যত কেন ভদ্র-লোক সাজুক না, যত কেন ভদ্র ভাষায় কথা কহুক না, ইহাদের ভাষায়, কথার প্রণালীতে, গলার স্বরে এরূপ একটা বিকৃত ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে যে তাহাতেই দোকানদারের ইহাদের উপর সন্দেহ জন্মে, সুতরাং তাহারা সতর্ক হয়। কিন্তু অধিকাংশ চোর এরূপ কৌশলী যে দোকানদারদিগের এই সকল সতর্কতাকে তাহারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। এক্ষণে আমার নিজের কথা বলা যাউক।

একদিন নিয়মিত সময়ে আমি দোকানে আপন কাজে ব্যস্ত আছি, এমন সময় আমাদের বড় কর্ত্তা এসে আমার কাণে চুপি চুপি বল্লেন, "তুমি প্রদর্শনী ঘরে গিয়ে দুজন খরিদ্দার আসিয়াছে, তাঁদের পছন্দসই জিনিস-পত্র দেখাও, কিন্তু সাবধান; তাঁদের চাউনিতে আমার কেমন সন্দেহ বোধ হচ্চে।" আজ্ঞামাত্র আমি তথায় যাইয়া দেখি একজন ভদ্রলোক একটি সুন্দরী যুবতীর সহিত জিনিসপত্র দেখিতেছেন। ভদ্রলোকটী দেখিতে কিছু কৃশ ও রুগ্ন, আর তাঁহার গলার স্বর কিছু খ্যাতখেতে গোছ। ভদ্রলোকটির সঙ্গে একটি নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র (respirator) রহি-য়াছে; তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল যেন তাঁহার হাঁপানিকাশীর ব্যারাম আছে। সঙ্গের যুবতীটি দীর্ঘাঙ্গী, মুখের উপরিভাগ নব বিবাহিতার ঘোমটা দ্বারা আচ্ছাদিত, তাঁহার আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু ও সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া তাঁহাকে কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা বলিয়া বোধ হইল; এক কথায় ইহাদি-গের উপর আমার কোন সন্দেহ উপস্থিত হইল না। ইহাঁরা দুইজনে এটা ওটা দেখিয়া শেষ একটি হস্তের ও একটি গলার অলঙ্কার দেখাইতে আমাকে আজ্ঞা করায়, আমি একে একে অল্প ও বহুমূল্যের নানাবিধ উক্ত দুই প্রকার অলঙ্কার দেখাইতে লাগিলাম। ভদ্রলোকটি দুই চারিটি অলঙ্কার দেখিয়া আমাকে বলিলেন, "বেশী দামী জিনিসের কোন প্রয়োজন নাই, অল্প দাম অথচ বেশ পরিষ্কার গড়নের জিনিস দেখাও।" আমি তাঁহার আজ্ঞা অনুযায়ী পঞ্চাশ হইতে ৫০০০ টাকার জিনিস পর্য্যন্ত দেখাইতে লাগিলাম। অনেক

দেখাশুনার পর ভদ্রলোকটি একযোড়া মাঝারি গোচ দামের অথচ বেশ পরিষ্কার কাজ করা হাতের গহনা নিয়ে বলিলেন, 'এই যোড়াটা আমার বেশ পছন্দ হচ্চে, এর দাম কত হবে?' আমি বলিলাম '৬০ গিনি।' সঙ্গী স্ত্রীলোকটি এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, তিনি এই কথা শুনিয়া একটু নাকতোলা গোছ করে বল্লেন, "হাঁ, বালা জোড়াটা মন্দ নয় বটে, কিন্তু খুব যে ভাল তাও নয়।" ভদ্রলোকটি জবাব দিলেন, 'কেন, তুমিত বলেচ বেশী দামী দরকার নাই। আর এতগুলোর মধ্যে এই যোড়াটাই আমার বেশী পছন্দ হচ্চে।' স্ত্রীলোকটি তাহাতেই সম্মত হইয়া গলার গহনার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'বা, কি চমৎকার গড়ন, অতি সুন্দর দেখ্‌তে ত।' আমি খরিদ্দারের মুখে এই প্রশংসা শুনিয়া দোকানদারের দস্তুরমত সেটিও তাঁহার হাতে তুলে দিলাম। বলা বাহুল্য, তাঁদের ভদ্রলোকের ন্যায় ভাব দেখে আমার সন্দেহটা একপ্রকার দূর হয়ে ছিল, এছাড়া আমার মনিব যে সন্দেহ করে আমাকে এদেঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেটাও আমি একপ্রকার ভুলে গিয়েছিলাম। স্ত্রীলোকটি গলার গহনাখানি একবার হাতে করে এদিক ওদিক নেড়েচেড়ে আবার প্রশংসা করে বল্লেন, "বা, দিব্য জিনিসটি, কি, চমৎকার! বড় সুন্দর কাজ করা, পছন্দসই জিনিস বটে!" সঙ্গী ভদ্রলোকটি সঙ্গিনীর—এই বারম্বার প্রশংসাধ্বনি শুনিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এটাও নেবার ইচ্ছা হয়েচে নাকি?' রমণী যেন উল্লসিত হয়ে অথচ লজ্জার খাতিরে বল্লেন, "না না, তবে জিনিসটা ভাল তাই দেখচি।" ভদ্রলোকটি যেন আরো আপ্যায়িত হয়ে বল্লেন, 'তার দোষ কি? কেনাবেচার দস্তুরই এই; চক্ষে ভাল ঠেক্‌লে নিতে হানি কি?' এই কথার পর উভয়ের চারি চক্ষু একবার সন্মিলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে কাণে কাণে কি কথাও হইল। তাহার পর আমায় জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম ৫০ গিনি। ভদ্রলোকটি আশ্চর্য্য ভাবে যেন একটু থাকিয়া চোক দুটো বিস্তারিত করে আশ্চর্য্য ভাবে বলে উঠলেন, 'উঃ ওই রত্তি জিনিসের এত দর।' কিন্তু জিনিসটি তাঁহার হাতেই নাড়াচাড়া হতে লাগ্‌ল। আমি একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে বল্লেম, 'জিনিসটা ছোট হলেও ওতে যে মুক্তা কটা রয়েচে, ওরূপ মুক্তা সচরাচর পাওয়া যায় না।' এই কথায় ভদ্রলোকটী একটু নিমরাজি হয়ে যেন অনিচ্ছা সত্বেও সেটি নিতে সম্মত হলেন। সঙ্গিনী এইরূপ খরিদ করায় বড় আহ্লাদিত হলেন, এবং আমি ভদ্রলোকটিকে জিনিসটি বুঝিয়ে সুজিয়ে দিয়ে দিলুম

বলে আমার প্রতি একবার সকৃতজ্ঞ সহাস্য দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। কে এরূপ সুন্দরী যুবতীর সকৃতজ্ঞ সহাস্য দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে? আমিও বিনীত ভাবে অভিবাদন করিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞ দৃষ্টির সম্মান রক্ষা করিলাম ও আমি মনে মনে তাঁহার বুদ্ধির বড় প্রশংসা করিয়া বলিলাম, যে এরূপ বুদ্ধিমতী খরিদদার না হইলে কি আমাদের দোকান চলে? পুরুষ গুলো কেবল শস্তার দিকে যায়। এক্ষণে আমি তাঁদের বুদ্ধিকৌশলে এতদূর মোহিত হইয়াছি ও তাঁহাদের প্রতি এতদূর আমার বিশ্বাস জন্মেছে, যে দোকানের প্রতি আমার আর চক্ষু নাই।

বিলাতের দস্তুর ক্রেতারা প্রায় সঙ্গে করিয়া টাকা আনে না, দোকানদার ক্রীত জিনিষ পাঠাইয়া দিয়া বাড়ি হইতে টাকা আদায় করে। সেই রীতি অনুসারে আমি বলিলাম 'মহাশয়, আপনাদের এসব কোন ঠিকানায় পাঠাতে হবে?' সঙ্গী স্ত্রীলোকটি বলিয়া উঠিলেন, 'আমরা সঙ্গে করেই নিয়ে যাব, তোমাকে আর কষ্ট করে পাঠাতে হবে না।' আমি এই প্রত্যুত্তরে অপ্যায়িত হয়ে দাম চাইলাম। ভদ্রলোকটি এই কথায় পকেট হইতে এক চেক বই বাহির করিয়া একটা ব্যাঙ্কের নামে এক শত দশ গিনির এক রসিদ লিখে দিলেন। চেক খানি হাতে লইয়া এইবার আমাকে একটু চক্ষু লজ্জা পরিত্যাগ করে বলতে হ'ল, 'মহাশয়, আমাদের দোকানের বরাবর নিয়ম আছে যে ব্যাঙ্ক হতে যতক্ষণ না চেকের টাকা আদায় হয়, ততক্ষণ আমরা কোন জিনিষ খদ্দেরকে ছেড়ে দিই না?' এই সময় আমার মনিবের সেই সতর্ক বাক্য মনে পড়িল, যদিও একজন ভদ্রলোককে এই প্রকার রূঢ় কথা বলাতে আমার একটু লজ্জাবোধ হইল, আমি মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হলেম, কিন্তু ভদ্রলোকটি আমার এই প্রকার সতর্কতা দেখে কিছুমাত্র বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং সহাস্য মুখে বলিলেন 'বেশত বেশত, আপনাদের এইরূপ সাবধান হওয়াইত উচিত, বিশেষত আজ কাল যেরূপ দিন কাল পড়েছে।' তাঁহার এই উদারতায় আমি আরো লজ্জিত হলেম, এবং তাঁর প্রতি আমার যে একটু সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছিল, সেটুকুও একেবারে গেল। কিন্তু সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটির ভাবে একটু বিরক্তির চিহ্ন দেখা গেল। যাহাই হউক, ভদ্রলোকটি আপনার নাম ও ঠিকানার কার্ড দিয়ে চলে গেলেন। অতঃপর আমাদের একজন লোককে সেই চেকের টাকার জন্য ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া আমি Show room এর যে-যে জিনিষ খুলে তাঁদের

দেখিয়ে ছিলাম, সব মিলিয়ে দেখ্‌লাম ঠিক আছে, কোন গোল মাল হয় নি। এই সময় তাঁদের চেকের টাকা আদায় হয়ে এল, সুতরাং আর আমাদের সন্দেহের কোণ কারণ রহিল না, বরং আমার অকারণে একজন ভদ্রলোকের প্রতি এরূপ সন্দেহ করা হয়েছে, বলে মনে মনে আমি বড় লজ্জিত হলেম; এবং সেই ভদ্রলোকের নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় তাঁর ক্রীত অলঙ্কার দুটি পাঠিয়ে দিলাম।

* * * *

ইহার পর একমাস সময় অতীত হইল। একদিন আমি নিয়মিত সময়ে Show room এ বসে আছি, এমন সময় সেই পূর্ব্বোক্ত যুবতী পুনরায় একা আমাদের দোকানে এসে দেখা দিলেন। এবারও তাঁহার মুখ ঘোমটায় অর্দ্ধাচ্ছাদিত বটে, কিন্তু এবার আর সেই নব প্রস্ফুটিত গোলাপ সদৃশ সুন্দর মুখশ্রী নাই, এবার তাঁহার মুখ খানি কিছু ম্লান, বিমর্ষ; তাতে যেন অব্যক্তভাবে ভাবে কোন মানসিক দুঃখের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্চে। প্রথমেই দুচার কথায় তাঁর স্বামীর, সেই ভদ্রলোকটির, কঠিন পীড়ার কথা উল্লেখ করে, তাঁর দোকানে একা আসবার ও বিমর্ষ ভাবের কারণ বলে, সেই পূর্ব্বোক্ত গলার গয়নাখানি বার করে বল্লেন, এখানা ভেঙ্গে যাওয়াতে মেরামতের জন্য এবার আমি এসেছি; তাঁর স্বামীর কঠিন পীড়ার কথা শুনে আমি একটু দুঃখিত হলেম ও মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করে তাঁকে আশ্বস্ত করে সেই অলঙ্কার খানি মেরামতে স্বীকৃত হলেম। এবার এঁর সহিত কথা বার্ত্তায় ইনি যে যথার্থ একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের সুশিক্ষিতা মহিলা সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তাঁর স্বামীর পীড়ার পরিচয়ে বুঝতে পাল্লেম, যে তিনিই আরোগ্যের জন্য এখানে (লণ্ডনে) এসে বাস কচ্চেন। স্ত্রীলোকটি লণ্ডনের একজন খুব বড় নামজাদা ডাক্তারের নাম করে বল্লেন, তিনিই এখন তাঁর স্বামীর চিকিৎসা কচ্চেন, কিন্তু এখানে এসে অবধি রোগ ক্রমাগত বাড়চে বলে তিনি তাঁকে শীঘ্র স্পেনে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আদেশ করেছেন। ইহার পর তিনি আমাদের দোকানের দুই চারি খানি সাজান গহনার প্রশংসা করাতে আমি তাঁকে দু এক খানি করে গহনা দেখাতে আরম্ভ কল্লেম, তিনি স্বামীর পীড়ার জন্য দুঃখ করতে করতে সেগুলি দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে কয়েক খানি ভাল কাজ করা দামী জড়ওয়া গহনা পছন্দ করায় আমি তাঁর অনুমতি অপেক্ষায় বলিলাম, যদি

আপনি অনুমতি করেন, তাহলে এগুলি সব কাল আপনার স্বামীর নিকট আমাদের লোক মারফত পাঠিয়ে দি; যদি এর মধ্যে তিনি আপনার জন্য কিছু গ্রহণ করেন।' স্ত্রীলোকটী আবার এই প্রস্তাবে বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করে বিনীত ভাবে বল্লেন, 'আমার স্বামী এসব গহনা পত্র পছন্দ করেন বটে, কিন্তু তিনি এখন যেরূপ পীড়িত, তাতে যে এসময় তিনি কিছু নেবেন এমন আমার বিশ্বাস হয় না, তবে আপনি যখন অনুরোধ কচ্চেন, তখন একবার পাঠিয়ে দেখবেন, যদি এর মধ্যে তিনি কিছু গ্রহণ করেন; বিশেষ তিনি হীরার আংটি আর ঘড়ির চেন বড় পছন্দ করেন।' এই সব কথা বার্ত্তার পর যুবতী আমাকে অভিবাদন করে প্রস্থান কল্লেন। বলা বাহুল্য তাঁর সুমধুর আলাপে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলাম।

পর দিন নির্দ্ধারিত সময়ে নানাবিধ অলঙ্কার লইয়া নির্দ্দিষ্ট আবাসে হোটেলে যাইয়া উপস্থিত হইলাম—সঙ্গে আমাদের দোকানের একজন মাত্র দরোয়ান ছিল। যাইবা মাত্রই প্রথমে আমার সহিত হোটেলের অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার দু এক কথায় আমাদের ক্রেতার পরিচয় পাইলাম। তিনি তাঁহার বড় প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে ইনি yorkshire এর একজন ধনী লোক ও অনেকগুলি কয়লার খনির অধিস্বামী। পীড়িত হইয়া ইনি এখানকার রাজ চিকিৎসক Sir Ealing Dean এর পরামর্শ গ্রহণের জন্য এসেছেন। ইনি আরো একবার এইজন্য এখানে এসেছিলেন; ইনি অতি ভদ্রলোক, আর ইহাঁর স্ত্রী বড় সতী সাধ্বী, দিন রাত স্বামীর সেবায় নিযুক্ত আছেন। হোটেলাধ্যক্ষের মুখে এই পরিচয় পেয়ে আমি পরম আহ্লাদিত হলেম। পরে আমাদের ক্রেতা যে ঘরে ছিলেন আমি সেই ঘরে প্রবেশ কল্লেম। ভদ্রলোকটির স্ত্রী সেই ঘরে বসে ছিলেন, তাঁর স্বামী তার পাশের ঘরে শুয়ে ছিলেন, আমার প্রবেশ মাত্র তিনি উঠে আমাকে ভদ্রোচিত অভ্যর্থনা করে, বস্‌তে একখানা চৌকী দেখিয়ে দিলেন, আমি তাহাতে বস্‌লেম, তিনি পার্শ্বের ঘরে তাঁর স্বামীর নিকট আমার আগমন সংবাদ দিতে উঠে গেলেন। এস্থলে বলা উচিত আমার সঙ্গী দরোয়ান হোটেলের দ্বারে আমার প্রতীক্ষায় নীচে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত পরে তিনি প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে তাঁহার স্বামীর নিকট লইয়া গেলেন। যে ঘরটিতে আমাদের ক্রেতা মহাশয় ছিলেন, সেটি একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর গৃহ, দোর জানালাগুলি সব পরদা ঢাকা, ভদ্রলোকটি

এক খানি কৌচে শুয়ে খবরের কাগজ পড়চেন; এবার দেখে বোধ হল যেন তিনি পূর্ব্বের অপেক্ষায় কাহিল হয়ে পড়েচেন, চোক মুখ বসে গেছে। আমি গৃহে প্রবেশ মাত্র ক্লেশযুক্ত সহাস্য বদনে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আমায় অভিবাদন কল্লেন, পরে শিষ্টাচার সহকারে বল্লেন, 'আপনাকে এই কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি বড় দুঃখিত হলেম, আমার বড় অসুখ শরীর বলে আমি আপনাদের দোকানে যেতে পারি নে, আমার বড় ইচ্ছা ছিল, আমি স্বয়ং গিয়ে পছন্দ-সই দুটা একটা অলঙ্কার কিনে আনব। যাহা হউক, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করে এতদূর কষ্ট স্বীকার করে আমার জন্য এসেছেন, এজন্য আমি আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিচ্চি, আপনার এই অনুগ্রহে আমি অত্যন্ত অপ্যায়িত হলেম।' এই প্রথম শিষ্টাচারের পর আমি গহনার বাক্স খুলে তাঁহাকে একে একে দেখাবার উপক্রম কর্‌চি,এমন সময় তিনি পুনরায় বলে উঠলেন,'অধিক কিছু আনেন্ নিত, আমার এখন অসুস্থ শরীর আমি বেশী জিনিষ পত্র পছন্দ কর্‌তে পারব না,তবে লুসির জন্য অল্প দামের মত দু এক খানা নেব।'

রোগীর শয্যার পার্শ্বে ঔষধের শিশি, গ্ল্যাস, আর একটা বড় গলা উচু পাত্র রয়েছে, বোধ হয়, সেটায় জল বা ঐরূপ কোন জিনিস ছিল। আর একখান ফ্লানেলের চাদরে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ছিল।

আমি একে একে দুই এক খান করে অলঙ্কার তাঁর হাতে তুলে দেখাতে লাগলেম; তিনি দেখিতে লাগলেন; কিন্তু তার মুখের ভাবে বোধ হতে লাগল, যেন এগুল তাঁর তত পছন্দ হচ্চে না, আমি একে একে ভাল ভাল জিনিস বার কর্ত্তে আরম্ভ কল্লেম। তার পর একযোড়া হাতের অলঙ্কার নিয়ে তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্লেন,'দেখদেখি এ যোড়াটা তোমার হাতে কেমন হয়?' যুবতী সহাস্যবদনে যোড়াটি নিয়ে হাতে দিয়ে তাঁর স্বামীর প্রতি আহ্লাদপূর্ণ দৃষ্টিতে কটাক্ষপাত করিলেন। এই সময় ভদ্রলোকটি তাঁর স্ত্রীকে এক গ্ল্যাস সেরি মদ প্রদানের আদেশ কল্লেন, স্ত্রীলোকটি সেরি এনে দিবা মাত্র ভদ্রলোকটি অমনি আর এক গ্ল্যাস পোর্টের জন্য স্ত্রীকে অনুরোধ কল্লেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার এই অনুরোধে বাধা দিয়া বলিলেন "সার ই— তোমাকে অধিক মদ খেতে বারণ।' স্বামী এই কথা শুনে যেন কাতর হয়ে বল্লেন,'আমার প্রাণ যায়, শীঘ্র দাও,ডাক্তারের জ্বালায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল,এখন আমাকে সুখে মরতে দাও।' এই কথায় তাঁর স্ত্রীর বক্ষে দুই এক

বিন্দু জলধারা পতিত হইল, তিনি নিঃশব্দে এক গেলাস পোর্ট আনিয়া স্বামীর সমক্ষে রক্ষা করিলেন। তাহার পর ভদ্রলোকটি নিজে এক গ্লাস পান করিয়া আমাকে এক গেলাস পানে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহার শিষ্টাচারের জন্য ধন্যবাদ দিয়া সুরা পানে অস্বীকার করায়, তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন তবে 'পোর্ট খাবেন কি? অতি চমৎকার পোর্ট।' আমি তাহাতেও অস্বীকার করায় ভদ্রলোকটি পুনরায় গহনা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার কাছে আর কিছু গহনা আছে,' আমি আরো কয়েকখানি দেখাইয়া বলিলাম, " আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি এখনি দোকান হতে আরো নূতন জিনিস এনে দেখাচ্ছি।" আমার সঙ্গে প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা ছিল। ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন,'না, না, আমি ওই হতেই একটা পছন্দ করে নিচ্চি'; তাহার পর একযোড়া বালা লইয়া তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন; আমি বলিলাম ৩৫ গিনি। ভদ্রলোকটি চমকিয়া উঠিয়া তাহা রাখিয়া বলিলেন,'উঃ এত দর!' তাহার পর আমায় বলিলেন, " আচ্ছা আপনি যখন কষ্ট করে এনেছেন তখন কিছু না নেওয়া ভাল দেখায় না।" আমি তাঁহার এই সৌজন্যে বড় বাধিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলাম,'আপনারা ভদ্রলোক, অবশ্য কিছু না নিলে আমাদের দোকান চলিবে কেমন করে, অবশ্য নেবেন বই কি।' এই সময় ভদ্রলোকটি হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন,'উঃ গেলুম, গেলুম, বড় দুর্গন্ধ, লুসি, শীঘ্র খানিকটা ভিনিগার ঘরে ছড়িয়ে দাও।' আমি হঠাৎ তাঁহার এই প্রকার ভাব দেখে কিছু চমৎকৃত হলেম; বস্তুত, আমি ঘরে কোন প্রকার দুর্গন্ধ অনুভব করি নাই। লুসি এই কথায় খানিকটা ভিনিগার ঘরে ছড়াইয়া দিল। তাহার পর ভদ্রলোকটি সহাস্য বদনে পুনরায় অলঙ্কার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। পুনরায় একছড়া মুক্তার মালা লইয়া দাম জিজ্ঞাসা করায় আমি ৪০০০ টাকা বলিলাম। ভদ্রলোকটি এই কথায় মালাছড়াটি আমার হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, 'না মশায়, আমরা গরিব মানুষ, চার হাজার টাকার মুক্তার মালা কেনা আমার মত লোকের সাধ্য নয়। ডাক্তারেই আমার সর্ব্বনাশ কল্লে।' এই সময় পুনরায় সেইরূপ চীৎকার করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ভিনিগার ছড়াইয়া দুর্গন্ধ নিবারণ করিতে আদেশ করিলেন। আমি কিছু আশ্চর্য্য হইলাম, বোধ হইল, এই বুঝি এঁর রোগের খেয়াল।

কিন্তু এবার তাঁহার স্ত্রী আর ঘরে ভিনিগার না ছড়াইয়া একখান রুমাল লইয়া তাহাতে খানিকটা ভিনিগার লইয়া নাড়িতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আরো খানিকটা ঘরে ছড়াইতে আদেশ করিয়া আমাকে ঘড়ি ও চেন দেখাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি ভাল চেন বাছিতে লাগিলাম, তাঁহার স্ত্রী আমার নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, ভদ্রলোকটি এই সময় বলিয়া উঠিলেন 'শীঘ্র, শীঘ্র, গেলুম, গেলুম।' এই কথা বলিয়াই তিনি নিজে এক শিশি লইয়া ঘরে ছড়াইলেন ; আমি ভয়ানক তীব্র গন্ধ অনুভব করিতে লাগিলাম ও কিছু কষ্ট হওয়ায় আঁকুপাঁকু করিয়া উঠিলাম, আমার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। আমাকে এই প্রকার করিতে দেখিয়া ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন,'মহাশয়, বোধ হয়, আপনার কিছু কষ্ট বোধ হচ্চে',বলিয়াই সেই ভিজা রুমাল দ্বারা আমার নাক মুখ চাপিয়া ধরিয়া আমাকে জোর করিয়া একখান চৌকিতে শোয়াইয়া দিলেন। তাহার পর কি হইল আমার ঠিক স্মরণ হয় না। তবে আমার বোধ হয়, যেন আমি একবার নিতান্ত দুর্ব্বলভাবে তাঁহার এই কার্য্যে বাধা দিয়াছিলাম। কিন্তু যেন এক প্রকার অননুভূত শক্তি আমার সমস্ত বল হরণ করিয়া লইল। আমি যদিও একবারে অজ্ঞান অচেতন হইয়া পড়িলাম না বটে, কিন্তু এমনি আমার হাত পা দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল যে আমার নাড়িবারও শক্তি থাকিল না। আমি জীবিতাবস্থায় যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। যেন ঘুমের ঘোরে ক্ষীণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম, ভদ্রলোকটি আমার হাতদুটি ধরিয়া রাখিয়াছে, আর তাহার স্ত্রী আমার সঙ্গে যাহা কিছু ছিল সমস্ত আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতেছে। তাহার পর আমার মুখ চিরিয়া আমার মুখে কি যেন জলের মত ঢালিয়া দিল। পরে আমার কানে স্বপ্নবৎ বোধ হইল, যেন ঘরের দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া তাহারা চলিয়া গেল। আমি জাগ্রত অবস্থায় এই স্বপ্নবৎ কার্য্য দেখিতে লাগিলাম। নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া দেখি সেই ঘরে আমি একা। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব কথা মনে স্মরণ করিয়া জ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন একে একে আমি গহনাপত্র খুঁজিতে গিয়া দেখি যে সে সকল কিছুই নাই। দ্বারের নিকট গিয়া দেখি দ্বার বাহির দিক হইতে রুদ্ধ। তখন আমার সম্পূর্ণ চেতনোদ্রেক হইল। তবে কি আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম, না উহা সত্য ঘটনা। অলঙ্কারের বাক্স নিকটেই পড়িয়াছিল, খুলিয়া দেখি যে উহা শূন্য।

এখনও আমি মাতালের ন্যায়; আমার মস্তিষ্ক ভালরূপ প্রকৃতস্থ হয় নাই; যদিও আমি অনেকটা নিজ অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি; নিকটে চাকরদের ডাকিবার জন্য ঘণ্টা ছিল, তাহা বাজাইলাম; একজন চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে ইহাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। চাকর জবাব দিল তাঁহারা ত অনেকক্ষণ এখান হইতে চলিয়া গেছেন, 'আপনার আহার প্রস্তুত, আসুন।' আমি (আশ্চর্য্য ভাবে) 'আহার প্রস্তুত!' চাকর। 'আজ্ঞা, হাঁ মহাশয়, তাঁরা আপনার জন্য আহার প্রস্তুত রাখিতে বলে গেছেন।'

আর আমার বুঝিতে বাকি রহিল না। ইহার পর যাহা হইল পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন, তবে হোটেলাধ্যক্ষ অনেকক্ষণ তাঁহাদের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন।

শ্রী কালীপ্রসন্ন দত্ত।

কাব্যের কোকিল।

একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে; প্রবাদটী প্রায় সকলেই সময়ে সময়ে ব্যবহার করে; প্রবাদটী এই:—"কৃষ্ণ কেমন? যার মনে যেমন।" পৃথিবীর পদার্থপুঞ্জ সকলে সমান চক্ষে দেখিতে পায় না—সকলে সমান ভাবে ধারণা করিতে পারে না। একজন, সামান্য বালুকারেণু হাতে লইয়া ভাবে তদ্গত; আর একজন শত শত, পাহাড়, পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া হু হু শব্দে চলিয়া যাইতেছে, ভ্রূক্ষেপও নাই। একজন একটী সাধারণ পত্রের শোভা সৌন্দর্য্যে বিমোহিত; আর একজন হাটিতে হাটিতে, সেই পত্রটী বৃন্তচ্যুত করিয়া নখে ছিঁড়িয়া অম্লান বদনে চলিয়া যাইতে সমর্থ। একজন নদী, মাঠ, ঘাট—সবই সুন্দরতাময় দেখে; আর একজন

তাজমহলে যাইয়াও এটী ওটীর দোষ অনুসন্ধানে তৎপর! কাহারও পৃথিবী—সুখের পরিবার, ভাবময়, আবেশময়; কাহারও পৃথিবী চিরশুষ্ক—মরুভূমি।

জগতের সর্ব্বত্র এই মতদ্বৈধ; সর্ব্বত্র এই বৈষম্যবাদ। এই বৈষম্য প্রার্থনীয় হউক আর নাই হউক, সকল বিষয়েই ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয়; বর্ণ, আকার, গঠন, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোক সৌন্দর্য্যের উপাদান কল্পনা করে; কিন্তু, এসকল ত সবই বাহ্যিক; প্রকৃত সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক অতি অল্প—আদবে আছে কি না সন্দেহ। সৌন্দর্য্য—জড়ত্ববিরোধী উদ্বোধন; চখে মুখে এর সত্ত্বা নাই; এর স্থান হৃদয়ে।

সময়ে সময়ে, সংসার যেন কুজ্ঝটিকাবৃত—ঘোর তমসাচ্ছন্ন; গাছগুলি অন্ধকারে ভূত প্রেত বলিয়া ভয় হয়; চারিদিকে সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভ্রান্তি। মন যেন কি জানিতে চায়; ঘোর পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ; জলের অত্যন্তাভাব। যেদিক দেখা যায় কি যেন দেখি, দেখি—দেখিতে পাই না; যেন কেমন অভেদ্য, দুর্ব্বোধ। এমন অনেক সময় আসে,—

In which the burthen of the mystery,
In which the heavy and the weary weight
Of all this unintellegible world,—

যখন এই দুর্ব্বোধ জগতের দুর্ভার রহস্য রাশি আমাদের উপর আসিয়া চাপিয়া পড়ে। ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই স্থির করা যায় না; হৃদয়ের অন্তস্তল প্রদেশ হইতে কে যেন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে:—

কোথা হতে আসি, কোথা ভাসি যায়?
সঞ্চার আবার হয় কি হেথায়?
বীজে অঙ্কুরিত, বীজে পরিণতি?
চক্রাবর্ত্ত ভাবে দুরলঙ্ঘ্য গতি?
গ্রহের মতন চক্রেতে ভ্রমণ?
ধূমকেতু মত অথবা গমন,
অনির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমি চির দিন,
ভ্রমি ভ্রমি সূর্য্যে হইবে বিলীন?

পৃথিবীর দিকে তাকাইলেও সমস্তই কোলাহল—গণ্ডগোল—বিশৃঙ্খলা! গুণীর আদর নাই, নির্গুণ বেশ গণ্য মান্য; গগনস্পর্শী বৃক্ষশাখায় সিমুল

ফুলের স্থান ; আর গোলাপ ? গোলাপ গাছটী আওতায় পচিতেছে—টপ্‌টপানি খাইতেছে। ধার্ম্মিকের সমৃদ্ধি নাই, যত সব ভণ্ড তপস্বী বেশ আসর জম-কাইয়া ধার্ম্মিক নামে পরিচিত ; যার যেখানে সমাবেশ প্রার্থনীয়, সেখানে তার নামগন্ধও নাই ; যেন রেলের গাড়ী পূরা দমে চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে—সকলই ওতপ্রোত, অর্দ্ধ সম্পন্ন ;—

যে দিকে চাওয়া যায় সেই দিকেই "অহো বিধাতঃ শিশুতা তবৈব।" বলিয়া উষ্ণ শ্বাস ফেলিতে হয় ! সমস্তই অনিয়ম— সমস্তই কবির chaos !

যাহাতে জগতের এই বিরোধের ভঞ্জন হয়, যাহাতে ইহার পরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব শান্তি সদ্ভাব সংস্থাপন করে,—তাহাই সৌন্দর্য্য ; যাহাতে ধরার সচ্ছন্দ সম্ভারে বিশ্বময়ের বিশ্বরূপ প্রকটিত করে ; যাহাতে প্রতি পরমাণুতে তাঁহার শৃঙ্খলা, অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের বিকাশ হয় ; যাহা মনে ধরিয়া, ইচ্ছাময়ের ব্রহ্মাণ্ডময় অপ্রমিত তেজ, ফুটন্ত ফুলের ন্যায় মনশ্চক্ষুর গোচর হয়, তাহারই নাম সৌন্দর্য্য। প্রেম, মিলন—সৌন্দর্য্যের কাজ ; সামঞ্জস্য—সুন্দর ; অসামঞ্জস্য—অসুন্দর। এই জন্যই, চন্দ্রবাবু বলেন, যাহা সুন্দর নয়, তাহাকে যাহা অতীব সুন্দর দেখে, এমন মনই সৌন্দর্য্য দেখিতে পারে ; চক্ষু এবিষয়ে অন্ধ। বঙ্কিম বাবুর এই স্থানটি বড়ই রমণীয় ; "গোবিন্দলাল উদ্যানে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন প্রকৃতি করুণাময়ী।" প্রকৃতির এই করুণা—সৌন্দর্য্যের অপর নাম—এই করুণা সতত সামঞ্জস্য স্থাপনে চেষ্টিত। প্রকৃতি ধীরে ধীরে ছাঁটিয়া ছাঁটিয়া সকলের উচু নীচু দূর করিয়া সমান করিতেছে ; প্রকৃতির সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য ; প্রকৃতি হইতে আর অধিক সুন্দরী কে ? কবি রবি ঠাকুর এ কথা বেশ বুঝাইয়াছেন।

এখন কাব্যের কোকিলের কথা বলিব। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ বিরহিণী রাধা "পায়স লেই করে বায়স নিয়ড়ে ফুকারি," যেন কাকে আর কোকিল পালন-না করে—যেন কোকিলের ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া ফেলে—বিরহিণীর এক প্রধান শত্রু নিপাত হইবে। বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের অসীম মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন ; কিন্তু, কোকিল, ভ্রমর, চাঁদ, মলয়বায়ু,. এ সকল সম্বন্ধে তাঁহাদের বর্ণনা প্রেমের ব্যাকুলতার সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে গিয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ কেন ? কালিদাসও বলেন ;—

"সমদ মধুকরাণাং কোকিলানাঞ্চনাদৈঃ।
কুসুমিত সহকারৈঃ কর্ণিকারৈশ্চরম্যৈঃ॥

ইষুভিরিব সুতীক্ষ্ণৈ র্মানসং মানিনীনাং।
তুদতি কুসুমবাণো মন্মথোদ্দীপনায়॥"

এইরূপ আদি কবিগণ প্রায় সকলেই কোকিলরবে একরূপ ভয়ানক লালসা—এক ভয়ানক গলা শুকানো পিপাসা সংযোগ করিয়া গিয়াছেন; এ পিপাসা দেশ, দিক, পাত্র ভেদে যেরূপই ধারণ করুক, সাধারণত ধারণা,-ইহা একরাশি বিষ মিশ্রিত। কিন্তু তাম্র পাত্রে দুগ্ধ রাখিলে যে বিষ হয়, তা কি দুগ্ধের দোষ? দুগ্ধ জগতের জীবন, কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগী দুগ্ধ পান করিলে স্বতই অধিকতর বিকারতা প্রাপ্ত হয়! ফল কথা;—

"There is nothing good or bad;
But thinking makes it so."
ভাল মন্দ কিছুই নাই,
মনের গুণে ভেদ রে ভাই।

চন্দ্রবাবু বলেন, সরল বালক সমস্ত রাত্রি সুখের ঘুম ঘুমাইয়া নিশিশেষে কোকিল রবে আহ্লাদে মাতিয়া খেলা করিতে ছোটে। কই? সে তো কোকিলের গরলের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠে না।

বঙ্কিমবাবু কোকিলের বেশ চিত্রটী আঁকিয়াছেন; তাঁহার কোকিলেও বিষ আছে—সে বিষ শোধিত বিষ; সে বিষের জ্বালায় অন্তর দহে বটে; কিন্তু, সে প্রদাহের পরিণাম মৃত্যু নয়—শান্তিপূর্ণ স্থির ভাবও নয়। উহা ব্যাকুলতা; সে ব্যাকুলতায় মানুষকে বসাইয়া দেয় না—সামনের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। অথচ বঙ্কিমবাবুর কোকিল যেন কেমন এক হা হতোঽস্মির ভাব আনিয়া ফেলে। "কি যেন ছিল; কি যেন নাই; যেন তাহার অভাবে জীবন অসার হইয়া পড়িয়াছে।"

তার পর, ওয়ার্ডসোয়ার্থের কোকিল। যে সকল অপরিস্ফুট তত্ত্ব দার্শনিকগণ সংসার-সংস্রব-বিহীন নিরবচ্ছিন্ন সত্য বলিয়া ধ্যান করেন, সেই সকল নানা অপরিজ্ঞেয় উপায়ে মানব মনে সমুদিত হইয়া তাহাকে স্বর্গীয় মত্ততায় মাতাল করিয়া তোলে; ব্যক্তি বিশেষকে মহাশক্তি স্বমূর্ত্তিধরিরা দেখা দেন, আর নাই দেন, সাধারণ মানব জাতির নিকট তিনি অল্প অধিক পরিমাণে স্বতই পরিস্ফুট। এই স্বর্গীয় মত্ততা—এই আগ্রহাতিশয্যই প্রকৃত উদ্বোধন। চৈতন্যকে যখন উর্দ্ধবাহু হইয়া বিগলিত নেত্রে গাইতে দেখি—

"পরম দয়াল আমার গোসাঞি।
যখন যা চাই তখন তা পাই॥"

যখন দেখিতে পাই, যিশুখ্রীষ্ট বিশ্বাস বিস্ফারিত লোচনে বলিতেছেন "Ask and it shall be given; knock and it shall be open;"

যাচিতে থাকিলে মিলিবে ধন, দুয়ারে ঘা দিলে, খুলিবে কবাট।

তখন আমরা বুঝিতে পারি প্রার্থনা দ্বারা কত কি করা যায়। বস্তুত প্রকৃত প্রার্থনা, আধ্যাত্মিক জগৎ সম্মুখ লইয়া আসে। আবার প্রেম—বিশ্বজনীন প্রেম, সার্ব্বভৌমিক প্রীতি—স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করে। ওয়ার্ডসোয়ার্থও এই কথাই বলেন; কিন্তু তিনি এখন একটু বাড়াইয়া বলেন; তিনি যা বাড়াইয়াছেন, তা সকলেরই অনুকরণীয়—শিক্ষণীয়। তিনি দেখাইয়াছেন, ফুল, ফল, লতা, পাতা, একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকণা—ধ্যান করিয়াও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। তিনি বলেন প্রকৃতির প্রকৃত ধ্যান করিয়া মানুষ জড় পদার্থের জীবন দেখিতে পায়। ওয়ার্ডসোয়ার্থ নিজেই এ কথার বিশিষ্ট প্রমাণ; তাঁহার জীবন দেখিলে একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি; তিনি বলেন;—

"I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts.

আমি এমন সত্তা উপলব্ধি করিয়াছি যে, তাহাতে কি এক মহান্ ভাবে আমাকে ব্যাকুল করিয়াছে।

তিনি বলেন জীবনে এমন সময় আসিয়াছে—

"When the light of sense goes out, but a flash has revealed the invisible world."

যখন এই বাহিরের আলোকে নিবিয়া যায় কিন্তু অন্তরে বিদ্যুৎ বিকাশে অদৃষ্ট জগৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

ওয়ার্ডসোর্থের কোকিলে—অন্যান্য লেখার কথা বলিতেছি না—এই প্রাকৃতিক ধ্যানের উন্মেষ মাত্র পরিলক্ষিত হয়;

And listen till I do beget
That golden time again,
O blessed bird! the earth we pace,
Again appear to be
An unsubstantial, fairy place
That is a fit home for thee."

ওয়ার্ডসোয়ার্থের কোকিলে যে ভাবের উন্মেষ, চন্দ্রবাবুর কোকিলে সেই ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ; পূর্ব্বোক্ত স্বর্গীয় ভাবের—চরম সীমা। তাঁহার কোকিলের রবে প্রেম, জ্ঞান, ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া ফেলিতেছে। ভাগবতী ভক্তি, সারস্বতী শক্তি একত্র মিলিত; গঙ্গা যমুনার সঙ্গম, সেই দেবারাধ্য প্রয়াগ তীর্থ। প্রয়াগে নাকি মর লোচনের অগোচর, অন্তঃ-সলিলা সরস্বতী প্রবাহিতা আছে; যখন প্রয়াগে গিয়াছিলাম, চর্ম্মচক্ষে তা দেখিতে পাই নাই। চন্দ্রবাবুর কোকিলে সেই গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর একত্র মিলন—"একত্র মিলন—একতাত্মক, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশ"—দেখিতে পাইলাম।

বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে কেহ কেহ মোহন মুরলীর কোন্ রন্ধ্রের শব্দের কি গুণ তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন; একজন লিখিয়াছেন, শ্রীরাধিকা প্রেমের আবেশে গলিয়া মুরলী বদনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

কোন্ রন্ধ্রে কোন্ ধ্বনি কহ গুণমণি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা রবে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফোটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে ফোটয়ে কদম্ব প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু বহে এক কালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে॥

রাধিকা বাঁশরী-রবে মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, ঐ রবেই ময়ূরিণীর কেকা রবে নৃত্য; ঐ রবেই রসালে পারিজাত প্রস্ফোট; ঐ রবেই ষড়ঋতুর একত্র সমাবেশ।

সিদ্ধার্থ বিলাস ভবনে, ভোগ সুখে পরিবেষ্টিত হইয়া, বেণু বীণার রবে শুনিতে পাইতেন—

সর্ব্বভূত ক্ষয়-ধর্ম্মী; অনিত্য সংসার;
সুমহান্ কৃচ্ছ্র ভোগ প্রাণী সবাকার;
জরা ব্যাধি মৃত্যু দুঃখ—প্রদীপ্ত দহন
দহিছে রজনী দিনে অনাথ ভুবন।
মৃত্যু বশীভূত সবে হইবে বিলয়;
নদী ক্ষিপ্ত দারু মত মৃত্যু হরি লয়!

পুন আগমন নাই, পুন সংমিলন
নদী স্রোতে বহমান ফল পত্রগণ!
কামনা নটের নাট; নিশার স্বপন;
সলিল বুদ্বুদ মরীচিকা প্রদর্শন!

যে বেণু বীণা অঙ্গনা হস্তে যাইয়া স্থান বিশেষে মানুষকে নরকের দিকে টানিয়া লয়, সেই বেণু বীণার রবে, নর্ত্তকীর কাকলীতে সিদ্ধার্থ জন্ম-জরা-মৃত্যুর তরঙ্গে হৃদয়ে আহত হইলেন; তিনি শুনিতে পাইলেন, যেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধিসত্ত্বগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন ; —

বিপরীত রাগ দ্বেষে দহে ত্রিভুবন;
কৃপা মেঘ শীতলাম্বু কর বরিষণ;
স্বর্গের অমৃত দ্বার কর উন্মোচন;
রোধহ নিরয়; কর মুক্তি প্রদর্শন;
অবিদ্যা মোহ তামসে লিপ্ত ধরাতল;
নিরঞ্জন ধর্ম্ম চক্ষু দাও সুবিমল।

চন্দ্রবাবু কোকিলের রব পূর্ব্বোক্ত রূপ তন্ময়তার সহিত শ্রবণ করিয়াছেন! তাঁহার কোকিলের রবে ইহারই অনুবৃত্তি; শুধু অনুবৃত্তি নয়. এইরূপ কয়েকটী ভাবের মিশ্রণ; মিশ্রণে এক অভূত পূর্ব্ব অমিশ্র পদার্থের সৃষ্টি! "বসন্ত পৃথিবীর চরম বিকাশ; কোকিল-কণ্ঠে সেই চরম বিকাশ স্বরূপে পরিণত। কু—উ স্বরে ব্রহ্মাণ্ডের স্ফোট একত্রীভূত। কু—উ ধ্বনি স্ফোটের সঙ্গীতাত্মক প্রতিকৃতি। সৌন্দর্য্য সরলতা, বীরতা, দয়া, প্রেম. ভক্তি, জ্ঞান, কু উ স্বরে বিকশিত—কোকিল রবে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গীত।"

তার পর, আবার কোকিলের পঞ্চম।

এই সুন্দর হইতে সুন্দরতর, সুন্দরতর হইতে সুন্দরতম; বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, বৃহত্তর হইতে বৃহত্তম, বৃহত্তম হইতে অনন্ত; উন্নতি, উন্নতি উন্নতি, আরো উন্নতি; অনন্ত উন্নতি; এই মন্ত্রেই কোকিলের কু, কু—উ, কু—উ, কু—উ, কূ। এই ধারাবাহিক অনবচ্ছিন্ন উন্নতিই চন্দ্র বাবুর কোকিলের পঞ্চম।

অনেক দিন হইল হেমচন্দ্র কোকিলরবে প্রকৃতিকে নব কিসলয়ে সাজিতে দেখিয়া, অচেতম মলয়বাত, অচেতন কুসুম রেণুকে কোকিল কাকলী

শুনিয়া অধীর হইতে দেখিয়া, প্রবাহিণীকে কোকিলের ভাষে মাতিয়া, কল কল স্বরে সাগর পাশে ছুটিতে দেখিয়া—জড়কে চেতনের ভাষা বুঝিয়া সচেতন হইতে দেখিয়া—গাইয়া ছিলেন—

"বহে যদি সে তরঙ্গ কাহারও হৃদয়ে,
গাও হে তবে সে গীত শুনায়ে কর জীবিত
নিঃস্রোত বঙ্গের হৃদি স্রোতেতে ডুবাও!
রহস্য, রোদন, কিম্বা উৎসাহে ভাসাও।
কে আছে হে কবি কুলে গভীর হৃদয়,
গাও একবার শুনি জীবন সার্থক গুণি
অমনি মধুর স্বরে গভীর উচ্ছ্বাস
জুড়াবে এ গউড়ের প্রাণের হুতাশ।"

"গভীর হৃদয়" চন্দ্রবাবু কোকিলের "মধুর স্বরে" "গভীর উচ্ছ্বাসে" সেই রহস্য উৎসাহের গীত গাইয়াছেন; কোকিল রবে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশের একতানাত্মক সঙ্গীত চিত্রিত করিয়াছেন। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর একবার এই সঙ্গীত দেখা উচিত। দেখিয়া, শিখিয়া 'জীবন সার্থক" করা কর্ত্তব্য।

যম-যাত্রীদের সেতোগণের সভা।

এখন সকল রকমেই সুবিধা হইয়াছে ' পূর্ব্বে বিলাতে যাইতে হইলে ছয় মাস লাগিত, এখন একুশ দিনের বেশী লাগে না,—পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ হইতে গয়া কাশী যাইতে হইলে তিন মাস লাগিত, এখন দুই দিনেই যাওয়া যায়। এই অনুপাতানুসারে যমালয়ের পথও অনেক নিকট হইয়াছে। কিন্তু হৈম পথ, জলীয় পথ, তাড়িত পথ প্রভৃতি নূতন নূতন পথ হওয়াতে, " এলো পথের " যাত্রীর সংখ্যা মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, সেই পথের সনন্দ

প্রাপ্ত ইজারদারগণ কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন; বিশেষ, কালিঘাটের হালদারদিগের ন্যায় ইহাঁদের অংশীদারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে লাভের অংশ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তাই ইহাঁরা ধর্ম্মঘট করিয়া অপরাপর পথগুলি বন্দ করিবার এবং অপ্রাপ্ত-সনন্দ পাণ্ডাগণকে অনর্থক অংশ দান করিতে না হয়, তাহার চেষ্টায় আছেন।

ইতিমধ্যে ইজারদারগণ গুপ্ত সভা আহ্বান করেন। সকল সভ্য সভাস্থ হইলে একজন সভ্য এই প্রস্তাব করিলেন, যে আজ কাল গবর্ণমেন্ট যেরূপ ক্ষিপ্র হস্তে সনন্দ বিতরণ করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয় যে অতি অল্পকাল মধ্যেই যাত্রী অপেক্ষা সনন্দ প্রাপ্ত অংশীদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। আর গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উদার, তাহাতে সনন্দ বিতরণে বাধা জন্মাইবার আশাও দুরাশা মাত্র। বরং সেরূপ চেষ্টা করিলে গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হইবার সম্ভাবনা। অথচ অংশীদারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইলে "কুতের" ভাগ ক্রমশই হ্রস্ব হইয়া আসিবে; অতএব যাহাতে সকল দিক বজায় রাখিয়া পূর্ণ মাত্রায় যমযাত্রী পাওয়া যাইতে পারে, এরূপ একটী উপায় উদ্ভাবন করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এই কথা শুনিয়া সভ্যগণ "সাধু সাধু" উচ্চারণ করিয়া প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। অতঃপর আর একজন সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবকারীকে ধন্যবাদ প্রদান করত বলিলেন, বর্ত্তমান বিপদ দূরীকৃত করিবার একটী সুন্দর উপায় আমি উদ্ভাবন করিয়াছি, সভ্যগণের মনোনীত হইলেই কৃতার্থ হইব। উপায়টী এই যে অনেক যাত্রী আমাদের সাহায্যে একেবারেই যম-কবলে নিপতিত হয়; তাহাদের কাছে আমরা একবার বই "কুত" পাই না। আমরা আবহমান কাল যমরাজের সাহায্য করিয়া আসিতেছি, এই ক্ষণে তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যদি ক্ষুধা নিরোধ করেন, কোন লোককে কবলিত না করেন, অথচ প্রত্যেককে বৎসরে ৪।৫ বার তলপ করিয়া কাছে নিয়া ছাড়িয়া দেন, তবে আমরা, প্রত্যেক মানুষের নিকট প্রতিবারে যাইতে আসিতে দুইবার করিয়া বৎসরে ৮।১০ বার "কুত" পাইতে পারিব; আর যাত্রীগণ যমের কবলের-অগ্রাহ্য হইলে, আমাদের লাভের অঙ্ক অনন্তকালপর্য্যন্ত এমনই অসংখ্যরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। অতএব এই গুপ্ত সভা হইতে এই বিষয়ের জন্য যমরাজকে অনুরোধ করা হউক। এই প্রস্তাব শ্রবণান্তে সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আত্মহারা হইলেন এবং সজোরে করতালি দ্বারা গুপ্ত সভা ব্যক্ত করিলেন।

অনন্তর তৃতীয় ব্যক্তি সভ্যগণকে গম্ভীর ভাবে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আপনারা উল্লাসে মত্ত হইয়া অধীর হইবেন না। ধৈর্য্যাবলম্বন না করিলে উপস্থিত কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; তিনি দ্বিতীয় প্রস্তাবকারীকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন প্রস্তাবকারীর সারগর্ব্ভা বক্তৃতা তাঁহার অগাধ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে কিন্তু যমরাজের ক্ষুধা নিরোধ সম্বন্ধে আমার এই ব্যক্তব্য যে আমরা যখন যমরাজের এত উপকার করিয়াছি, তখন তিনি যে আমাদের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু, ক্ষুধা, স্বাভাবিক বৃত্তি, ইচ্ছা করিলেই ইহাকে নিরোধ করা যায় না; ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির হিতাহিত জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না; এ অবস্থায় যমরাজ আহার না করিয়া যে সহজে সুস্থ থাকিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। তবে আমাদিগকে ঔষধের সাহায্যে এরূপ করিতে হইবে, যাহাতে যমরাজের ক্ষুধাবৃত্তির উদ্রেক হইতে না পারে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে আজ পর্য্যন্তও এমন কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার সাহায্যে ক্ষুধা-বৃত্তিকে নির্ব্বাণ মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

এই কথা শুনিয়া চতুর্থ ব্যক্তি ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—কথার ভাবে বোধ হইতেছে আপনি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বিজ্ঞানের অসাধ্য কি কোন কাজ আছে? আমি এইক্ষণেই তিব্বতীয় কোন মহাত্মার নিকট অনুরোধ পত্র দিতেছি, সেই পত্র নিয়া যমরাজ, মহাত্মার নিকট গিয়া যদি কিছু দিন শিক্ষানবিশী করেন, তবে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে ক্ষুধাকে "নির্ব্বাণ" দেওয়া কতদূর সহজ। অবশ্য এ কথা আপনাদিগকে বলিয়া দিতেছি, মহাত্মার উপদেশে যমরাজ স্বীয় জিহ্বাকে কণ্ঠোর্দ্ধস্থ রন্ধ্রের মধ্য দিয়া ব্রহ্মতালুতে ঠেকাইতে পারিলে, আর তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকিবে না। অনন্তর আর একজন সভ্য উঠিয়া বলিলেন, এ বড় দুঃখের বিষয় যে আপনারা সকলেই "উপায়ের" চিন্তা করেন কিন্তু "অপায়ের" চিন্তা করেন না। ব্রহ্মতালুতে জিহ্বা ঠেকাইতে পারিলে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা রোধ হয়, তাহা যোগ শাস্ত্রের নিগূঢ় সত্য, সে কথা কেহই খণ্ডন করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ অবস্থায় মানুষের বহিরিন্দ্রিয় সকল কার্য্য না করিয়া জড়ভাব ধারণ করে। আমরাতো আর যমরাজকে যোগী করিতে বসি নাই। যমরাজের নির্ব্বাণ মুক্তি বা অনন্ত শক্তি লাভও আমাদের লক্ষ্য নহে। যমরাজের বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইলে

আর তিনি সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না সুতরাং কাহা-কেও তিনি তলপ করিবেন না। আর তলপ না করিলেই বা কে ইচ্ছা করিয়া যমপুরে যাইবে? এর ফল এই হইবে যে এখন তবু আমরা ভাগের ভাগ দুই দশজন পাইতেছি, যমপুরী যোগীরাজের আবাস হইলে, তাও যাইবে; আমাদিগকে অনশনে জীবন হারাইতে হইবে। অতএব জিহ্বা ব্রহ্মতালুতে ঠেকাইয়াও যমরাজ যাহাতে বহিরিন্দ্রিয়ের পরিচালন দ্বারা লোকের প্রতি আধিপত্য খাটাইতে পারেন, তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; তাহা হইলেই আমাদের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে। এই কথার পর, গুপ্ত সভা গুপ্ততররূপ ধারণ করিল, কাহারো মুখে আর কথা ফুটে না, সক-লেই নির্ব্বাক্।

কিয়ৎক্ষণ পরে, বিশালদেহ একজন সভ্য গম্ভীর ভাবে গাত্রো-থান করিয়া, সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তির মুখাবলোকন করত ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, সভ্যগণ আপনারা যে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি; নতুবা এ অধীনকে আজি আপনাদের সমক্ষে বাচালতা করিতে হইত না। আমি প্রস্তাব করিতেছি, যে যমরাজকে প্রত্যহ বাইট গ্রেন করিয়া কুইনাইন দেওয়া হৌক, তাঁহার ক্ষুধা অত্যন্ত মন্দা থাকিবে, অথচ তিনি গাত্র জ্বালায়, যাত্রীগণকে অনবরত তলপ তাগাদা করিতে থাকিবেন। এই কথায় সকলেই সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চট্‌কা ভাঙ্গিয়া উঠিলেন—এবং বলিলেন ইহাই সাধু পরামর্শ; তখন সেই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল; ও আনন্দে সভা ভঙ্গ হইল।

শুধুই রহস্য।

পরলোক গত ডাক্তার রামদাস সেন "ঐতিহাসিক রহস্য," 'রত্নরহস্য' লেখেন; ইহলোকস্থিত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবু 'বিজ্ঞান-রহস্য' 'লোক-রহস্য' লিখিয়াছেন। ঐহিক পারত্রিক বড় লোকেদের দেখাদেখি আমারও কিঞ্চিৎ

রহস্য লিখিতে সাধ হইয়াছে। কিন্তু গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত ; ইতিহাসে—আমার হাসি আসে ; রত্ন—আমি চিনিতে পারি না ; বিজ্ঞানে—অজ্ঞান ; লোক বুঝিবার আলোক আমাতে নাই। কাজেই, আমাকে শুধুই রহস্য লিখিতে হইল ; সুতরাং আপনাদিগকেও অগত্যা শুধুই রহস্য পড়িতে হইতেছে।

সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—বলি হাঁগা, শুধুই রহস্য কি লিখিব ?

সর্ব্বাগ্রে একালের ছাত্র বিস্মিত মুখে বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

রাগ অর্থ ভালবাসা, ঘৃণা অর্থ দয়া মায়া।

তখন একালের শিক্ষক গম্ভীর মুখে বলিলেন তা নয়,শুধুই রহস্য এই যে,—

যে লেখে সে শেখে না,
যে শেখে সে লেখে না।

একালের দরিদ্র বক্ষে হাত দিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল, শুধুই রহস্য এই যে,—

ক্ষুধায় যে ক্ষিপ্ত, শাকান্ন তাহার যোটে না।

ধনী উদরে হাত দিয়া তেমনই কাতর কণ্ঠে বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

প্রচুরে যে বিভোর মন্দাগ্নি তাহার ঘোচে না।

একালের সংবাদপত্র তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—

গরীবের তেলনুণের উপর বাটা চড়ানই রাজনীতি,

একালের রাজপুরুষেরা উত্তর চ্ছলে বলিলেন, আর শুধুই রহস্য এই যে,—

রাজার রাগ বাড়ানই প্রজানীতি।

একালের সাময়িক পত্র সকল দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—

বহুপরে যে মূল্য পাওয়া যায়, বা তাও যায় না—তাহার নাম অগ্রিম মুল্য ;—

একালের গ্রাহকেরা শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি রাগ করিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

সময়ে যাহা কখনই বাহির হয় না, তাহার নাম সাময়িক পত্র।

একালের আহেলেমামলা আদালতের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—

ইষ্টাম্পের যে ব্যবসা তাহার নাম ন্যায়রক্ষা।

আর পল্লীগ্রামের লোকে পোলিসকে দেখাইয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—

দুপর রাত্রিতে যে চীৎকার, তার নাম শান্তি রক্ষা।

নাইট সাহেব মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,

সব চেয়ে দুঃখী এই ভারত ভূভাগে,

সব চেয়ে বেশী বেশী বেতনাদি লাগে।

গিফিন্ হাত কামড়াইয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,

তোমরা— যার শীল, তার নোড়া,

তারই ভাঙ্গিবে দাঁতের গোড়া।

তখন সেকালের দিকে পশ্চাৎ দৃষ্টি করিলাম।

সেকালের শম্ভু খুড়ো হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—শুধুই রহস্য এই যে;—

মনের কথা খুলে বলিলেই বাতুল,

* চেপে রাখিলেই প্রতুল।

সেকালের আমলা মহাশয় ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

আমলাকে পয়সা দিয়া কাজ করাইলে—অপব্যয়;

উকীলকে মোহর দিয়া কথা কহাইলে—সদ্ব্যয়।

সেকালের শাশুড়ীরা কপালে হাত দিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

ডাকিলে, জামাই খায় না,

যাচিলে, জামাই পায় না।

সেকালের দিদী শাশুড়ীরা গালে হাত দিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

পোড়া দেশের দেখ কাপ,—

যা নইলে, পেট ভরে না, তারেই বলে, সক্‌ড়ি,

যা নইলে ঘর ভরে না, তারেই বলে পাপ।

সেকালের বঙ্গদর্শন আমার চক্ষে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

যুবকের ভিক্ষার নাম ডেলাফেলানি, যুবতীর ভিক্ষা শয্যাতোলানি,

গুরু পুরোহিতের—প্রণামি, জমীদার নায়েবের—সেলামি,

কিন্তু কেবল দরিদ্রের ভিক্ষাই লাঞ্ছনা রহিল।

সেকালের হুতোম পেঁচা সহরের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

এখানে খেঁদীপুতেরা—পদ্মলোচন,

আর পাষণ্ড ভণ্ড গুলা—ভাগবতভূষণ।

সেকালের সাধক রামপ্রসাদ গাহিতে গাহিতে বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

দুটা গজ দুটা অশ্ব স্থানে বসে' কাল কাটালো,

আর বড়ের ঘরে করে ভর মন্ত্রীটা বিপাকে মলো।

সেকালের মাতাল ঢলিতে ঢলিতে বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,

বিশবাঁও জলের নীচে ইলিশ ঠাকুরাণী, সে হলো গরম,

আর সূর্য্যি খূড়োর লেজে বাঁধা ঝাটার ফল,—ডাব—সে হলো ঠাণ্ডা।

সে কালের পক্ষী কবি আপশোষ করিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

ইংরাজ জাতি হল জ্ঞাতি, উপার্জ্জনের অংশ চায়।

সে কালের ভট্টাচার্য্য একটু হাসিয়া একটু কাঁদিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,

দাতায় দান করে,

হিংসকে হিংসায় মরে।

তখন সম্মুখ পশ্চাৎ শেষ করিয়া ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। শুনিলাম দৈব-ভারতী বলিতেছেন, ' বাছা একাল সে কালের এত কথা শুনিয়াও এখনও বুঝিলে না যে শুধুই রহস্য কি,—তবে শুন, সর্ব্বকালের শুধুই রহস্য এই যে,

যে জানে সে বলে না,

যে বলে, সে জানে না।

যারে চাই তারে পাই না,

যারে পাই তারে চাই না।

আরও রহস্য এই যে,—

লোকে, ডাঙ্গায় ভাসে, জলে চসে,
দাঁতে হাসে, ঠোঁটে ভাষে।

তখন ভারতীর ভাষায় শুধুই রহস্য শুনিয়া আমি গলবস্ত্রাঞ্চলে মায়ের চরণাঞ্চলে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম, বলিলাম—'আমি এইবার শুধুই রহস্য বুঝিয়াছি।' প্রশ্ন হইল, 'কি বুঝিলে?' আমি বলিলাম, 'সর্ব্বাপেক্ষা শুধুই রহস্য—'অদ্যকার এই প্রবন্ধ।' দেবীর হাস্যধ্বনি যেন শুনিতে পাইলাম—বলিলেন, 'তুমিই বাছা রহস্যবিৎ, 'যাও ছাপ।'

সুতরাং আমি ছাপিলাম।

মাক্‌বেথ্ ও হাম্‌লেট।

৩।

আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধে মাক্‌বেথ্‌কে রক্তাক্ত হস্তে দণ্ডায়মান রাখিয়া, হাম্‌লেট্ মাক্‌বেথ্ এই দুই খানি নাটকের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছি। আমরা কি ভাবে ঐ দুই খানি নাটকের সমালোচনে প্রবৃত্ত, তাহার অনেকটা আভাস দিয়াছি। এখন আবার মাক্‌বেথ নাটকের ক্রমানুসরণ করা যাউক।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের আরম্ভেই মাক্‌বেথ কর্ত্তৃক ডঙ্কান হত্যায় পাপের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তি; আত্মীয় হত্যা, বন্ধু হত্যা, প্রভু হত্যা, রাজ হত্যা, গুপ্ত হত্যা, সুপ্ত হত্যা, আশ্রিত হত্যা, অতিথি হত্যা—মাক্‌বেথ এই সকল পাতকের পাতকী।

মাক্‌বেথ রক্তাক্ত হস্তে পাপে প্রবৃত্তি-দাত্রী কর্ত্রীর সম্মুখে আসিয়া বলিল, 'আমি কার্য্য শেষ করিয়াছি, তুমি কিছু শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলে কি?'

মাক্‌বেথ গৃহিণী। আমি কেবল পেচকের চীৎকার ও পতঙ্গের ঝিল্লি রব শুনিয়াছি মাত্র।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, পিশাচী সুরা পান করিয়া পেচকের বিকট শব্দে আনন্দ করিতেছিল। আর কিছুই শুনে নাই; পেচক

ও পতঙ্গের বিকট রব শুনিয়াছে, তাহাতেই আনন্দ করিয়াছে। এখানেও সেই মূল কথা—

'মন্দকে সুন্দর।'

রাত্রি কালে কাল পেঁচার চীৎকার কেহই ভাল বাসে না—পাপীয়সীর তাহাতেই আনন্দ।

রাজা ডঙ্কানের শয়ন গৃহে দুই জন রক্ষক শুইয়াছিল। মাক্‌বেথ গৃহিণী তাহাদিগকে অতিরিক্ত সুরা সেবন করাইয়া একেবারে অজ্ঞান করিয়াছিলেন। মাক্‌বেথ বলিতেছেন 'ডঙ্কানের হত্যার পর, তাহাদের একজন ঘুমাইতে ঘুমাইতে হাসিয়া উঠিল, আর একজন বলিয়া উঠিল, 'হত্যাকাণ্ড।' আমি দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। তাহারা একত্র ভগবানের স্তবোচ্চারণ করিল, একজন বলিল, 'ভগবান আমাদের রক্ষা কর,' আর একজন বলিল,'কৃপা কর।' আমি মহা পাপী, ভগবানের কৃপার কাঙ্গাল, কিন্তু আমি ত বলিতে পারিলাম না, ভগবান আমায় কৃপা কর। কথাটা আমার গলায় আট্‌কাইয়া রহিল।'

যে দুঃখে পড়িয়া পাপে মগ্ন হইয়া দুঃখভঞ্জন ভগবানকে ডাকিতে পারে না, তাহার দুঃখের সীমা নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মাক্‌বেথ মহাপাপী বলিয়া মহা দুঃখী।

মাক্‌বেথের মহা কষ্ট দেখিয়া গৃহিণী অনেক সান্ত্বনা করিলেন। বলিলেন 'ও সকল কথা অত করিয়া ভাবিতে নাই—যাও একটু জল দিয়া তোমার হাত দুটি ধুয়ে ফেল গে, ও বীভৎস বমালগুলা আর রেখে কাজ কি?—তরবারি দুই খানি সঙ্গে আনিয়াছ কেন? যাও, ও দুখানা সেই নিদ্রিত রক্ষকদের নিকটেই রাখিয়া তাহাদের রক্ত মাখাইয়া এসো।' মাক্‌বেথ বলিলেন 'আমি আর যাব না। আমি যাহা করিয়াছি—তাহা ভাবিতেই পারিতেছি না, তা আবার দেখিতে পারিব কেন?' তখন মাক্‌বেথ গৃহিণী একটু ঘৃণার স্বরে, একটু স্পর্দ্ধার স্বরে বলিলেন—' তুমি বড় শিথিল-সঙ্কল্পের লোক; দাও আমাকে তরবারি দুখানা দাও—ঘুমন্ত আর মৃত, তারা ত চিত্রের পুত্তলি; ছবির ভূতে ত, ছেলেরাই ভয় করে—আমি রক্ষকদের রক্ত মাখাইয়া আসিতেছি; এই হত্যাকাণ্ডে তাদের দোষী করা চাই।' এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই কাল নিশীথিনীর নীরবতা নষ্ট করিয়া বহির্দ্বারে গুম্ গুম্ করিয়া বলে আঘাত হইতে লাগিল। সেই আঘাতের পর আঘাত মাক্‌বেথের বুকে

পড়িতে লাগিল। মাক্‌বেথ মনে করিতে লাগিল, যেন সমস্ত বহির্জগৎ কেবল ধারাবাহিক আঘাতে পরিণত হইয়াছে; আর তাহার সমস্ত অন্তর্জগৎ সজাগ হইয়া তাহার বক্ষে আসিয়াছে; সেই বহির্জগতে আর সেই অন্তর্জগতে ধারাবাহিক ঘাতপ্রতিঘাত হইতেছে—গুম্ গুম্ গুম্—দুম্ দুম্ দুম্। প্রকৃতি যেন এতক্ষণে দণ্ড প্রণেত্রীভাবে তাহার পাপ হৃদয়ের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিয়াছেন; সেই মহতী প্রকৃতির সহিত পাপের কুণ্ঠিত কুঞ্চিত প্রকৃতির প্রথমে ধীরে ধীরে, ক্রমে জোরে জোরে—সম্মিলন হইতেছে গুম্ গুম্ গুম্—দুম্ দুম্ দুম্।

সহ-পাপিনী পাপ-সঙ্গিনী তাঁহার গৃহিণী তখন পাপ লুকাইতে গিয়াছেন; আমায় একা ফেলিয়া গেলে—আমার বুকে আঘাত লাগিতেছে, শুনিতেছ না? কাহার কাছে লুকাইবে? বুঝিতেছ না—আমাদের কথা সকলেই জানিতে পারিয়াছে; ঐ দেখ জগৎশুদ্ধ এক হইয়া ঘা মারিতেছে—গুম্ গুম্ গুম্—দুম্ দুম্ দুম্।

মাক্‌বেথ মুখ ফুটিয়া ভাবিতেছেন,—

'কোথা হতে হতেছে আঘাত?
প্রতি শব্দে কেন মোরে করে ভয়াকুল!
কি বীভৎস হস্ত মোর! চক্ষে বিঁধে শূল;
বরুণের অম্বুরাশি পারিবে কি কভু
ধুইতে হস্তের রক্ত? না—এই হস্ত মম
সমগ্র সাগর বারি রঞ্জিবে কেবল,
নীল জল হ'বে রক্ত।

মাক্‌বেথ গৃহিণী ফিরিয়া আসিবার সময় শেষের কথাগুলি শুনিতে পাইলেন। বলিলেন—'তোমার মতন আমার হাতও রক্তে ভিজিয়াছে—কিন্তু তোমার মত অমন ভিজে হৃদয় আমার নয়।' বাহিরে আবার আঘাত হইতে লাগিল—গুম্ গুম্ গুম্। যে আঘাতে মাক্‌বেথকে স্তব্ধ আড়ষ্ট করিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার গৃহিণীকে চঞ্চল করিল। তিনি স্বামীকে বলিলেন,—'চল আমরা ঘরে যাই, হাত ধুইগে; আমাদের রাত্রিবাস পরিগে; হঠাৎ উঠিতে হইলে লোকে যেন কিছু মনে করিতে না পারে—অত ভাবনায় আত্মবিস্মৃত হইও না।' মাক্‌বেথ বলিলেন 'যে কার্য্য করিয়াছি তাহাতে আত্মবিস্মৃতিই—আমার পক্ষে পরম মঙ্গল।' তখনও আঘাত হইতেছে—মাক্‌বেথ যাইতে

যাইতে বলিলেন, 'খা মারিয়া আর তোমরা ডঙ্কানকে জাগাইতে পারিবে কি? তাত পারিবে না!'

দম্পতি নিষ্ক্রান্ত; দ্বিতীয় দৃশ্য সমাপ্ত।

এই দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষ ভাগের স্থূল কথা—পাপে মাক্‌বেথের বিহ্বলতা ও মাক্‌বেথ গৃহিণীর পাপ লুকাইবার জন্য আয়োজন, ও সতর্কতা, এবং স্বামীকে সাহস ও সান্ত্বনা দান। পাপিষ্ঠা নারী, স্বামীকে পাপের পরামর্শ গ্রহণে বিরত দেখিয়া 'তবে বুঝি আমাকে ভাল বাসে না' মনে করিয়া যেমন ভালবাসার ধূয়া ধরিয়া পুরুষকে পাপের পথে লইয়া যায়,—মাক্‌বেথ গৃহিণীর মত, চোক মুখ ঘুরাইয়া 'এই তোমার ভালবাসা' বলিয়া পুরুষের মাথামুণ্ড ঘুরাইয়া দেয়,—সেইরূপ পাপ-পরামর্শ মত কার্য্য হইলে, 'তবে ত আমায় বড়ই ভালবাসে' মনে করিয়া পাপ-ভারাবনত পুরুষকে উত্তোলিত করিবার চেষ্টা করে। পুরুষের কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে, পাপের ভাবনা ভাবিতে দেয় না; পুরুষের কাছে পুরুষত্বের গৌরব করিয়া তাহাকে খাড়া রাখিবার চেষ্টা করে।

মাক্‌বেথ গৃহিণী পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি প্রদানের সময় বলিয়াছিলেন 'তুমি নয় পুরুষ? তবে মনে যাহা হয়, কাজে তাহা করিতে পার না কেন?' তখন মনই প্রধান। কিন্তু সান্ত্বনা দিবার সময় বলিতেছেন 'ছি ও সব কথা কি আর মনে করিতে আছে?' এখন যেন মনে করাটাই মন্দ; মন কিছু নয়। তখনকার কথা—'তুমি নয় পুরুষ? তবে এমন কাজ করিতেছ না কেন?' এখনকার ভাষা 'তুমি পুরুষ, তবে অমন করিতেছ কেন?' এই রূপে দেখা যায় যে প্রবর্ত্তনা ও সান্ত্বনার উভয়ের ধূয়া পুরুষত্ব হইলেও রাগ রাগিণীতে কোমল তীব্র ভেদ হওয়ায়, সকাল সন্ধ্যার ভেদ হইয়াছে। আমরা স্থূল কথাগুলি বলিতেছি মাত্র, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেক্‌সপিয়রের দুই একটা কারচুপির কথা না বলিয়াও থাকা যায় না। এই সকল কারচুপির কাজ, চসমা চক্ষে দিয়া আধ ছায়ায়, আধ আলোকে, দেখিতে হয়, বুঝিতে হয়, আর আপনার মনে কারুকরের প্রশংসা করিতে হয়।

রাজা ডঙ্কান কেবল মাক্‌বেথের সম্মানবর্দ্ধনার্থ, তাঁহার গৃহিণীকে আপ্যায়িত করিবার জন্য, মাক্‌বেথের ভবনে উপযাচক হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি প্রত্যুষেই তাঁহার ওখান হইতে প্রস্থান করিবার কথা ছিল। মাকডফ্‌ ও লেনক্স নামে দুই জন ওমরাকে অতি প্রত্যুষেই আসিতে

বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারাই বহির্দ্বারে আঘাত করিতেছিলেন। প্রভুর আমোদ প্রমোদের জন্য বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া ভৃত্যকে ভোরে উঠিতে হইলে, সে মহা বিরক্ত হয়। মাক্‌বেথের দ্বাররক্ষকও এই গুম্‌গুম্‌নি শব্দে মহা বিরক্ত ভাবে শয্যা হইতে উঠিয়া ভাবিতে লাগিল, 'ছাই এমন রাত্রি-তেও একটু নিস্তার নাই, লোক আস্‌ছেই আস্‌ছেই—এ যে নরক হয়ে উঠ্‌লো—আমি ত দেখিতেছি নরকের দ্বারপাল।' বাস্তবিক মাক্‌বেথ-ভবন যে নরকের নরক হইয়াছে, তাহা বিরক্ত দ্বাররক্ষক ঘুমের ঘোরে, রূপকের জোরে, না বলিলেও আমরা বুঝিতে পারিয়াছি।

মাকডফ্‌ ও লেনক্স ভবনে প্রবেশ করিলে, একটু পরেই মাক্‌বেথের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হইল; রাজা কখন উঠিবেন, কখন যাবেন—এই সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। মাক্‌বেথ অতি অল্প কথায় কেবল উত্তর দিতে লাগিলেন। হৃদয়ে গুরুভার চাপিয়াছে—বেশী কথা কহিতে পারিবেন কেন?

মাক্‌ডফ্‌ রাজার শয়ন গৃহে অগ্রে প্রবেশ করিয়াছিল,—ছিন্নশিরা রাজ-দেহ দেখিয়া চীৎকারে বড়ুর সকলকে জাগরিত করিল। লেডি মাক্‌বেথ যেন সেই চীৎকারেই আসিলেন, বাঙ্কো আসিলেন। রাজকুমারদ্বয় মাল্‌-কোম্‌ ও ডনাল্‌বেন্‌ আসিলেন। মাক্‌বেথ্‌ ও লেনক্স রাজার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন—মাক্‌বেথ্‌ বলিলেন, 'লোক দুটাকে কাটিয়া ফেলিয়া আমি ভাল করি নাই।' মাকডফ্‌ বলিলেন, 'কাটিলে কেন?' তখন, আবার দুই জনকে হত্যা করাতে মাক্‌বেথের পাপাগ্নি ইন্ধন পাইয়াছে—মাক্‌বেথ্‌ পাপে অভ্যস্ত হইয়াছে; মাক্‌বেথ প্রথম হত্যাকাণ্ডের পর আপনার গৃহিণীর সম্মুখেই পাপের ভারে ম্রিয়মাণ ছিল, যখন মাকডফ্‌ ও লেনক্স আসিল, তখন ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে নাই; এখন হত্যার পর হত্যা করিয়া লেনক্সের সমক্ষে রাজরক্ষক-দ্বয়কে হত্যা করিয়া নরকের সাহস সঞ্চয় করিয়াছে! যখন মাক্‌ডফ্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন 'কাটিলে কেন?' তখন আবেগপূর্ণ ভাষায় প্রকৃত বাগ্মীর মত উত্তর করিলেন;—

Who can be wise amaz'd, temperate and furious,
Loyal and neutral in a moment? No man:

হঠাৎ বিস্মিত হলে, বিবেচনা শক্তি থাকে না, ক্রুদ্ধ হয়ে ধৈর্য্য রাখা

যায় না, রাজভক্ত হয়ে উদাসীন থাকিতে পারিলাম না—কেহই পারে না।

শুনিতে শুনিতে লেডি মাক্‌বেথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যে লেডি মাক্‌বেথ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি বক্ষস্থ শিশুকে ইচ্ছা করিলে আছাড় মারিয়া চূর্ণ করিতে পারেন, যে লেডি মাকবেথ স্বামীকে ধিকার দিয়া মহাপাপে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন, সেই পাষাণী পিশাচী স্বামী কর্ত্তৃক আবার হত্যার কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল! স্ত্রীচরিত্রের বৈচিত্র বুঝিলে কি?

স্ত্রী প্রকৃতি স্বভাবতই জলের ন্যায় তরল। শৈত্যাধিক্যে জল যেমন প্রস্তরবৎ কঠিন হয়, স্ত্রীলোকও কখন কখন তরল হৃদয়, সাহসে বাঁধিয়া, পাষাণবৎ করে। কিন্তু একটু আঁচ লাগিলেই বরফ যেমন গলিয়া যায়, স্ত্রীলোকের সাহসে বাঁধা বুকও তেমনই অল্পেতেই গলিয়া যায়।

রাজা রাত্রিতে অতিথি হইবেন, এই কথা শুনিয়া অবধি মাক্‌বেথ-গৃহিণী আপনাকে কঠোর প্রকৃতি করিবার জন্য দুঃসাহসে বুক বাঁধিবার জন্য, দানবী শক্তির আরাধনা করিতেছিল *। মাক্‌বেথ ডঙ্কানকে হত্যা করিবে, কিন্তু সুরাপান করিয়াছিল, লেডি মাক্‌বেথ। পৈশাচিকী আরাধনায়, পৈশাচ পানীয় সেবনে তবে গৃহিনী দুঃসাহসিকতার সহায়তায় বুক বাঁধিয়া ছিল। যাই শুনিল, যে স্বামীকে সে কাপুরুষ বলিয়া কিছু পূর্ব্বে ধিক্কার দিয়াছিল, সে সচ্ছন্দে দুইজন নির্দ্দোষ রক্ষককে হঠাৎ হত্যা করিয়াছে—এত যে বুকের বাঁধনি, সমস্ত যেন এক আঘাতে খুলিয়া গেল, এত যে জমাট, সব যেন গলিয়া গেল। আমাকে ধর ধর বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

---

* Come you spirits!
That tend on mortal thoughts, unsex me here,
And fill me from the crown to the toe topfull
Of direst cruelty; make thick my blood;
Stop up the access and passage to remorse,
That no compunctious visiting of nature
Shake my fell purpose, nor keep peace between
The effect and it! come to my woman's breasts
And take my milk for gall, you murth'ring minsters,
Whenever in your sightless substances
You wait on nature's mischief!

এই হত্যাকাণ্ড বিষয়ে কিং কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য কিছু পরে সকলে একত্র হইবেন, স্থির হইল। রাজকুমারদ্বয়ের মনে কিন্তু মহা সন্দেহ হইয়াছে; তাঁহারা একজন ইংলণ্ডে,ও আর একজন আয়র্লণ্ডে পলায়ন করা স্থির করিয়া তাহাই করিলেন। এইখানেই তৃতীয় দৃশ্য শেষ।

চতুর্থ দৃশ্যে বিষ্কম্ভক; ইহাতে অন্তর্ব্বর্ত্তী ঘটনা সকলের আভাস পাওয়া যায়। মাক্‌ডফ্ এরূপ আভাস দিতেছেন, যে রাজকুমারদ্বয় যখন হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের উপর সন্দেহ হয়; তাঁহারাই হয়ত রক্ষকদিগকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে দিয়া এই কাজ করাইয়াছেন।

কুমারদ্বয় রাজ্য ছাড়িয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের পরই মাক্‌বেথ উত্তরাধিকারী। সুতরাং স্কটলাণ্ডের রাজ্য তাঁহাকেই অর্শিয়াছে; মাক্‌বেথ স্কটলাণ্ডের রাজা এবং শীঘ্রই স্কোন নগরে তাঁহার অভিষেক হইবে বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। রস নামে একজন সম্ভ্রান্ত লোক, সেই অভিষেক দেখিতে যাইতেছেন; রাজকুমারদ্বয়ের উপর সন্দেহের কথা, মাক্‌বেথ রাজা হইবার কথা,—শুনিয়া একজন অশীতিপর বৃদ্ধ বলিল;—

God's benison go with you,and with these
That would make good of bad, and friends of foes!

ভগবান্ তোমাদিগকে রক্ষা করুন, আর যাহারা মন্দকে ভাল মনে করে, শত্রুকে মিত্র মনে করে, তাহাদিগকেও তিনি রক্ষা করুন।

প্রবীণ বিচক্ষণ বৃদ্ধের কথায় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হইল, আর নাটকের মূল ধুয়া মন্দকে সুন্দর ভাবা—আর একবার আমাদের মনে জাগরুক করিয়া দেওয়া হইল।

আমরা প্রথম অঙ্কের শেষে দেখিয়াছি, জ্বলন্ত বহ্নি মুখে পতঙ্গ পতনোন্মুখ হইয়াছে; দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সেই পতঙ্গ দগ্ধ হইতেছে; তাহার পক্ষপত্র সকল জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে, জ্বলন্ত শিখা লইয়া পতঙ্গ ফর্ ফর্ করিয়া উড়িতেছে—দহ্যমান, উড্ডীয়মান, ফর্‌ফরায়মান, দেদীপ্যমান, মহাপাপী মাক্‌বেথ—স্কটলাণ্ডের মহারাজা।

বৈশেষিক দর্শন।

(১) বৈশেষিক সূত্র—কণাদ মুনি প্রণীত; ১০ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, প্রত্যেক অধ্যায়ে ২ টী করিয়া আহ্নিক।

(২) পদার্থ-ধর্ম্ম-সংগ্রহ।

(৩) উপস্কার—শঙ্করমিশ্র প্রণীত।

(৪) বিবৃতি জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন প্রণীত।

(৫) বৈশেষিক দর্শনং মহামহোপাধ্যায় শ্রী চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার কৃত ভাষ্য সমেতং।

সকলেই জানেন, সংস্কৃতে ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা ও বৈশেষিক এই ছয়টি দর্শনই প্রাচীন এবং প্রধান. এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ, জৈন, রামানুজ প্রভৃতি অনেকগুলি নব্য দর্শনও আছে। ইহার মধ্যে বৈশেষিক দর্শন মহর্ষি কণাদ প্রণীত। কণাদের আর একটি নাম উলুক। "বিরুদ্ধাসিদ্ধ সন্দিগ্ধ মলিঙ্গং কাশ্যপোঽব্রবীৎ" এই বচনে বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা 'কাশ্যপ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কণাদের অন্য পরিচয় নাই; বৈশেষিক দর্শনের সময় নিরূপণ করাও অসাধ্য।

এই জগতে অনন্ত পদার্থ, জড়, চেতন, উদ্ভিদ, অনন্তরূপ। এই অনন্ত পদার্থরাশিকে এক একটি করিয়া জানিতে হইলে অনন্তকালেও জানা যাইতে পারে না, মনুষ্য জীবনের অল্প কালের ত কথাই নাই। এদিকে উহাদের জ্ঞান না হইলেও মনুষ্যের পুরুষার্থ লাভ হয় না। এই নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ সেই অনন্ত পদার্থসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সংক্ষেপে শিক্ষাদিবার নিমিত্ত দর্শন-শাস্ত্রগুলির সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনে সমুদয় পদার্থগুলি এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়। এই ছয়টিমাত্র পদার্থের নাম করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ বলেন এই ছয়টি ভাবাভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে মাত্র, এতদরিক্ত অভাব নামক এক স্বতন্ত্র পদার্থ যে সূত্রকারের অভিপ্রেত, সে বিষয় কোন সংশয় নাই, কারণ তিনি নিজে অনেক সময় অনেক সূত্রে অভাবশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। অভাব পদার্থ যে বৈশেষিক দর্শন সম্মত সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবে তাহার নামোল্লেখ না করিবার কারণ এইরূপ বোধ হয়। সূত্রকার পদার্থ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গ্রন্থ রচনা করেন নাই, মনুষ্যকে মোক্ষপথের পথিক করিবার নিমিত্তই তাঁহার প্রবৃত্তি এবং সেই জন্যই প্রকৃত গ্রন্থারম্ভ করিলেন—

ধর্ম্ম বিশেষ প্রসূতাৎ দ্রব্যগুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্॥

ধর্ম্মবলে বা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলে, উৎপন্ন যে তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, ও সমবায়--এই কয়টি পদার্থের সাধর্ম্ম্যের (অনুগত ধর্ম্মের) এবং বৈধর্ম্মের (বিরুদ্ধ ধর্ম্মের) যে জ্ঞান, তাহা হইলেই মোক্ষ পথের পথিক হওয়া যাইতে পারে। কোন ধর্ম্ম কোন পদার্থে আছে, কোন পদার্থেই বা নাই, ইহা ঠিক ঠিক জানিতে পারিলেই মোক্ষ হয় ইহাই তাৎপর্য্য।

এরূপ স্থলে অভাবের উল্লেখ না থাকিবারই সম্ভাবনা। বিশেষ বৈধর্ম্ম্য কথাটি যখন অভাবসংশ্লিষ্ট, তখন অভাব পদার্থ যে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে এ কথাও আমরা বলি না।

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কিরূপে মুক্তিলাভ হয় তাহা বিবৃতি-কার জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন মহাশয় এইরূপে বলিয়াছেন। পুণ্য বিশেষ বলে দ্রব্যাদি পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের প্রকৃতস্বরূপ জ্ঞান হয়; তাহার পর আত্মমনন, আত্মমননের পর নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলে ক্রমে ক্রমে মিথ্যাজ্ঞানাদির নাশ হইয়া মোক্ষ লাভ হয়। বৈশেষিকদিগের মতে মোক্ষ শব্দের অর্থ দুঃখ নিবৃত্তি। পদার্থ ধর্ম্মসংগ্রহকার ঐ দ্রব্যাদি পদার্থের সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য কাহাকে বলে, এইরূপ প্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, জীবাত্মা, পরমাত্মা এবং মন এই নয়টি দ্রব্য। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন এই সপ্তদশটী গুণকে কণাদ স্পষ্ট করিয়া সূত্র দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট এবং শব্দ এই সাতটি গুণ ও তাহার অভিপ্রেত, সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশটী গুণ।

উৎক্ষেপণ (ঊর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ,) অবক্ষেপণ (নীচের দিকে নিক্ষেপ,) আকুঞ্চন (জড় করা,) প্রসারণ (বিস্তার করা) এবং গমন (যাওয়া) এই পাঁচ প্রকার কর্ম্ম, (ক্রিয়া)। ভ্রমণ, রেচন, স্পন্দন, ঊর্দ্ধজ্বলন, তির্য্যক গমন প্রভৃতি ক্রিয়াসকল গমনেরই অনুগত সুতরাং পাঁচের অধিক কর্ম্ম (ক্রিয়া) নাই।

সামান্য দুই প্রকার, পর এবং অপর, তাহার মধ্যে দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম্ম এই

তিনেতে বর্ত্তমান সত্ত্বানামক সামান্য পর, অর্থাৎ অধিক পদাথে বর্ত্তমান। এবং কেবল দ্রব্যত্বাদি অপর, অর্থাৎ অল্প পদার্থে বর্ত্তমান।

বিশেষ—এক প্রকার ধর্ম্ম। সমবায় এক প্রকার সম্বন্ধ।

পদার্থ ধর্ম্মসংগ্রহকার এইরূপে ষট্ পদার্থের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ভেদ মাত্র জানিয়া পদার্থের স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় না, এই নিমিত্ত আমরা প্রথমে দ্রব্যাদির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইলাম।

দ্রব্য।—মহর্ষি কণাদ দ্রব্যের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন,—

ক্রিয়া গুণবৎ সমবায়ি কারণং দ্রব্যম্। ১। ১। ১৫॥

যাহা ক্রিয়া ও গুণের আশ্রয় এবং সমবায়ি কারণ তাহার নাম দ্রব্য। সমবায়ি কারণ শব্দে উপাদান বা প্রকৃতি। দ্রব্য কি তাহা আমরা প্রকৃতরূপে জানিতে বা বলিতে পারি না, তবে তাহার কতকগুলি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারি মাত্র; সে লক্ষণগুলি এই—ক্রিয়াযুক্ততা, গুণযুক্ততা এবং সমবায়ি কারণতা।

গুণ। মহর্ষি কণাদ গুণের লক্ষণ বলিতেছেন,—

দ্রব্যাশ্রয্য গুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণ লক্ষণম্। ১। ১ ১৬॥

যাহা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, স্বয়ং 'গুণ' শূন্য, যাহা কখন কোন গুণের আশ্রয় হয় না, এবং যাহা সংযোগ বিভাগ বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া কাহারও কারণ হয় না অর্থাৎ যাহা কর্ম্ম নয়, তাহার নাম গুণ।

কর্ম্ম। মহর্ষি কণাদ কর্ম্মের লক্ষণ বলিতেছেন,—

এক দ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষকারণমিতিকর্ম্ম লক্ষণম্। ১। ১। ১৭॥

যাহা একমাত্র দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, যাহা কোনরূপ গুণের আশ্রয় নয় এবং যাহা সংযোগ বিভাগ বিষয়ে নিরপেক্ষ কারণ, তাহার নাম কর্ম্ম বা ক্রিয়া।

এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডলে অনন্ত পদার্থরাশি অনন্তরূপ হইলেও বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাদিগের মধ্যে তিনটীমাত্র মৌলিক ভেদ লক্ষিত হয়। (১) কতকগুলি জগতের যাবৎ বস্তুর উপাদানস্বরূপ এবং ক্রিয়া ও

গুণের আশ্রয়। (২) ঐ সকল বস্তুর ধর্ম্ম, যেমন রূপ, পরিমাণ ইত্যাদি। (৩) ক্রিয়া গতি, বৃদ্ধি, উৎপত্তি, বেগ প্রভৃতি। জগতে যা কিছু পদার্থ আছে, সমুদায় এই তিনেরই অন্তর্গত। উহাদের মধ্যে প্রথমটির নাম দ্রব্য, দ্বিতীয়টির নাম গুণ, তৃতীয়টির নাম কর্ম্ম *।

বিবৃতিকার জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন।

"নিত্যত্বে সত্যনেক সমবেতত্বং সমানত্বং।" সামান্য একটি ধর্ম্ম যাহা নিত্য, অবিনাশী, ভূত ভবিষৎ বর্ত্তমান এই তিন কালেই বিদ্যমান এবং একেবারে অনেকে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে। যেমন গোত্ব, অশ্বত্ব, মনুষ্যত্ব, প্রভৃতি জাতি। জাতি নিত্য, কোন কালেই উহার ধ্বংশ নাই, এবং যুগপত্ অনেকেতে অবস্থান করে। সমুদয় গোরুতেই গোত্ব আছে, সমুদয় অশ্বতেই অশ্বত্ব থাকে, এইরূপ মনুষ্যত্ব সমুদয় মনুষ্যে বর্ত্তমান।

বৈশেষিকদিগের মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও তাহাদের অবান্তর ভেদেই এই জাতি অবস্থান করে। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্ম্মত্ব এবং পৃথিবীত্ব, জলত্ব, রূপত্ব এই সকল জাতি; জাতির আর জাতি নাই; কেন না জাতির জাতি তার জাতি এইরূপে অনবস্থা হয়, বরাবরই চলিতে থাকে, কোন ঠাঁই আর নাগাড় মরে না।

"জাতিমদ্ভিন্নত্বে সত্যেকমাত্র সমবেতত্বং বিশেষত্বম্।"

জাতিমদ্ভিন্ন হইয়া, অর্থাৎ দ্রব্য গুণ কর্ম্মে না হইয়া, একমাত্র সমবায় সম্বন্ধে যাহা অবস্থিত, তাহার নাম বিশেষ। এই বিশেষ পদার্থের জন্য বৈশেষিক দর্শন। এই বিশেষ ও একটী ধর্ম্ম,—একজাতীয় পরমাণুকে অন্য জাতীয় পরমাণু হইতে ভেদ করিবার নিমিত্তই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

কারিকাবলীতে সমবায়ের স্বরূপ অতি সুন্দররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

---

* তর্কালঙ্কার মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে বাস্তবিক ধরিতে হইলে এই তিনটীই মূল পদার্থ, অবশিষ্ট সামান্যাদি তিনটীকে ইহাদের মধ্যে কোন না কোনটির অন্তর্গত করা যাইতে পারে, অতএব উহারা অতিরিক্ত পদার্থ নয়।

অর্থাৎ অবয়ব অবয়বীতে, (সমুদয়ে ও অংশে) যে সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধে দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়া অবস্থান করে, এবং দ্রব্য গুণ ক্রিয়াতে জাতি যে সম্বন্ধে থাকে,— সেই সম্বন্ধের নাম সমবায়। এই সমবায় সম্বন্ধ সকল স্থলেই একরূপ ; ইহার আর ভেদ নাই *।

দ্রব্যের বিভাগ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে ; উহাদের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারটি দ্রব্য নিত্য (অবিনাশী) এবং অনিত্য (বিনাশী) এই দুই প্রকারই হয়। ইহারা পরমাণুরূপে নিত্য এবং তদ্ভিন্নরূপে অনিত্য। ইহাদের শেষ সূক্ষ্ম অংশ, যাহা হইতে আর অংশ নির্গত হয় না, তাহার নাম পরমাণু। পরমাণুসকল নিত্য এবং রূপবিশিষ্ট। অগ্নি সংযোগ দ্বারা পার্থিব পরমাণুর রূপান্তরও ঘটিয়া থাকে। অবশিষ্ট পাঁচটী দ্রব্য নিত্য, সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, তাহাদের ধ্বংশ নাই। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটী ভূত বলিয়া অভিহিত হয় ; আর পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায় ও মনঃ এই পাঁচটী মূর্ত্ত (আকারবিশিষ্ট) বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনিত্য পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুকে কার্য্য দ্রব্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক কার্য্য দ্রব্য—শরীর ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার। তাহার মধ্যে শরীর আবার দুই প্রকার : কতকগুলি যোনিজ ও কতকগুলি অযোনিজ।

পৃথিবী—গন্ধের সমবায়িকারণ দ্রব্যকে পৃথিবী বলে। গন্ধ পৃথিবীরই গুণ ; তবে জলাদিতে যে গন্ধের অনুভব হয়, তাহা কেবল উহাতে পার্থিবাংশ মিশ্রণ নিবন্ধন সংক্রান্ত হয় মাত্র। গন্ধ দুই প্রকার সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধ। গন্ধ ভিন্ন পৃথিবীতে রূপ, রস, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, (দূরত্ব) অপরত্ব (নিকটত্ব) গুরুত্ব, দ্রবত্ব, বেগ এবং স্থিতি এই সকল গুণও থাকে †।

---

* পদার্থধর্ম্মসংগ্রহকার বলেন—"অযুত সিদ্ধানা মাধার্য্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ" অর্থাৎ যে সকল বস্তু অমিশ্রণে সিদ্ধ অথচ পরস্পর আধার আধেয় ভাববিশিষ্ট, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের নাম সমবায়। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন ইহা আর কিছুই নয় পৃথক্ত্বের বিপরীত গুণ মাত্র। বিবেচনা করিলে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটিই গুণ বিশেষ সুতরাং তিনটীকে পৃথক পদার্থ না বলিয়া গুণশ্রেণীর অন্তর্গত করা যাইতে পারিত।

† সূত্রকার পৃথিবীর পরীক্ষা স্থলে কেবল রূপ, রস, গন্ধ, ও স্পর্শ এই

কষায়, মধুর, লবণ, কটু, তিক্ত, অম্ল এই ছয়টি রসই পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে অনুষ্ণ, অশীত এই দ্বিবিধ স্পর্শ অবস্থিত। পার্থিব শরীর চারি প্রকার,—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ। পার্থিব ইন্দ্রিয় ঘ্রাণ। আর বিষয়—দ্ব্যণুক হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত।

জল।—শুক্লরূপবিশিষ্ট দ্রব্যের নাম জল—জলের জলত্ব ধর্ম্ম জাতি। জলের শুক্লরূপই স্বাভাবিক, তবে কারণবশত অন্যপ্রকার রূপও ঘটিতে পারে; যেমন যমুনার জলের কাল রূপ। জলের মধুর রস স্বাভাবিক বিশেষ কারণাধীন ইহাতে অন্যপ্রকার রসও অনুভূত হয়। জলের নিজ স্পর্শ শীতল তবে অগ্নি প্রভৃতির সংযোগে অন্যরূপ স্পর্শও অনুভূত হয়, বটে তাহা কৃত্রিম মাত্র। স্বভাবতই জলের দ্রবত্ব গুণ। এতদ্ভিন্ন সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, স্নেহ এবং বেগ এ সকল গুণও জলে অবস্থান করে। জলীয় শরীর অযোনিজ বরুণ লোকে প্রসিদ্ধ; ইন্দ্রিয়;—রসনা, এবং বিষয় হিমকণা হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত।

তেজঃ—উষ্ণ স্পর্শ বিশিষ্ট দ্রব্যের নাম তেজঃ। চন্দ্রকিরণ তেজঃ পদার্থ বটে কিন্তু উহাতে জলের সংশ্লেষ হেতু উহার স্বাভাবিক উষ্ণ স্পর্শ অনুভূত হয় না। এইরূপ মরকত সুবর্ণ প্রভৃতি তৈজস পদার্থে মৃত্তিকার

চারটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। উপস্কার রচয়িতা শঙ্করমিশ্র বলেন পৃথিবীতে নীল, পীতাদি অনেক প্রকার রূপ আছে। বিবৃতিকার জয়নারায়ণ বলেন নীল, শুক্ল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ এবং চিত্র এই সাত প্রকার রূপই পৃথিবীতে থাকে। ভাষ্যকার তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন কৃষ্ণরূপই স্বাভাবিক। তাঁহার কথায় আগন্তুক কারণবশত পৃথিবীর অন্যপ্রকার রূপ হইলেও হইতে পারে এইরূপ বুঝাইতেছে বটে, কিন্তু কৃষ্ণরূপ যে স্বাভাবিক এই কথা প্রমাণ-সাপেক্ষ; সেই প্রমাণটুকু দর্শিত না হওয়ায় গোলযোগ বাধিয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন পৃথিবীর কৃষ্ণরূপই স্বাভাবিক। তাহার পরই বলিতেছেন গন্ধই পৃথিবীর নিজ গুণ, রূপাদি কারণ গুণক্রমে উৎপন্ন। সুতরাং কথাটা শুনিলেই মনে যেন একটা ধাঁদা লাগে। ফল তিনি ভাষ্য করিতেছেন বলিয়া সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করা উচিত হয় নাই। এ সকল কথা একটু খুলে না লিখিলে, আমাদের মত মূর্খ লোকে বুঝে কিরূপে?

সংমিশ্রণ নিবন্ধন, উহাতে স্পর্শের উষ্ণতা অনুভূত হয় না। উপরিউক্ত উষ্ণ স্পর্শ ভিন্ন তেজে রূপ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব এবং বেগ এই সকল গুণও লক্ষিত হয়। তেজের স্বাভাবিক রূপ ভাস্বর শুক্ল অর্থাৎ চক্‌চকে শাদা, তবে অগ্নিতে বা সুবর্ণাদি তৈজস পদার্থে, পার্থিব রূপের সম্মিশ্রণ থাকায় উহা লক্ষিত হয় না। তেজে যে দ্রবত্বের (ঢল ঢলে ভাবের) কথা বলা হইয়াছে, উহা নৈমিত্তিক, এবং সুবর্ণাদি তৈজস পদার্থ মাত্রে বর্ত্তমান হয়। কার্য্যরূপ তেজও—শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয় ভেদে তিন প্রকার; তৈজস অযোনিজ শরীর সূর্য্যালোকাদিতে প্রসিদ্ধ; তৈজস ইন্দ্রিয় চক্ষুঃ; এবং বিষয়—বহ্নি ও সুবর্ণাদি। অত্যন্ত অগ্নি সংযোগেও সুবর্ণাদির ঢল ঢলে ভাব একবারে শুকাইয়া যায় না দেখিয়া উহাদিগকে প্রাচীন পণ্ডিতগণ তৈজস পদার্থ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

বায়ু— বায়ু এক প্রকার দ্রব্য উহারও স্পর্শ গুণ স্বাভাবিক, কিন্তু সে স্পর্শ অনুষ্ণ বা অশীত নয়। উক্ত স্পর্শ ভিন্ন বায়ুতে সংখ্যা, পরিমিতি পৃথক্ত্ব সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব এবং বেগ এই আটটি গুণও থাকে। প্রাচীনেরা বলেন বায়ুতে উদ্ভূত রূপ না থাকায় উহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না বটে কিন্তু উদ্ভূত স্পর্শ থাকায় ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়। এবিষয়ে কণাদমুনি কি বলেন দেখা যাউক—

মহর্ষি কণাদ প্রথমে প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ নির্দ্দেশ করিলেন—

মহত্যনেকদ্রব্যবত্ত্বাৎ রূপাচ্চোপলব্ধিঃ। ৪। ১। ৫।

এই সূত্রের প্রাচীন সম্মত অর্থ—

উপলব্ধি শব্দের অর্থ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ; এই প্রত্যক্ষ মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট বস্তুরই হইয়া থাকে; পরমাণুর মহত্ব না থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না? যদি বল বায়ু প্রভৃতির ত মহৎ পরিমাণ আছে, তাহার কেন প্রত্যক্ষ হয় না? ইহার উত্তর এই যে, সূত্রে এই জন্যই রূপাৎ এই কথা বলিয়াছেন; রূপাৎ শব্দের অর্থ রূপ থাকা চাই। কেবল মহৎপরিমাণ থাকিলেই যে বস্তুর উপলব্ধি হইবে, তাহা নয়, উহাতে রূপ থাকা আবশ্যক। অতএব বায়ু প্রভৃতির পরিমাণের মহত্ত্ব থাকিলেও, রূপ না থাকায় প্রত্যক্ষ হয় না।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল যে স্পর্শ এবং রূপ—দ্রব্যে একরূপই সম্বন্ধে থাকে, এক্ষণে দেখ বায়ুতে যখন স্পর্শ আছে, তখন রূপ থাকিবার যোগ্য

সম্বন্ধ ও আছে; একটা নিয়ম আছে যেখানে সম্বন্ধ আছে সেইখানে সম্বন্ধীও আছে; অতএব বায়ুতে রূপ থাকা হেতু বায়ুর উপলব্ধি হওয়া উচিত। ইহার উত্তরে মহর্ষি কণাদ বক্ষ্যমাণ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

সত্যপি দ্রব্যত্বে মহত্ত্বে রূপ সংস্কারা ভাবাদ্বায়ো রনুপলব্ধিঃ॥ ৪।১।৭।

বায়ু মহৎপরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্য হইলেও উহাতে রূপ সংস্কার না থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না। এই সূত্রের তাৎপর্য্য কেবল সংস্কার পদের অর্থের উপর নির্ভর করিতেছে। শঙ্কর মিশ্র বলেন—"সংস্কার পদেন রূপ সমবায়ো রূপোদ্ভবো রূপানভিভবশ্চ বিবক্ষিতঃ।" সংস্কার শব্দের অর্থ রূপ নিরূপিত সমবায় বা রূপের উৎপত্তি, অথবা অন্য রূপ দ্বারা অনাবরণ। এই কথা বলিয়া তিনি আবার বলিতেছেন যে, যদ্যপি বায়ুতে যে স্পর্শ সমবায় তাহা রূপ সমবায়ের সহিত এক হইলেও উহাতে রূপ নিরূপিতত্ব নাই; কারণ বায়ুতে রূপের অত্যন্তাভাবই দেখা যায়; এইরূপ চক্ষুর রশ্মিতে রূপের উদ্ভব নাই এবং মধ্যাহ্নকালীন উল্কাপাতে অন্য রূপের অনাবরণ নাই বলিয়া উহাদের প্রত্যক্ষ হয় না। তাহলে শঙ্কর মিশ্রের মতে রূপ সংস্কারের অর্থ তিন প্রকার দেখা গেল; উহাদের মধ্যে যে কোন একটির অভাব থাকিলে আর প্রত্যক্ষ হয় না।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন বলেন "রূপসংস্কারঃ সংস্কৃতং রূপং উদ্ভূতানাভিভূতরূপমিতি যাবৎ। তদভাবাৎ তাদৃশ রূপত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বাভাবাৎ।" রূপ সংস্কার বলিতে সংস্কৃত রূপ অর্থাৎ কোন প্রত্যক্ষ যোগ্য অথচ, অনভিভূত রূপ; তার অভাব হেতুক অর্থাৎ তাদৃশ রূপের অধিকরণ না হওয়ায় বায়ুর রূপের উপলব্ধি হয় না; যদি বল যেখানে সম্বন্ধ থাকে সম্বন্ধীও সেই স্থলে থাকে,—এই নিয়মে বায়ুতে রূপ কেন না থাকে? এই আশঙ্কা করিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলেন যে এ কথা বলিতে পার না; বায়ুতে রূপ নাই ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ রূপের অভাবই ঐ নিয়মের বিরোধী। যেখানে এরূপ কোন বাধক নাই বরঞ্চ কোনরূপ সাধক থাকে, সেইখানেই —যেখানে সম্বন্ধ সেইখানে সম্বন্ধী—এই নিয়মের প্রবৃত্তি জানিবে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় পরসূত্রের সহিত স্বমতের মিল রাখিবার জন্য ৪।১।৫ *

---

* দ্রব্যের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল আমরা কতকগুলি গুণের প্রত্যক্ষ করিয়া সেই সকলের আশ্রয় দ্রব্যের জ্ঞান লাভ করি;—এই

সূত্রস্থিত রূপ শব্দের অর্থ—রূপ-সংস্কার করিয়াছেন। তাহার পর ৪।১।৬ সূত্রের অর্থ করিলেন বায়ুতে রূপ আছে বটে কিন্তু সে রূপের সংস্কার না থাকায় তাহার উপলব্ধি হয় না। তাঁহার এই সংস্কার কথাটিই মহা গোল বাধাইয়াছে; কারণ সংস্কার জিনিসটা যে কি,তাহা তিনি স্বয়ং কিছুই ভাঙ্গিয়া দেন নাই; কাযেই রূপের সংস্কার স্বতঃসিদ্ধ অথবা নিমিত্তাধীন এবং কিরূপ সংস্কার হইলেই বা প্রত্যক্ষ হয়, এই সকল ভাল করিয়া বুঝান নাই।

বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু তাই বলে বায়ুতে যে রূপ নাই ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ খোলা হাঁড়ীর উত্তাপ, গ্রীষ্মের উষ্ম, চক্ষুর আলোক,—ইহাদের রূপ আছে, অথচ উহাদের প্রত্যক্ষ হয় না। তবে বায়ুর রূপ নাই শুধু এই কথা মাত্রে যদি বায়ুর রূপ না থাকে, তা হলে আর কথা নাই। যদি বল পুরাণাদিতে আকাশ হইতে বায়ু এবং বায়ু হইতে তেজ এইরূপ সৃষ্টি ক্রম কথিত হই-য়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে বায়ুর উপাদান আকাশ তাহাতে রূপ না থাকায় বায়ুতে রূপ হইবে কোথা হইতে? ইহার উত্তরে আমরা বলিব তেজে যে রূপ আছে ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য; কিন্তু তেজের উপাদান বায়ু বায়ুতে রূপ না থাকিলে তেজে রূপ আসিবে কোথা হইতে? অতএব যদি উপাদান অনুসারে বস্তুর গুণ নির্দ্দেশ করিতে হয় তবে বায়ু যে একেবারে রূপ শূন্য এ কথা বলা যাইতে পারে না।

শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়ভেদে ঐ বায়ু আবার তিন প্রকার; বায়বীয় শরীর অযোনিজ পিশাচাদির দেহ; ইন্দ্রিয়—সর্ব্ব শরীর ব্যাপি ত্বক্; এবং বিষয় প্রাণ অপানাদি হইতে মহা প্রলয়কারী ঝড় অবধি।

আকাশ—শব্দের সমবায়ি কারণ অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে শব্দের আশ্রয়ের নাম আকাশ। যদি বল আকাশনামক একটী স্বতন্ত্র দ্রব্য স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? বায়ুকেইত সমবায় সম্বন্ধে শব্দের আশ্রয় বলিলে হয়, ইহার উত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন,এ কথা বলিতে পার না; কারণ বায়ুর

আধুনিক মতের খণ্ডন করিতে তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে যদি কেবল গুণ মাত্রের প্রত্যক্ষ হইত, তাহলে আমাদের জল ও স্থলের মধ্যে প্রভেদ জ্ঞান হইত না, স্থলে জলের কার্য্য এবং জলে স্থলের কার্য্য করিতে হয়ত আমরা প্রবৃত্ত হইতাম।

বিশেষ গুণ স্পর্শ—যাবদ্দ্রব্য স্থায়ী (যতক্ষণ আশ্রয় দ্রব্য বর্ত্তমান হয়, ততক্ষণ অবস্থান করে); শব্দ সেরূপ নয়, অল্পক্ষণেই নাশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং উহাকে বায়ুর বিশেষ গুণ বলিতে পার না; এই নিমিত্ত শব্দের আশ্রয় বলিয়া আকাশ নামক একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য স্বীকার করিতে হইবে *। আকাশে ছয়টি গুণ থাকে; শব্দ এবং সংখ্যাদি পাঁচ। আকাশ এক হইলেও কর্ণকুহর প্রভৃতি উপাধিভেদে নানা প্রকার। আকাশের ইন্দ্রিয়—কর্ণ।

কাল বা সময়—বড়, ছোট ইত্যাদি বুদ্ধির হেতু, ইহা নিত্য এবং এক অর্থাৎ সজাতীয় রহিত। কাল এক হইলেও ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, প্রহর আদি উপাধি ভেদে নানা রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কাল কালিক সম্বন্ধে সমুদয় জগতের আশ্রয়, এবং সমুদয় জন্য বস্তুর প্রতি নিমিত্ত কারণ। "কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং সকালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" ইত্যাদি পুরাণ বাক্যই কালের সত্তা বিষয়ে প্রমাণ।

দিক্—দূর এবং নিকট ইত্যাদি ব্যবহারের হেতুই দিক্; কালের মত

---

* আকাশ একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য ইহা স্বীকার করাইবার নিমিত্ত বিবৃতিকার নিম্নলিখিত অনুমান পরম্পরা দেখাইয়াছেন। (১) শব্দ একটি বিশেষ গুণ (কোন এক বিশেষ দ্রব্যাশ্রিত গুণ) কারণ ইহা চক্ষুর গ্রাহ্য নয় অথচ বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য; যাহা চক্ষুর গ্রাহ্য না হইয়া বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় তাহাকেই বিশেষ গুণ বলে যেমন স্পর্শ; তাহার পর (২) শব্দ যখন গুণ, তখন উহা সমবায় সম্বন্ধে কোন দ্রব্যে অবশ্যই বর্ত্তমান হইবে; কারণ গুণ মাত্রেই দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিবে। এক্ষণে শব্দ কোন্ দ্রব্যের বিশেষ গুণ? ইহা ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ুর বিশেষ গুণ হইতে পারে না; কারণ ইহা অপাকজ (অগ্নি সংযোগাদি জন্য পরিণাম জাত নয়) অকারণ-গুণ-পূর্ব্বক (কারণ=উপাদান তাহার গুণের অনুযায়ী নয়) এবং প্রত্যক্ষ; ক্ষিতি জল, তেজঃ, বায়ুর বিশেষ গুণ ইহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহারা পাকজ, উপাদান গুণানুসারী। তাহার পর শব্দ যখন বিশেষ গুণ তখন উহা দিক, কাল, বা মনের গুণ হইতে পারে না; কারণ দিক্, কাল ও মনে কোন বিশেষ গুণ থাকে না, এবং ইহা যখন বহিরিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ তখন আত্মার বিশেষ গুণ হইতে পারে না; কাজেই শব্দের আশ্রয় একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সেই স্বতন্ত্র দ্রব্যের নামই আকাশ।

দিক্ নিত্য ও এক। দিক্ এক হইলেও পূর্ব্ব পশ্চিম ইত্যাদি উপাধি ভেদে নানারূপে প্রতীত হয়; যাহার যে দিকে সূর্য্য উদিত হয় সেই তাহার পূর্ব্বদিক, এবং যেদিকে সূর্য্যের অস্ত হয়, উহা পশ্চিম দিক্; পূর্ব্বাভিমুখ দাঁড়াইলে বাম হাতের দিকের নাম উত্তর এবং দক্ষিণ হাতের দিকের নাম দক্ষিণ। বোধ হয় দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণদিকের নামের মধ্যে পরস্পর এইরূপ কোন কার্য্যকারণতা থাকিবে। দিকে সংখ্যা আদি পাঁচটি গুণ অবস্থান করে। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন কাল, দিক্ এবং আকাশ এই তিনটি একই পদার্থ কেবল কার্য্যভেদে ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। এ একটা নূতন কথা বটে একটু স্পষ্ট করে বুঝাইলে ভাল হইত।

আত্মা—আত্মা দুই প্রকার জীবাত্মা এবং পরমাত্মা; এই উভয়বিধ আত্মাই চৈতন্যের আশ্রয়। ইহার মধ্যে জীবাত্মাকে সংসারী বলিয়া অভিহিত করে। ছেদনাদির সাধক কুঠারাদি যেমন কর্ত্তা ভিন্ন কোন কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ জ্ঞানের সাধক চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও কর্ত্তা ভিন্ন কিরূপে ফল নিষ্পাদনে সক্ষম হইবে? এই নিমিত্ত দেহের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মা নামক একটি অতিরিক্ত পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেহ কেহ বলিয়াছিল দেহাতিরিক্ত আত্মার কল্পনা করিবার আবশ্যক নাই; এই দেহই চৈতন্যের আশ্রয় এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে নিজ ব্যাপারে প্রেরণ করিয়া থাকে। বৈশেষিকেরা বলেন তাহা হইতে পারে না; যদি দেহই আত্মা হইত, তাহলে বাল্যকালে অনুভূত বস্তুর বৃদ্ধাবস্থায় স্মরণ হইত না; কারণ বাল্যকালের দেহ এবং বৃদ্ধকালের দেহ দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, কেননা পরিমাণ ভেদে যে দ্রব্যসকল ভিন্ন হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে দেখ বাল্যকালের দেহ এবং বৃদ্ধকালের দেহ যদি ভিন্ন হইল তবে একের অনুভূত পদার্থ অপরে কিরূপে স্মরণ করিবে? রামের অনুভূত বস্তুর কি গোপাল স্মরণ করিতে পারে? যদি বল বাল্যকালের দেহ এবং বৃদ্ধকালের দেহ ভিন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে; বাল্যকালের দেহকে বৃদ্ধকালের দেহের কারণ বলা যাইতে পারে, অতএব কারণের অনুভূত বস্তু কার্য্য স্মরণ করুক না কেন? ইহাও যুক্তিসিদ্ধ নয়, তাহলে মায়ের অনুভূত পূর্ব্ব বস্তু পুত্রে স্মরণ করিতে সক্ষম হইত। আরও দেখ শরীরের চৈতন্য হইলে, সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপানে এবং অর্দ্ধ প্রসূত বানর শিশুর সন্নিহিত শাখা অবলম্বনে প্রবৃত্তি হইত না, কারণ তৎকালে ঐ সকল

কার্য্য যে আপনার হিতকর এরূপ বুদ্ধি হওয়াই অসম্ভব ; কিন্তু আমাদের মতে পূর্ব্বজন্মে অনুভূত ইষ্টসাধনতার তখনই স্মরণ হওয়ায়,তাহারা ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যদি বল পূর্ব্বজন্মানুভূতের স্মরণ হওয়া যদি সম্ভব হয়, তবে পূর্ব্বজন্মেত আরও কত বস্তুর অনুভব হয়, তাহাদের স্মরণ হয় না কেন ? ইহার উত্তর এই যে সেরূপ স্মরণ হওয়ার প্রতি কোনরূপ উদ্বোধক কারণ উপস্থিত হয় না।

পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করায় বৈশেষিকদিগের মতে সংসার যে অনাদি তাহা এক প্রকার সিদ্ধ হইল এবং সংসারের অনাদিত্ব সিদ্ধির সঙ্গে আত্মাও যে অনাদি তাহাও সিদ্ধ হইল এবং সেই অনাদি ভাবের নাশ না হওয়ায় আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল ; যদি বল দেহও আত্মা ভিন্ন হউক, মন এবং আত্মা কেন এক হউক না ? মন হইতে স্বতন্ত্র আত্মা মানিবার আবশ্যকতা কি ? ইহার উত্তরে বৈশেষিকাচার্য্যগণ বলেন,—মন, অতি সূক্ষ্ম পদার্থ ; উহার জ্ঞানাদি স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষই অসম্ভব হইয়া পড়ে; কারণ প্রত্যক্ষে আশ্রয়ের (যাহার প্রত্যক্ষ হয় তাহার) মহত্ত্বই কারণ ; মন সূক্ষ্ম হওয়ায় কোনরূপ প্রত্যক্ষের আশ্রয় হইতে পারে না *। এই সকল কারণে দেহ ও মন

---

* চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়, শরীর ও মনের চৈতন্যাভাবের প্রতি নিম্নলিখিত যুক্তি কয়টি দেখাইয়াছেন,—শরীরে চৈতন্য নাই, কারণ শরীরের কারণ পরমাণুতে চৈতন্য থাকার কোন প্রমাণ নাই। আরও দেখ পার্থিব বস্তুর গুণ সকল উপাদান কারণের গুণ অনুসারেই উৎপন্ন হয়, কোন কোন শরীরে জ্ঞান থাকিতে দেখা যায়, কোন কোন শরীরে জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাবই দেখা যায় ; অতএব শরীরের চৈতন্য স্বীকার করিতে হইলে এরূপ বৈষম্যের প্রতি একটা বিশেষ হেতুর নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আরও দেখ শরীরের গুণ রূপাদি প্রতি শরীরেই ভিন্ন প্রকার দেখা যায়, এবং শরীরের উপলব্ধির সহিতই তাহাদের উপলব্ধি হয় কিন্তু শরীরের সহিত জ্ঞানের উপ-লব্ধি হয় না। ইন্দ্রিয়দিগের চৈতন্য নিরাকরণের পক্ষে এই যুক্তি জানিবা। মনও আত্মার সহিত অভিন্ন হইতে পারে না, কারণ মন আত্মার সুখাদি অনুভবের করণ মাত্র, যাহা করণ, তাহা কখন কর্ত্তা হইতে পারে না। যেমন রূপাদি জ্ঞান সাধনের সহিত বর্ত্তমান এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার সাধন, সেইরূপ সুখাদি অনুভবেরও একটা সাধন আবশ্যক করে ; মনই তাহাদের সাধন।

হইতে ভিন্নরূপ একটি স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই কল্পনীয়। জীবাত্মা অনেক এবং প্রতি দেহে ভিন্নস্বরূপ ; পরমাত্মা একই; তিনিও আবার জীব-সকল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ *। উভয় আত্মাই পরম মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপক; কিন্তু বুদ্ধি আদি ছয়. সংখ্যা আদি পাঁচ, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম ভাবনা নামক সংস্কার—এই চতুর্দ্দশটি গুণ আত্মাতে বর্ত্তমান ; ঈশ্বরে কেবল আটটি গুণ অবস্থান করে সংখ্যাদি পাঁচটি, বুদ্ধি, ইচ্ছা,এবং যত্ন। ঈশ্বরস্থিত বুদ্ধি,ইচ্ছা এবং যত্ন নিত্য এবং সর্ব্ব বিষয় ব্যাপী। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি অনুমান এবং আগম উভয়বিধ প্রমাণই স্বীকৃত হইয়াছে। অনুমানের আকার—ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতি জগৎসৃষ্টি যখন কার্য্য, তখন তাহাদের অবশ্য একজন না একজন কর্ত্তা আছেন, কারণ কার্য্য মাত্রেরই কর্ত্তা থাকে; জগৎ সৃষ্টি কার্য্যের কর্ত্তা একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই হইতে পারে না। আগম "দাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ"।

মনঃ—সুখাদি জ্ঞানের সাধন। মনের অস্তিত্ব বিষয়ে বৈশেষিকেরা এইরূপ অনুমান করেন যে, আমাদের সকল প্রকার জন্য জ্ঞানেরই এক একটা করণ আছে; সুখাদির জ্ঞানও জন্য জ্ঞান; অতএব উহারও একটা না একটা করণ অবশ্য অঙ্গীকার্য্য; সেই করণকেই মন বলে। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগই বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ; কিন্তু মন পরমাণুতুল্য অতি সূক্ষ্ম; এককালে একের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইতে পারে না, এই জন্য এককালে একমাত্র ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানই হয়, কখন দুই ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান এককালে হয় না। মনের অবয়ব বা অংশ নাই এবং প্রতি শরীরে একএকটি স্বতন্ত্র মন অবস্থান করে।

---

* চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার বলেন—উপাধি ভেদেই আত্মার ভেদ লক্ষিত হয়; বস্তুগত্যা আত্মা একই। যদি বল আত্মা যদি একই, তবে ঐ একই আত্মার সুখ দুঃখাদি ভিন্নরূপ ভোগ সম্বলিত নানাবিধ দেহে অবস্থান কিরূপে সম্ভবপর? ইহার উত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন, ইহা বড় আশ্চর্য্য নয়; কারণ একই প্রদেশে কাল-ভেদে,এবং একই কালে দেশ ভেদে,নানারূপ দেহ ধারণ করা—আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়।

উচ্ছ্বাস।

অশান্ত অবোধ মন ! ঘোর অন্ধকারে বসি,
কত কাল র'বি আর নিঝুম হইয়া ?
বুকের ভিতরে তোর, অন্ধকার স্তূপীভূত,
হইতেছে,—একবার দেখ নিরখিয়া।
পাপের সংসার সদা, টলমল করে পাপে,
প্রাণ ভরি পাপ তুই কেন নিস বুকে ?
আপনার মর্ম্ম স্থলে, আপনি বিন্ধিয়া ছুরী,
সহিষ্ণুর পরিচয় কেন দিস মুখে ?
হৃদয়েতে বল নাই, দুবলী হয়েছ বড়
শান্তিহারা এখন(ই) যে হবি তুই মন।
নিরাশা বুকেতে বসি দেখাইছে ভয় তোরে,
নিরাশার ভয়ে তোর অশ্রু বরিষণ।
কেঁদে কেঁদে রুগ্ন মন বিকারে বিহ্বল হবে
যে টুকু চেতনা আছে, হবে বিচেতন।
তাই বলি এই বেলা স্থির ভাবে বসি ও রে
চৈতন্য মধুর মূর্ত্তি কর রে স্মরণ।
"নীরদ বিজলীমাখা আধা রাধা আধা শ্যাম
মাধুর্য্য রসের খনি উজ্জ্বল বদন।"
মন তুই কর বিলোকন।
হৃদয়েতে শক্তি হ'বে অন্ধকার পলাইবে,
হরি হরি বলি মন ডাক রে উল্লাসে।
বিথারিবে স্বর্গজ্যোতিঃ অন্ধকার পূর্ণ মনে ;
পূর্ণ হবে চিত্ত আহা পারিজাত বাসে।

(জগাই মাধাই আয় দুই ভাই,
কণ্ঠে কণ্ঠে বাঁধি হরি গুণ গাই,

প্রেমোন্মত্ত হ'য়ে নাচিয়া নাচিয়া,
নামের গরিমা গাহিয়া গাহিয়া,
প্রেমের মহিমা প্রচার করিয়া,
মাতোয়ারা করি প্রাণ।

ছুটে আয় হেথা জগাই মাধাই,
করতালি দিয়া হরি গুণ গাই,
তোদের সরস কণ্ঠ গীতি হায়!
করিলে শ্রবণ আবার ধরায়,
জগত মাতাতে আসিবে নিমাই,
এই বেলা আয় সবে মিলে গাই—
পাতকী মোচন গান;

বাজাইয়া খোল, বল হরি বোল,
নিমাই আসিয়া দিবে সবে কোল;
কে আছিস আয় উচ্চ কণ্ঠে গাই,
হরি গুণ গান দিবা নিশি ভাই!
দুনয়ন দিয়া প্রেমের নিঝর,
ঝর ঝর করি ব'বে নিরন্তর,
হৃদয় আঁধার পলায়ে যাবে,
নব বল মন আপনি পাবে,
মলয় পবন প্রাণেতে ব'বে।।

ধর ধর ধর তান
গাও তবে মন গান।
দুঃখেরই আগার,
তাপিত সংসার,
বারেক ভুলিয়া যা,
মুখে হরি গুণ গা,
মনে হরি গুণ গা,
মনে প্রাণে আহা এক করিয়া
বল তোরা ঐ রা।।

প্রিয় মন রে আমার!
র'বি কত কাল পাপে ডুবে আর?
কিসের সংসার? কাহার সংসার?
পাপের সংসার, পাপের আধার।
থাকিস্ আবদ্ধ কেন?
কেন রে উন্মাদ হেন?
নিজের মঙ্গল বারেক মনটি, কর কর বিলোকন।
আপন বলিয়ে, যাহার নিকট
ক্রীতদাস হ'তে চাও,
(তা'রা) কখনই তোর আপন হবে না
চিরদিন তোর নিকটে র'বে না
তবে——তা'দের কেন রে চাও?
চিরদিন যেই আপন আপন,
তাহার নিকটে বিকাইতে মন
মন রে আমার ধাও।
প্রাণ ভরি সেই দয়াময় নাম
মন রে আমার গাও।

ঘুমায়ে ঘুমায়ে মায়ার স্বপন
দেখিয়ে আর কি ফল?
নীদ পরিহরি মন রে আমার
মুখে হরি নাম বল।
প্রাণের আঁধার দূরে পলাইবে,
হৃদয়ের পাপ টুটিয়া যাইবে,
রাধা শ্যাম নাম কর উচ্চারণ
ওরে রে অবোধ মন!
ঐ দুটি নাম ভকতি নির্ঝরে,
স্থাপন করিলে হৃদয়ের থরে,
দুটি মিলি এক হ'বে।
মনে যদি ভক্তি থাকে তবে রে হৃদয় দিয়া
ভক্তিকালিন্দীর বেগে ছুটিবে এখন,
মনকদম্বেরই মূলে রাধা শ্যাম কুতূহলে
ধীরে ধীরে করিবে নর্ত্তন।
কখন বা ক্লান্ত হ'য়ে ভক্তি যমুনার জলে
রাধা শ্যাম দুই জনে দিবে গো সাঁতার।
মনের বাসনা গুলি গোপিকার বেশ ধরি,
সদাই হরষে মাতি করিবে বিহার।

রাঙ্গামান কাদম্বিনী মনকুঞ্জ বিতানেতে
বিষাদে বিথারি আহা পড়িবে যখন,
শ্যামের সোহাগ পেয়ে মানমেঘ প্রেমে মিশি
মনোহর ইন্দ্র ধনু করিবে সৃজন।
মনের বিজন বনে নিশীথ মুরলী ধ্বনি
'মুঞ্চমান' বলি আহা উঠিবে বাজিয়া,
ভকতির যমুনা গো অমনি উজান বহি
শুনিতে বেণুয়া গান আসিবে ছুটিয়া।
ত্যজি জগতের আশা,
ত্যজি সিন্ধ ভাল বাসা,
প্রফুল্ল তরঙ্গ গুলি বুকেতে ধরিয়া।
লালসা বাসনা নীরবে থেক না
কেশবের নাম গাও।
কিছুরই অভাব রবে না রবে না
কেশবের গুণ গাও।
মায়ার শিকল ভেঙ্গে চুরে ফেলি,
বারেক অবোধ মন!
ত্রিভঙ্গ মূরতি ধ্যান কর তুই
করিয়া কঠোর পণ;
ঘুমায়ে ঘুমায়ে মায়ার স্বপন
দেখিয়া কি আর ফল?
নীদ পরিহরি মন রে আমার
সদা হরিনাম বল।

কঙ্গ্রেস।

আমরা নিয়ত যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেই সকল কার্য্যে, আমরা ভাল করিতেছি, কি মন্দ করিতেছি, তাহাই অনেক সময় বুঝিতে পারি না। আমরা অনেকেই সিদ্ধ তণ্ডুল ধ্বংশ করি, না করিলে চলে না; কিন্তু সেই কাজটাই যে আমাদের ঠিক কাজ হইতেছে, তাহা আমরা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না; বুঝান ত দূরে আস্তাং। অনেক সময় অনেকের মনে এমন ধারণা হয়, যে আমরা যদি তণ্ডুল ধ্বংশ না করিয়া গোধূম চূর্ণ বা যব চূর্ণ প্রত্যহ ধ্বংশ করি, তাহা হইলে, আমাদের ভাল হয়।

আমাদের নিজের নিত্যকার্য্যের ভাল মন্দ বিচারে যখন এইরূপ খটকা হয়, তখন এক ব্যক্তির বা ব্যক্তিসমূহের অনুষ্ঠিত কোন একটি নূতন কার্য্যে

যে অন্যান্য ব্যক্তির নানারূপ খট্‌কা হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কঙ্গ্রেসের মত একটি গুরুতর নূতন ব্যাপারে, যে শক্র মিত্র উভয় পক্ষ হইতেই নানারূপ খট্‌কা উঠিতেছে—তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই।

রাজা প্রজা মধ্যে অস্ত্রের সংঘর্ষণ অতি ভয়াবহ ব্যাপার হইলেও, পৃথিবীর কুত্রাপি ওটি নূতন জিনিস নহে। 'বলং বলং বাহুবলং' 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' 'জোর জার, মুলুক তার,' এ সকল কথা সকল দেশের রাজা প্রজা সকল সময়েই জানেন। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাহুবলের, বা অস্ত্রবলের কোন প্রয়োগ না করিয়া, রাজা প্রজা মধ্যে দাবি দাওয়ার নিয়ত সংঘর্ষণ —অতি নূতন কাণ্ড, বড় বিচিত্র ব্যাপার।

আজি পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ য়ুরোপীয় রাজনীতি ক্রমে ক্রমে এই ছাঁচে গঠিত হইতেছে; রাজনীতি বলিয়া একটা জিনিষ সকল দেশেই ছিল ও আছে; এই পঞ্চাশ বৎসর য়ুরোপে রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি প্রজানীতি বলিয়া একটা জিনিশ খাড়া হইয়া উঠিতেছে।

য়ুরোপীয় রাজনীতিকে ক্রমে বিশুদ্ধ হইতে বিশুদ্ধতর করিবার প্রধান যন্ত্র এই প্রজানীতি; প্রধান মসলাও এই প্রজানীতি। আজি কালি আয়র্লাণ্ড সম্বন্ধে ইংলণ্ডের প্রবলা রাজনীতি আয়র্লাণ্ডের প্রজানৈতিক যন্ত্রে, আর প্রজানৈতিক মসলায়, ক্রমাগত ফিল্‌টর হইতেছে; ভরসা করা যায় আয়র্লাণ্ড সম্বন্ধে ইংলণ্ডের রাজনীতি অচিরাৎ বিশুদ্ধতরা হইবে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের রাজনীতি, কিয়ংপরিমাণে, অজ্ঞতা-মলে, আর কিয়ংপরিমাণে ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার জঞ্জালে,—বিষম দূষিত। এই মল জঞ্জাল দূরীকরণের জন্য, ভারতবর্ষে প্রজানীতি সংগঠন ও সংস্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। য়ুরোপীয় রাজনীতি সংস্করণের এমন কার্য্যকর যন্ত্র, এরূপ কার্য্যকরী মসলা—আর নাই।

লর্ড লীটন হঠাৎ অস্ত্রের আইন, ও সংবাদপত্রের আইন দেশ মধ্যে প্রচলিত করাতে, প্রজার মধ্যে যাহারা য়ুরোপীয় রাজনীতির যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়াছিল, তাহারা বুঝিল, রাজার কাছে ভারতীয় প্রজা একেবারে নগণ্য নহে। লর্ড রীপণের সময় ইলবর্ট বিলের ঘোরতর আন্দোলনের অবসরে, আবার বুঝদার প্রজারা বুঝিল, যে ইংরাজ জাতি, সহজে ভারতবর্ষের প্রজাবৃন্দকে আপনাদের সঙ্গে সমান স্বত্ব বা অধিকার প্রদান করিবেন, এমন আশা করাই ভুল; রাজনীতির সহিত প্রজানীতির রীতিমত নিয়ত সংঘর্ষণ আবশ্যক। সেই জন্য সুচারুরূপে প্রজানীতির সংগঠন ও সংস্থাপন আবশ্যক।

লর্ড রীপণের বিদায় কালে, ভারতীয় সমগ্র প্রজা কৃতজ্ঞতা-ভরে এক হৃদয়ে অভ্যুত্থান করিল; রীপণের শত্রুপক্ষ অনুদার ইংরাজদল চমকিয়া গেল। সমজদার লোকে সেই চমকে বুঝিতে পারিল,—প্রজার বল বুঝিতে পারিল; য়ুরোপীয় প্রথায়, ভারতে প্রজানীতি সংগঠন করা সম্ভব, ক্রমে এই ধারণা হইল।

লর্ড ডফরীণের আমলে, সেই প্রজানীতি সংগঠনের চেষ্টা হইতেছে। তাহারই নাম কঙ্গ্রেস্। ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতে প্রচলিত এই প্রবলা প্রখরা রাজনীতির পাশাপাসি দাঁড়াইতে পারে, এমন একটি প্রজানীতি গঠিত করা বড় সহজ কথা নহে। সেরূপ প্রজানীতি সংস্থাপন করিবার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ হইয়াছে কি না, উপযুক্ত প্রকরণ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে কি না,—এ সকল কথার মীমাংসা করা এক্ষণে অসম্ভব; এই মাত্র বলিতে পারা যায়, যে য়ুরোপীয় রাজনীতির সংস্কারিকা-রূপা প্রজানীতি সংগঠনের চেষ্টা এই কঙ্গ্রেসে হইতেছে।

ধীর স্থিরভাবে,—নিরেট, ঘাত-সহিষ্ণু, শক্ত সমর্থ,রক্ত অস্থিময়-প্রজানীতি ভারতে সংগঠিত করিতে পারিলে, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে ইংরাজের রাজনীতির সংশোধন হইবার সম্ভাবনা—তাহাতে আমাদের মঙ্গল আছে। বুঝিতে পারিলে, তাহাতে ইংরেজেরও মঙ্গল আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাহুবলের বা অস্ত্র বলের কোন প্রয়োগ না করিয়া রাজা প্রজা মধ্যে দাবি দাওয়ার সংঘর্ষণ দ্বারা ক্রমে প্রজার স্বত্ব সংস্থাপন এবং অধিকার বর্দ্ধন—প্রজানীতির কার্য্য। এরূপ প্রজানীতি ভারতে একবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইলে, অস্ত্র বলে বিপ্লবের সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে। ইংলণ্ডের পক্ষে সেটি বড় অল্প লাভের কথা নহে? ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যদি সুগঠিত প্রজানীতি থাকিত, তাহা হইলে, সেই প্রজানীতির সাহায্যে সিপাহীরা আপনাদের আবেদন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট জ্ঞাপন করিতে পারিত; প্রজানীতিতে রাজনীতিতে রীতিমত সংঘর্ষণ চলিত, বন্দুকে কামানে হয়ত সমর বাধাইতে হইত না।

কোন দেশে প্রবলা প্রজানীতি থাকিলেই যে সে দেশে রাজা প্রজায় অস্ত্র বিপ্লব হয় না, বা হইতে নাই, এমন কথা আমরা বলিতেছি না; তবে রক্তাস্থিময়, সতেজ, সবল, প্রজানীতি থাকিলে, রাজনীতি তাহাকে আদরে সঙ্গিনী করিয়া লন, তাহাতেই অস্ত্রবল পরীক্ষার অবসর কমিয়া আসে।

যে দিক্ দিয়াই দেখা যাক্, ভারতে প্রজানীতির সঙ্গঠন করা যে আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কঙ্গ্রেস্ সেই কার্য্যে ব্রতী। সুতরাং কঙ্গ্রেস্ অতি গুরুতর ব্যাপার।

প্রথমেই বলিয়াছি, আমাদের নিজের নিত্য কার্য্যের 'ভাল' 'মন্দ' সম্বন্ধে নিজের মনেই অনেক সময় খট্‌কা উঠে, সুতরাং এমন একটা প্রকাণ্ড কাণ্ডে দুই জন, দশ জন, শত জন, বা সহস্র জন খট্‌কা তুলিলে, তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। বরং যত খট্‌কা উঠে ততই ভাল; যদি খাটি সোণা মলা মাটিতে মিশিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা যত পোড়াইবে, ততই নিখাদ হইবে, উজ্জ্বল হইবে,ঘা মারিলে বাড়িবে,—ফাটিবে না, চটিবে না।

যাহাতে, প্রজানীতির পরিচর্য্যায় যাপিত জীবন দাদা ভাই নওরোজি, য়ুরোপীয় রাজনীতির মর্ম্মজ্ঞ, বিজ্ঞ বিচক্ষণ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

প্রভৃতি ভারতীয় ধুরন্ধরগণ যোগ দান করিয়াছেন, উদার রাজপুরুষ গণের প্রতিনিধি আলেন হিউম প্রভৃতি যে কঙ্গ্রেসের পরিপালনে নিয়ত ব্যাপৃত, সেই কঙ্গ্রেসকে যে বালকের ছেলে খেলা মনে করে, সেই বালক। ছেলেখেলা হইলে, সর্ লিপেল গ্রিফিনের মত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা, বিলাতের টাইমসের মত বজ্রঘোষ সংবাদ পত্র সকল,—উহার উপর ভ্রূকুটি করিবে কেন ?

কিন্তু কঙ্গ্রেস বাল্য চাপল্য না হইলেও, নানা কারণে বয়স্কের বিড়ম্বনা হইতে পারে; কিয়ৎ পরিমাণে হইতেছে।

প্রজার যে টি মর্ম্ম কথা, সেইটি লইয়া প্রজানীতি গঠন করা আবশ্যক; সেইটি লইয়াই প্রজানীতি গঠিত হইতে পাবে। অন্য উপায় অসম্ভব। ভারতীয় প্রজার মর্ম্ম কথা—তাহাদের দারিদ্র দুঃখ। ইংরাজ শাসনে এই দারিদ্র দুঃখ দিন দিন বাড়িতেছে। দাক্ষিণাত্যে দানব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, উত্তর পশ্চিম ক্রমেই অধিকার করিয়াছে, অপূর্ব্ব উর্ব্বর-ভূ বঙ্গে ক্রমে ক্রমে বিস্তার বৃদ্ধি করিতেছে। এই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগ্রাসী দারিদ্র দুঃখকে জান করিয়া সুর বাঁধিতে পারিলে, তবে প্রজানীতির সুর লাগিবে; রাজনীতি যতই কেন কঠোর হউক না, প্রজানীতির মর্ম্মের কাঁদনি সুর, তাহাকে কাণ পাতিয়া শুনিতে হইবে; ক্রমে সেই মর্ম্ম দুঃখ রাজনীতিকে দূর করিতে হইবে।

ইংলণ্ডের প্রজা চাহিয়াছিল,—স্বাধীন বাণিজ্যের অধিকার; আমেরিকার প্রজা চাহিয়াছিল, স্বাধীন জীবনের অধিকার; আয়র্লণ্ড চাহিতেছে, স্বাধীন শাসনের অধিকার; আমরাও এই সকলের দেখা দেখি, বলিতেছি আমাদিগকে তোমাদের সঙ্গে সমান অধিকার দাও। সিবিল বিচারের অধিকার দাও, কৌন্সিলে বসিবার অধিকার দাও, যুদ্ধ করিবার অধিকার দাও—কিন্তু এ সকল পরের সুরে সুর লাগান মাত্র; নিজের কাঁদুনীর রাগিণী নহে।

নিজের প্রাণের কথায় জান লাগাইয়া, রাগিণী ধরিতে না, পারিলে সুর লাগিবেই না। কৌন্সিলে প্রতিনিধি প্রণালীতে দেশীয় সদস্য গৃহীত হৌক, জেলার শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তা পৃথক্ পৃথক ব্যক্তি হউন, উচ্চ উচ্চ পদে দেশের যোগ্য ব্যক্তিদের গ্রহণ করা হৌক, রণকৌশল শিক্ষার্থীদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হৌক—ইত্যাদি প্রার্থনা প্রজানীতি সঙ্গঠন ব্যাপারে অবান্তর কথা। **ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতের উপর নিত্য, নৈমিত্তিক, অনিয়মিত, নিয়ত ধারা বাহিক শোষণ ক্রমে ক্রমে কমান হৌক** ইহাই আমাদের মূল প্রার্থনা। এই মূল কথা, স্বল্পাক্ষরী, সারবতী, সন্দেহশূন্য ভাষায় কাতর কোটি কণ্ঠে নিয়ত নিবেদন করিতে হইবে। ইংরাজ বণিকদের অস্বাভাবিক বাণিজ্য শোষণে এবং ইংরাজ রাজের স্বার্থপর সরকারি শোষণে দিন দিন ভারতের কিরূপ দারিদ্র বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা দেশের প্রদেশের, জেলার পরগণার, গ্রাম নগরের তালিকা দিয়া তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতে

লর্ড ডফরীণের আমলে, সেই প্রজানীতি সংগঠনের চেষ্টা হইতেছে। তাহারই নাম কঙ্গ্রেস্। ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতে প্রচলিত এই প্রবলা প্রখরা রাজনীতির পাশাপাসি দাঁড়াইতে পারে, এমন একটি প্রজানীতি গঠিত করা বড় সহজ কথা নহে। সেরূপ প্রজানীতি সংস্থাপন করিবার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ হইয়াছে কি না, উপযুক্ত প্রকরণ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে কি না,—এ সকল কথার মীমাংসা করা এক্ষণে অসম্ভব; এই মাত্র বলিতে পারা যায়, যে য়ুরোপীয় রাজনীতির সংস্কারিকা-রূপা প্রজানীতি সংগঠনের চেষ্টা এই কঙ্গ্রেসে হইতেছে।

ধীর স্থিরভাবে,—নিরেট, ঘাত-সহিষ্ণু, শক্ত সমর্থ,রক্ত অস্থিময়-প্রজানীতি ভারতে সংগঠিত করিতে পারিলে, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে ইংরাজের রাজনীতির সংশোধন হইবার সম্ভাবনা—তাহাতে আমাদের মঙ্গল আছে। বুঝিতে পারিলে, তাহাতে ইংরেজেরও মঙ্গল আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাহুবলের বা অস্ত্র বলের কোন প্রয়োগ না করিয়া রাজা প্রজা মধ্যে দাবি দাওয়ার সংঘর্ষণ দ্বারা ক্রমে প্রজার স্বত্ব সংস্থাপন এবং অধিকার বর্দ্ধন—প্রজানীতির কার্য্য। এরূপ প্রজানীতি ভারতে একবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইলে, অস্ত্র বলে বিপ্লবের সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে। ইংলণ্ডের পক্ষে সেটি বড় অল্প লাভের কথা নহে? ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যদি সুগঠিত প্রজানীতি থাকিত, তাহা হইলে, সেই প্রজানীতির সাহায্যে সিপাহীরা আপনাদের আবেদন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট জ্ঞাপন করিতে পারিত; প্রজানীতিতে রাজনীতিতে রীতিমত সংঘর্ষণ চলিত, বন্দুকে কামানে হয়ত সমর বাধাইতে হইত না।

কোন দেশে প্রবলা প্রজানীতি থাকিলেই যে সে দেশে রাজা প্রজায় অস্ত্র বিপ্লব হয় না, বা হইতে নাই, এমন কথা আমরা বলিতেছি না; তবে রক্তাস্থিময়, সতেজ, সবল, প্রজানীতি থাকিলে, রাজনীতি তাহাকে আদরে সঙ্গিনী করিয়া লন, তাহাতেই অস্ত্রবল পরীক্ষার অবসর কমিয়া আসে।

যে দিক্ দিয়াই দেখা যাক্, ভারতে প্রজানীতির সঙ্গঠন করা যে আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কঙ্গ্রেস্ সেই কার্য্যে ব্রতী। সুতরাং কঙ্গ্রেস্ অতি গুরুতর ব্যাপার।

প্রথমেই বলিয়াছি, আমাদের নিজের নিত্য কার্য্যের 'ভাল' 'মন্দ' সম্বন্ধে নিজের মনেই অনেক সময় খট্‌কা উঠে, সুতরাং এমন একটা প্রকাণ্ড কাণ্ডে দুই জন, দশ জন, শত জন, বা সহস্র জন খট্‌কা তুলিলে, তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। বরং যত খট্‌কা উঠে ততই ভাল; যদি খাটি সোণা মলা মাটিতে মিশিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা যত পোড়াইবে, ততই নিখাদ হইবে, উজ্জ্বল হইবে, ঘা মারিলে বাড়িবে,—ফাটিবে না, চটিবে না।

যাহাতে, প্রজানীতির পরিচর্য্যায় যাপিত জীবন দাদা ভাই নওরোজি, য়ুরোপীয় রাজনীতির মর্ম্মজ্ঞ, বিজ্ঞ বিচক্ষণ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

প্রভৃতি ভারতীয় ধুরন্ধরগণ যোগ দান করিয়াছেন, উদার রাজপুরুষ গণের প্রতিনিধি আলেন হিউম প্রভৃতি যে কঙ্গ্রেসের পরিপালনে নিয়ত ব্যাপৃত, সেই কঙ্গ্রেসকে যে বালকের ছেলে খেলা মনে করে, সেই বালক। ছেলেখেলা হইলে, সর্ লিপেল গ্রিফিনের মত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা, বিলাতের টাইমসের মত বজ্রঘোষ সংবাদ পত্র সকল,—উহার উপর ভ্রূকুটি করিবে কেন?

কিন্তু কঙ্গ্রেস বাল্য চাপল্য না হইলেও, নানা কারণে বয়স্কের বিড়ম্বনা হইতে পারে; কিয়ৎ পরিমাণে হইতেছে।

প্রজার যে টি মর্ম্ম কথা, সেইটি লইয়া প্রজানীতি গঠন করা আবশ্যক; সেইটি লইয়াই প্রজানীতি গঠিত হইতে পারে। অন্য উপায় অসম্ভব। ভারতীয় প্রজার মর্ম্ম কথা—তাহাদের দারিদ্র দুঃখ। ইংরাজ শাসনে এই দারিদ্র দুঃখ দিন দিন বাড়িতেছে। দাক্ষিণাত্যে দানব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, উত্তর পশ্চিম ক্রমেই অধিকার করিয়াছে, অপূর্ব্ব উর্ব্বর-ভূ বঙ্গে ক্রমে ক্রমে বিস্তার বৃদ্ধি করিতেছে। এই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগ্রাসী দারিদ্র দুঃখকে জান করিয়া সুর বাঁধিতে পারিলে, তবে প্রজানীতির সুর লাগিবে; রাজনীতি যতই কেন কঠোর হউক না, প্রজানীতির মর্ম্মের কাঁদনি সুর, তাহাকে কাণ পাতিয়া শুনিতে হইবে; ক্রমে সেই মর্ম্ম দুঃখ রাজনীতিকে দূর করিতে হইবে।

ইংলণ্ডের প্রজা চাহিয়াছিল,—স্বাধীন বাণিজ্যের অধিকার; আমেরিকার প্রজা চাহিয়াছিল, স্বাধীন জীবনের অধিকার; আয়র্লণ্ড চাহিতেছে, স্বাধীন শাসনের অধিকার; আমরাও এই সকলের দেখা দেখি, বলিতেছি আমাদিগকে তোমাদের সঙ্গে সমান অধিকার দাও। সিবিল বিচারের অধিকার দাও, কৌন্সিলে বসিবার অধিকার দাও, যুদ্ধ করিবার অধিকার দাও—কিন্তু এ সকল পরের সুরে সুর লাগান মাত্র; নিজের কাঁদুনীর রাগিণী নহে।

নিজের প্রাণের কথায় জান লাগাইয়া, রাগিণী ধরিতে না, পারিলে সুর লাগিবেই না। কৌন্সিলে প্রতিনিধি প্রণালীতে দেশীয় সদস্য গৃহীত হৌক, জেলার শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তা পৃথক্ পৃথক ব্যক্তি হউন, উচ্চ উচ্চ পদে দেশের যোগ্য ব্যক্তিদের গ্রহণ করা হৌক, রণকৌশল শিক্ষার্থীদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হৌক—ইত্যাদি প্রার্থনা প্রজানীতি সঙ্গঠন ব্যাপারে অবান্তর কথা। **ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতের উপর নিত্য, নৈমিত্তিক, অনিয়মিত, নিয়ত ধারা বাহিক শোষণ ক্রমে ক্রমে কমান হৌক** ইহাই আমাদের মূল প্রার্থনা। এই মূল কথা, স্বল্পাক্ষরী, সারবতী, সন্দেহশূন্য ভাষায় কাতর কোটি কণ্ঠে নিয়ত নিবেদন করিতে হইবে। ইংরাজ বণিকদের অস্বাভাবিক বাণিজ্য শোষণে এবং ইংরাজ রাজের স্বার্থপর সরকারি শোষণে দিন দিন ভারতের কিরূপ দারিদ্র বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা দেশের প্রদেশের, জেলার পরগণার, গ্রাম নগরের তালিকা দিয়া তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতে

হইবে। দুর্ভিক্ষ কমিশন এই দারিদ্রের কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন; হণ্টর প্রভৃতি বিচক্ষণ উচ্চ কর্ম্মচারীরা, দাদাভাই প্রভৃতি প্রকৃত দেশভক্তগণ সংখ্যা পরিমাণাদি দেখাইয়া উহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন; এই দারুণ দারিদ্র প্রত্যহ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। তথাপি রাজপুরুষ নামে বিরাট কঠোর পুরুষের হৃদয়ে এ কথা এখনও লাগে নাই। কোটি কাতর কণ্ঠে নিয়ত সপ্তস্বরা ভৈরবী রাগিণীতে গান্ধারের তান লাগাইলে তবে সে হৃদয় গলিবে।

কঙ্গ্রেসের গায়কেরা এখনও গলা সাধিতেছেন, যন্ত্র বাঁধিতেছেন, সুর মিলাইতেছেন; প্রকৃত গাওনার সময় এখনও হয় নাই—সুতরাং সমালোচনা চলে না। আমরা জানি, কঙ্গ্রেসের প্রবীণ পক্ষের মধ্যে দুই চারি জন প্রজার প্রাণের কথা লইয়া সুর বাঁধিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; তাহা যে হইতেছে না সেটি কেবল আসরের তামাসগীরদের বিড়ম্বনায়। সর্ব্বত্রই তামাসগীর লোকে সঙ দেখিতে ভাল বাসেন, সুর বুঝিতে পারেন না। কাজেই আসরের দোষে, অনেক স্থলেই সুর লাগে না, গান জমে না। কঙ্গ্রেসেও তাহাই হইতেছে। প্রথম প্রথম সর্ব্বত্রেই তাহা হয়; কিন্তু গায়কদের প্রাণের ভিতর সুর থাকিলে, আর হৃদয়ে অধ্যবসায় থাকিলে, শেষে গান জমিতেই হইবে।

বিগত কঙ্গ্রেসের প্রকৃতি প্রবৃত্তি ও প্রকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে এবং তামাসগীর' প্রতিনিধিবর্গের আচরণ সম্বন্ধে, কঙ্গ্রেসে উপস্থিত আমাদের একজন বন্ধু আমাদিগকে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহার একখানির কিয়দংশ এই প্রবন্ধের উপসংহাররূপে এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"বলা বাহুল্য কঙ্গ্রেসে আমি দেখিতে গিয়াছিলাম, দেখাইতে যাই নাই। দেখাইবার শক্তিই আমার নাই—সুতরাং বাধ্য হইয়াই আমাকে ঐ সংকল্প অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এবং দেখিতে গিয়াছিলাম বলিয়া কেবল দেখিতেই ছিলাম। সেই জন্য বক্তাদের বক্তৃতার উপর যত না কাণ না দিয়াছিলাম, শ্রোতাদের মুখের ভাব ভঙ্গির উপর তাহার অধিক দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। হিউম সাহেবের মুখের দিকে তিন দিন ক্রমাগতই আমার দৃষ্টি ছিল। এখানে থাকিতে শুনিয়াছিলাম তিনি নাকি একজন দেবতা; সাক্ষাতে যাহা দেখিলাম, তাহাতে তাঁহার উপর আমার ভালবাসার লাঘব হয় নাই কিন্তু ভক্তির উদয় হয় নাই। তিনি ভারতবন্ধু সন্দেহ নাই কিন্তু তিনি নিস্বার্থ ভারতবন্ধু নহেন। তিনি স্বজাতির স্বার্থান্বেষী স্বদেশহিতৈষী ভারতবন্ধু। ইহাও সামান্য প্রশংসার কথা নহে। অস্ত্র আইনের রিজোলিউসন লইয়া গোলযোগ বাঁধিবার সময়, হিউম সাহেবের প্রথম চিন্তাকুল ভ্রূভঙ্গি, পরে ব্যাকুল ভাব, ক্রমে অস্থির এবং অধৈর্য্যভাব, অবশেষে তাঁহার দৌড়াদৌড়ি পর্য্যন্ত দেখিয়া এবং অস্ত্র আইন উঠাইবার প্রস্তাবে তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া এবং আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া, আমার বিশ্বাস হইয়াছে হিউম সাহেব নিস্বার্থভাবে কেবল ভারতেরই হিত ইচ্ছা করেন না, স্বজাতির স্বার্থের দিকেও তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। সন্ত-

বত ভারতের নব অঙ্কুরিত জীবনের সঙ্গে আর তাঁহার স্বজাতির স্বার্থের সঙ্গে একটি গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিবার জন্যই তিনি এত যত্ন করিতেছেন। আমার নিকট বোধ হইল ‘কঙ্গ্রেসই’ এই গ্রন্থি বন্ধনের চেষ্টা। ইহাতে ভারতের উপকার হইলেও হইতে পারে; কিন্তু আপনাকে আমার মনের কথা বলিতে কি, এই আশার সঙ্গে সঙ্গে আমার একটু আশঙ্কাও হইতেছে। এই নূতন ধরণের গ্রন্থিতে উভয় জাতির স্বার্থ এক রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে বিলাতে ভারতে “হরিহর” আত্মা হইয়া উঠিবে? কি কোন গভীর জলসঞ্চারী চতুর রাজনৈতিকের কৌশলে আমাদের নব অঙ্কুরিত জীবনী শক্তিটি ভারতের নরম মৃত্তিকা হইতে এই গ্রন্থির টানে উৎপাটিত হইয়া উঠিয়া পড়িবে, কিছুই এখন বুঝিতে পারিতেছি না। প্রথমটি হইলেই ভাল এবং ভরসা করি হইবেও তাহাই। কিন্তু আত্মীয় কুটুম্বের মনে ভাল অপেক্ষা মন্দের কথাই সর্ব্বদা জাগিয়া উঠে। কঙ্গ্রেসে সামাজিক কথার আলোচনার চেষ্টা যে হইয়াছে এবং আগামী বৎসরেও আরও যে পরিষ্কাররূপে হইবে, সেটা আর কিছু নহে, নদীর একদিকের স্রোত খাল কাটিয়া আর এক দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা মাত্র। “তোমরা কৃষিকার্য্য কর আমরা অন্ন ভোজন করি এবং তোমরা সমাজ লইয়া থাক আমরা সমাজের মূল দেশের শাসনকার্য্য লইয়া খেলা করি।” এই মূল মন্ত্রে দীক্ষিত অনেকগুলি রাজনৈতিক পণ্ডিত আছেন। এই শ্রেণীর দুই একটি লোক যে কঙ্গ্রেসে এবার ছিলেন আমার এইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল। হিন্দুবিবাহ আইনের কিছু পরিবর্ত্তনের জন্য কঙ্গ্রেস হইতে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করা হউক না কেন, এমন কথাও ঘরওয়া ভাবে দুই একজনে উপস্থিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির অমত হওয়াতেই এবার এ শ্রেণীর কোন কথা কঙ্গ্রেসে উঠে নাই। কিন্তু আগামী বারে সামাজিক কথা কঙ্গ্রেসে তুলিবার জন্য আবার চেষ্টা হইবে; কঙ্গ্রেসের পরিচালকগণ কত দিন এরূপ চেষ্টা নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিবেন, বলা যায় না। কঙ্গ্রেসের নায়কদের মধ্যেও কাহারও কাহারও এই চেষ্টা আছে, ইহাই আরো অধিক চিন্তার কারণ, কঙ্গ্রেসের একজন নায়ক আমাকে পরিষ্কাররূপেই বলিলেন “আর কিছু না হউক সমুদ্রে জাহাজে এতগুলি বাঙ্গালি আসিল, এটিও কম লাভ নহে।”

কঙ্গ্রেসের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্ব পত্রে যে আমার আশঙ্কার কথা লিখিয়াছিলাম, তাহার কারণ এবার পরিষ্কার করিয়াই বলিতেছি। প্রথমত যিনি কঙ্গ্রেসের ধাত্রী স্বরূপ সেই মহাত্মার যেদিকে লক্ষ্য, নদীর স্রোত তাহার অনুকূলে কি না জানি না। নানা পদার্থে গঠিত সাতশত সভ্যের নৌকার ঠিক উপযুক্ত মাঝি তিনি কি না, তাহাও বলা যায় না। তাহার পর—সুরেন্দ্র বাবু, নরেন্দ্রবাবু, মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই শ্রেণীর কঙ্গ্রেসর আর আর পরিচালকগণের এখনই যখন এক এক জনের এক এক দিকে মতি গতি, তাহার উপর, ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ক্ষমতা পরিচালনের ইচ্ছায়

কতকগুলি লোক এখনই যেরূপ ঘোর উন্মত্ত দেখিলাম, তাহার উপর কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর যেমন প্রকরণ পদ্ধতি দেখিলাম, তাহাতে কঙ্গ্রেস পার্লিয়ামেন্ট রূপে পরিণত হউক না হউক, বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদের বাঁদরামিতে কঙ্গ্রেস শীঘ্রই বোধ হয় পরিণত হইবে। এবার একজন মান্দ্রাজি ভদ্রলোক ইনকম টেক্সের রিজোলিউসনের সময় কিছু বলিবার জন্য প্ল্যাটফরমে উঠিয়াছিলেন। দুরদৃষ্ট বশত তিনি খঞ্জ। প্ল্যাটফরমে উঠিবার সময় যখন তিনি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে লাগিলেন, তখন চারিদিক হইতে অনেক "ডেলিগেট" হাততালি দিয়া উঠিলেন। থিয়াটর ঘরে অভিনেতাদের কোন ত্রুটি হইলে, আট আনা টিকিটের গ্যালারির দিক হইতে যেমন হাত-তালি এবং হো হো শব্দ উঠিতে থাকে কঙ্গ্রেসে সেইরূপ অতি অভদ্রোচিত কুৎসিত দৃশ্য দেখিয়া আমি যে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়াছি, তাহা দেখিতে পারি না। দেশের প্রতিনিধি হইয়া যাঁহারা ভারতের অদৃষ্টচক্র ফিরাইবার জন্য একস্থানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের এরূপ বাল চপলতা দেখিয়া আর বলিব কি বলুন? ফল কথা কঙ্গ্রেসে তামাসা দেখিতেই অধিকাংশ লোক গিয়াছিলেন। যাঁহারা ক্ষমতাবান, তাঁহারা আপনাদের ক্ষমতা দেখাইতে গিয়াছিলেন, কেহ কেহ এই সুবিধায় নিজের সংবাদপত্রের গ্রাহক বৃদ্ধির চেষ্টাতেও ছিলেন। প্রকৃত দেশহিতৈষী এবং ভাল লোকও ছিলেন। কিন্তু প্রায়ই পশার শূন্য মক্কেল হীন অল্পবয়স্ক উকীল এবং সংবাদপত্রের সংস্রবিত লোক এবং দুই চারি দশজন আমার মতন শিক্ষায় বঞ্চিত অথচ "আলো প্রাপ্ত" তরুণ বয়স্ক জমীদার সন্তান এবং কতকগুলি অপরিপক্ক স্বদেশ হিতৈষী একত্র হইয়া—বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণকে কথা বলিতে অবকাশ না দিয়া এবং তাহাদের ভাল কথা উড়াইয়া দিয়া, তাল বেতালে সকল সময়ে সমান হাততালি দিয়া, কোন ক্রমে কঙ্গ্রেস ব্যাপার এবার সমাধান করিয়াছেন। কঙ্গ্রেস দ্বারা উপকার পাইতে ইচ্ছা করিলে এবং ইহাকে স্থায়ী করিতে ইচ্ছা করিলে * * * ন্যায় কতকগুলি লোককে ইহার মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্তই আবশ্যক। কার্য্যের লোকের পরিবর্ত্তে কেবল বক্তৃতার লোক লইয়া কঙ্গ্রেস গড়িতে চেষ্টা করিলে, সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে।